অভিনেত্রীর রূপ।

(উপন্যাস)

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

(49)

ষ্টার থিয়েটার।

(কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।)

মূল্য ১৵০ এক টাকা।

অভিনেত্রীর রূপ।

(উপন্যাস)

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

(49)

ষ্টার থিয়েটার।

(কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।)

মূল্য ১৵০ এক টাকা।

উৎসর্গ-পত্র

"দেবি !

যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই ব'লে মার্জ্জনাও করিলে না ? রেখে
গেলে চির-অপরাধী ক'রে ! ইহ জন্ম
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব,—তাহারো দিলে না অবকাশ ?
দেবতার মত তুমি নিশ্চল—নিষ্ঠুর !
অমোঘ তোমার দণ্ড—কঠোর বিধান।"

রত্ন-হারা

অভিনেত্রীর রূপ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সে আজ পোনের ষোল বৎসরের কথা,—সে দিন শনিবার, তারিখটা ঠিক মনে নাই। রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে। কলিকাতার কোনও একটি বিখ্যাত রঙ্গালয়ে একখানি নূতন নাটক অভিনয়ের সেই দিন প্রথম রজনী। লোকের উপর লোক আসিয়া টিকিট ঘর ছাইয়া ফেলিতেছে; কেহ গ্যালারির টিকিট চাহিতেছে, কেহ পিটের টিকিটের জন্য উমেদারী করিতেছে; কিন্তু যিনি টিকিট বেচিতেছিলেন, তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিতেছেন, "আট আনার—এক টাকার টিকিট নাই, কেবল-মাত্র কয়েকখানি ষ্টলের টিকিট অবশিষ্ট আছে,—যদি ইচ্ছা করেন, দুইটি টাকা ফেলিয়া শীঘ্র গ্রহণ করুন, নচেৎ তাও আর পাইবেন না।" কেহ দুইটি টাকা বাহির করিয়া ষ্টলের টিকিট লইল, কেহ বা ম্লানমুখে বাড়ী ফিরিবার মনঃস্থ করিল। রাত্রি নয়টা বাজিতে আর অল্প বিলম্ব আছে, এমন সময় একখানি গাড়ী আসিয়া রঙ্গালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। সুবেশধারী এক জন নব্য বাবু

তিন জন বন্ধু সমভিব্যাহারে টিকিট-ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারিখানি তিন টাকার টিকিট চাহিলেন। টিকিট-বিক্রেতা ভদ্রলোকটী সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন, "বড়ই দুঃখিত হইলাম, তিন টাকার টিকিট নাই, চারি টাকার টিকিটও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র দুইটি বক্স খালি আছে। যদি ইচ্ছা হয়, গ্রহণ করিতে পারেন।" নবাগত যুবকটী তাহাতেই সম্মত হইলেন; দুইটি বক্সের দাম দিয়া বন্ধুগণকে লইয়া দ্বিতলে গিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। বাবুটির নাম নলিনীভূষণ মিত্র। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী অবনীভূষণ মিত্রের পুত্র। সম্প্রতি অবনী বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, নলিনীভূষণ এক্ষণে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। নলিনী কনিষ্ঠ, যামিনীভূষণ জ্যেষ্ঠ। সংসারে নলিনী ও যামিনী ব্যতীত অবনী বাবুর বিধবা পত্নী ও যামিনীভূষণের সহধর্ম্মিণী বর্ত্তমান। যামিনীর বয়ঃক্রম চল্লিশের কাছাকাছি হইয়াছে; নলিনী সম্প্রতি যৌবনের পূর্ণমাত্রায় পদার্পণ করিয়াছে। যামিনীর একমাত্র ষোড়শবর্ষীয় পুত্র সজনীকান্ত পিতার ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল;—অন্য সন্তান-সন্ততি নাই। নলিনী দুই বৎসর হইল বিবাহ করিয়াছে। প্রায় ছয় মাস হইল, তাহার একটি শিশুসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

ঐক্যতান বাজিল, যবনিকা উঠিল, অভিনয় আরম্ভ হইল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অসংখ্য দর্শকবৃন্দ নাটকাভিনয় দেখিতে লাগিল। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে নাটকের নায়িকা প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হইল।

সাজসজ্জার পারিপাট্যে, অভিনয়ের জীবন্ত মাধুর্য্যে, কমনীয় কণ্ঠের করুণ উত্তেজনায়, অভিনয়ের সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া, আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণ আকর্ষণ করিল।

বক্সে উপবিষ্ট নলিনীভূষণের প্রাণের তারে কে যেন আঘাত দিল। নায়িকার তীব্ররূপরশ্মি নলিনীভূষণের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, লালসার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। একটি দৃশ্যে নায়িকা যখন নায়কের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছে, সেই সময় এমন একটি দীর্ঘশ্বাস নায়িকার পঞ্জর ভেদ করিয়া বহির্গত হইল,—সত্য বলিতে কি,—সে উষ্ণ নিঃশ্বাসের আঘ্রাণ যেন নলিনীভূষণ নিজে গ্রহণ করিল। ভাবিল—'এ রমণী বেশ্যা হোক,—কিন্তু প্রাণশূন্যা নহে। প্রাণ দিয়া প্রাণ পাইবার জন্য হেথা সেথা ছুটিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু প্রতিদান কোথাও পাই নাই। যদি ভালবাসিতে হয়, ভালবাসিয়া ভালবাসার আকিঞ্চন করিতে হয়, তবে এই আমার ভালবাসার উপযুক্ত আধার।'

যতক্ষণ অভিনয় চলিল, ততক্ষণ নলিনীভূষণ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় আপনার আসনে বসিয়া রহিল। সাগর-তরঙ্গের ন্যায় কত চিন্তা, কত দ্বন্দ্ব, কত আবেগ, কত উচ্ছ্বাস মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল, তাহার মীমাংসা করা, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে।

যে তিনটি বন্ধু নলিনীর সহিত অভিনয় দেখিতে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জনের নাম ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ক্ষিতীশ মিষ্টভাষী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি; কোন্ সুরে, কি ভাবে, কখন্—কোথায়, কি

তাল দিলে, রাগিণী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হয়, তাহা সে বিলক্ষণ জানিত। অতি অল্প দিনের মধ্যেই সে নলিনীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। নলিনী ক্ষিতীশের কথায় উঠিত বসিত। পাঠক! এই ক্ষিতীশচন্দ্রটিকে লইয়া আমাদের বিশেষ প্রয়োজন! উক্ত মহাপুরুষটিকে আপনারা নানা মূর্ত্তিতে দেখিবেন! ইঁহার কীর্ত্তিকলাপ অনেকের দিব্যচক্ষুঃ প্রস্ফুটিত করিবে!

ক্ষিতীশ চকিতের মধ্যে নলিনীর প্রাণের অভ্যন্তরটা দেখিয়া লইল, মনে মনে একটু হাসিল! সে ইতিপূর্ব্বে অনেক বারবনিতার বাড়ীতে নলিনীকে লইয়া গিয়াছে, নলিনীকে দুই হাতে টাকা ছড়াইতে দেখিয়াছে; কিছু দিনের জন্য নলিনী মস্‌গুলও হইয়াছে, কিন্তু সামান্য ত্রুটীতে নলিনী সে স্থান ত্যাগ করিয়াছে। মজিতে—মোহিত হইতে—মুখপানে চাহিয়া থাকিতে, নলিনীকে ইতিপূর্ব্বে সে আর কখনও দেখে নাই। ক্ষিতীশের চক্ষে আজ এ কি দৃশ্য! যে যে দৃশ্যে নায়িকা অভিনয় করিবার জন্য রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতেছিল, কেবল সেই সেই দৃশ্যই নলিনী আগ্রহের সহিত দেখিতেছিল; তাহার পিপাসু চক্ষু যেন দৃশ্য-পটের সহিত—নায়িকার উজ্জ্বল বেশ-ভূষার সহিত—সেই দুইটি বিদ্যুৎ-দীপ্তিপূর্ণ মোহমদিরাময় নয়নের সহিত, কে যেন একটি তারে বড় করুণ সুরে সুর মিলাইয়া, জন্মজন্মান্তরের বাঁধন দিয়া, বাঁধিয়া দিয়াছিল।

গর্ভাঙ্ক শেষ হইবার পর নায়িকা যে মুহূর্ত্তে রঙ্গমঞ্চ হইতে

প্রস্থান করে, অমনি যেন নলিনীর বহু যত্নের বাঁধা সুর বেসুরা হইয়া যায়, তার ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হয়,—শূন্যমনে শূন্য পানে চাহিয়া সে আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে থাকে! ক্ষিতীশ ভাবিল, 'এই উপযুক্ত সুযোগ! যদি কিছু দিনের জন্য এক স্থানে স্থায়ী করিতে পারি, নানা প্রকারে বেশ দুই টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিব!'

চতুর্থ অঙ্ক শেষ হইয়া গিয়াছে, ড্রপ্ সিন্ পড়িয়াছে, কন্সার্ট বাজিতেছে; ক্ষিতীশ নলিনীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "কেমন দেখিলে? খোঁজ-খবর লইব নাকি?" নলিনী উত্তর করিল, "ক্ষিতীশ! তোমায় এই জন্য এত ভালবাসি। আমার প্রাণের কথা তুমি ছাড়া আর কে বুঝিতে পারে? পার যদি—আজ রাত্রেই যাইবার ব্যবস্থা কর!" "আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসিতেছি" বলিয়া ক্ষিতীশ বক্স্ হইতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেল। নাটকের শেষ অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে; দর্শকবৃন্দের উচ্চ আনন্দধ্বনি ও করতালিতে রঙ্গালয় মুখরিত হইতেছে, এমন সময়ে ক্ষিতীশ ফিরিয়া আসিয়া আনন্দোৎফুল্ল-কণ্ঠে নলিনীকে বলিল, "সব ঠিক! ঠিকানা পাইয়াছি, নাম নিরুপমা। আজ রাত্রেই শুভপদার্পণ করা যাইবে! যদি 'কাম ফতে' করিয়া দিতে পারি, আমার বিষয় একটু বিবেচনা করিও।" আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত নলিনী কহিল, "তার আর কথা কি!" অভিনয় শেষ হইল। ঐক্যতান বাদনে 'গড সেভ্ দি কুইন' শুনিতে শুনিতে দর্শকবৃন্দ নিজ নিজ গৃহাভিমুখী হইল।

রঙ্গালয়ের প্রবেশদ্বারে নলিনীর গাড়ী প্রস্তুত ছিল, নলিনী আসিয়া তাহাতে আরোহণ করিল। কেবলমাত্র ক্ষিতীশ নলিনীর সঙ্গে রহিল। অপর দুই জন বন্ধুকে ইতিপূর্ব্বেই বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। মালিকের হুকুমে গন্তব্য স্থানাভিমুখে গাড়ী ছুটিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিরুপমার বাটী,—সুসজ্জিত কক্ষ,—নলিনী ও ক্ষিতীশ উপবিষ্ট। ঘরের চৌকাটের উপর নিরুপমার মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। নিরুপমা তখনও তাহার কার্য্যস্থান হইতে ফেরে নাই।

নিরুপমার মাতা বলিতেছিল, "আমার বড় ভাগ্যি,—আপনাদের মত লোকের এ গরিবদের বাড়ীতে পায়ের ধূলো পড়েছে! নলিনী বাবুর নাম, নলিনী বাবুর মেজাজের কথা—বিশেষরূপ জানে না, এমন মেয়েমানুষ কলিকাতায় নাই! তবে কথাটা কি জানেন ক্ষিতীশবাবু! আপনার অজানা কিছুই নাই, আমার মেয়ে বরাবর এক জনের কাছেই ছিল, তাহাকে স্বামীর মত ভালবাসিত ও ভক্তি করিত; দ্বিতীয় পুরুষের মুখ আজ পর্য্যন্ত দেখে নাই। দুই মাস পূর্ব্বে আপনি একবার বিরাজবাবুর জন্য—"

নিরুপমার মাতার কথা শেষ হইতে না হইতেই ক্ষিতীশ

চোখ টিপিয়া ও সকল কথা উত্থাপন করিতে মানা করিল। সে যে কয়েকমাস পূর্ব্বে বিরাজবাবুর জন্য নিরুপমার মাতার কাছে উমেদারী করিতে আসিয়া তাড়া খাইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল, এ কথা নলিনী জানিতে পারিলে তাহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। হয় তো নলিনী তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না। এই আশঙ্কায় পূর্ব্ব হইতে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিল। অপূর্ব্বপ্রতিভাশালিনী নিরুপমার জননী তদ্দণ্ডেই তাহা বুঝিতে পারিল। সুর পাল্‌টাইয়া আবার কথা আরম্ভ করিল, "ক্ষিতীশবাবু! আপনি জানেন কি না জানি না,—কিন্তু বোধ হয় এ তল্লাটে এমন কোন লোক নাই, যে আমার নিরুপমার গুণের কথা না জানে! হাজার হাজার টাকা দিয়া—কেবলমাত্র নিরুর সহিত দুটো কথা কহিয়া যাইবে বলিয়া কত উপরোধ-অনুরোধ আসিয়াছে,—সে সমস্ত প্রলোভন নিরু হতাদরে পায়ে ঠেলিয়াছে। নলিনীবাবু যদি আমার মেয়েকে বাঁধা রাখিতে সম্মত হন, তাহা হইলে বাকী কথা কহিতে পারি! নচেৎ দুই একদিন যাওয়া-আসার কথা শুনিলে নিরু এই ঘরেই ঢুকিবে না।"

নলিনী চুপি চুপি ক্ষিতীশকে কি বলিয়া দিল,—ক্ষিতীশ গম্ভীরভাবে গোঁফে তা' দিতে দিতে নিরুপমার মাতাকে কহিল, "কিছু মনে করিও না বাছা—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। নিরুপমা যাহাকে স্বামীর মত ভালবাসিত ও ভক্তি করিত, তাহার সহিত ছাড়াছাড়ি হইল কেন?"

এইবার নিরুপমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী আসরে নামিলেন। মাতাকে কথা কহিতে না দিয়া—নথ্ দুলাইয়া—নিজেই উত্তর দিলেন,—"সে মিন্‌ষের কথা আর বলিব কি! তার বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ হইল। সে এক নাবালিকার প্রেমে পড়িয়া, আমার বোনটির সহিত অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার আরম্ভ করিল। শেষে কেলেঙ্কারী এরূপ গড়াইল যে, নিরুপমার আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। মেয়েটা মারা যায় দেখিয়া বাধ্য হইয়া—তাহার বাড়ী ঢোকা আমরা বন্ধ করিলাম।" নিরুপমার ভগিনীর আড়ম্বরপূর্ণ কথাগুলির রেশ্ মিলাইতে না মিলাইতে উপযুক্তা মাতাঠাকুরাণী আরম্ভ করিলেন, "মেয়ে আমার এক বিষম গোঁ ক'রে ব'সে আছে ক্ষিতীশ বাবু! সে বলে—তাহার মনের মত্ না হ'লে—চোখে না ভাল লাগ্‌লে—সে কাহাকেও ঘরে বসাইবে না।" ক্ষিতীশ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, নলিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ বাছা! স্পষ্ট কথা বলি, কিছু মনে করিও না। তোমার মেয়ের পরম সৌভাগ্য—যদি অমন একখানা চাঁদপানা চেহারা—সে আপনার বলিয়া ভাবিবার অধিকার পায়।"

নলিনী একটু লজ্জিত হইয়া ক্ষিতীশের গা টিপিল। ক্ষিতীশ নলিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ব'কলমে আর চালাইলে চলিবে না নলিনী! নিরুপমার মা ও ভগিনীর কথা তো সব শুনিলে,—এখন নিজ বক্তব্য প্রকাশ কর। বাঁধাবাঁধি বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত আছ?"

নলিনী অবনত-মস্তকে উত্তর দিল, "যদি আমার সামর্থ্যে কুলায়, তাহা হইলে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।"

নিরুপমার মাতা এক গাল হাসি হাসিয়া, মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া দিয়া, চৌকাট হইতে নামিয়া বসিল। বিনয় ও নম্রতার প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নলিনীকে কহিল, 'গরীব বলিয়া কি আমাদের সঙ্গে এইরূপ ছলনা করিতে হয়? সামর্থ্যে কুলাইবার কথা কি বলিতেছ গো বাবু? তুমি মনে করিলে—আমার মেয়ের মত দুশোটাকে প্রতিপালন করিতে পার! কথায় বলে—'অতি বাড় বেড়ো না—ঝড়ে উড়ে যাবে! অতি নীচু হ'য়ো না—ঝাঁটা লাথি খাবে'! আমরা প্রথম হইতেই এতটা গড়িয়ে পড়েছি ব'লেই আমাদের অদৃষ্টে বুঝি এই বিড়ম্বনা?"

ক্ষিতীশ নিরুপমার মাতার কথা কহিবার ভাব ও ভঙ্গীর বারবার করিয়া বিশেষ তারিফ্ করিল!

ব্যবসাদারী হিসাবে বন্দোবস্তের কথা—দেনা-পাওনার কথা—গৃহস্থালীর কথা বলিবার ও বুঝিবার শক্তি নিরুপমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর যথেষ্ট ছিল; এ বিষয়ে সে অদ্বিতীয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্ততঃ তাহার ও তাহার মাতার এইরূপ বিশ্বাস! বেশ্যা-শাস্ত্রে এক জন সুনিপুণ পণ্ডিত হইয়াও, সে তাহার অপেক্ষা দশ বৎসরের ছোট—একটি যুবকের প্রণয়ে আত্মহারা হইয়া, মাতার সহিত ঝগড়া করিয়া দুই তিন-বার খালধারে খোলার ঘর ভাড়া করিয়া বাস করিয়াছে! সে প্রণয়ীর ছবি এখনও তাহার হৃদয়মধ্যে আগ্নেয় তূলিকায় অঙ্কিত

আছে! সে যাহা হউক, নিরুপমার ভগিনী বৃথা কালক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া একেবারে কাজের কথা পাড়িল,—কহিল, "রাত হ'য়ে যাচ্ছে, নিরুপমার আসিবার সময় হইয়াছে! এখন দরকারী কথাগুলো শেষ করিলে ভাল হয় না?"

নলিনী বলিল, "বেশ তো—বলুন না"!

নিরুপমার ভগিনী। নিরুপমাকে আপনার পদসেবার দাসী করিয়া দিব, এটা আমরা স্থির করিয়াছি। কিন্তু আমাদের পেট চলা তো চাই! বৃহৎ সংসার, খরচ অনেক! আর নিরুপমা—আপনার মত দিল্‌দরিয়া লোকের নিকট হইতে কিছু প্রত্যাশা করিবে না তো আর কাহার নিকট করিবে? দেড়শো টাকা কারয়া তাহাকে মাহিনা দিতে হইবে, ছয় মাসের আগাম চাই! তা ছাড়া—তিরিশ ভরি গিনি সোণার এক ছড়া বিছে দিতে হইবে! আপনি ভদ্রলোক, আপনার উপর বেশী দাবী দাওয়া করিব না।

স্থান-মাহাত্ম্যের কি অপূর্ব্ব মহিমা! দস্তার ফুর্সিতে একছিলিম তামাক খাইয়া, কমলালেবুর খোলা দেওয়া কয়েকটি পান চিবাইয়া, তাকিয়া-ঘেরা বিছানার উপর কয়েক দণ্ড উপবেশন করিয়া, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য চিন্তা করিবার অবসর নলিনীর ঘটিয়া উঠিল না। মনে হইল, 'যদি এ প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া উঠিয়া যাই,—বড়ই অপমানের কথা। বহু অর্থব্যয়ে বাজারে যে সুনাম অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা একেবারে নষ্ট হইবে!' তৎক্ষণাৎ নিরুপমার অনিন্দ্যসুন্দর রূপমাধুরী অন্তরের স্তরে স্তরে জাগিয়া

উঠিল! নলিনী মনকে প্রবোধ দিল, ভাবিল,—"আপাততঃ কিছু টাকা খরচ হইবে বটে, কিন্তু প্রাণের অতৃপ্ত-পিপাসা মিটিয়া যাইবে! তার পর যত শীঘ্র সম্ভব—এ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব! তাহা হইলে যেমন ছিলাম, আবার সেইরূপ হইব!"

ঘরের সম্মুখেই বারাণ্ডা। সেইখানে নলিনী ক্ষিতীশকে ডাকিয়া লইয়া গেল! এক তাড়া নোট হাতে দিয়া—কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া দিয়া—আবার ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিল। ক্ষিতীশ মহা-উৎসাহে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল,—নিরুপমার মাতার হাতে নোটের তাড়া দিয়া কহিল,—"ভাল করিয়া গণিয়া দেখ' বাছা! তিনশো টাকার দশ টাকা করিয়া নোট আছে। মাহিনার বাকী টাকা কাল বেলা দশটার মধ্যেই পাইবে,—তিরিশ ভরি গিনি সোণার দামও সেই সঙ্গে আনিয়া দিব। তোমাদের কথাই রহিল! আজ হইতে নলিনী নিরুপমার, নিরুপমা নলিনীর।"

নলিনী অতি শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল বেলা দশটার মধ্যে বাকী টাকা দিলে চলিবে তো? আমার উপর এ বিশ্বাস আছে কি"?

নিরুপমার মাতা ও ভগিনী উভয়েই শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল,—"সে কি কথা? তোমরা রাজা লোক! তোমাদের মুখের কথাই যথেষ্ট। আজ যদি কিছুই না দিতে—তাতেই বা কি আসিয়া যাইত?"

এমন সময় বাড়ীর দরজায় একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

নিরুপমার মাতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"ঐ আমার নিরু এসেছে, তোমরা ব'স ; এখন হইতে তোমাদেরই ঘর দোর, আমরা নীচে চলিলাম।" মাতা ও জ্যেষ্ঠা কন্যা আপনার ঘরে নামিয়া আসিল, এবং ঝম্ ঝম্ করিয়া পাঁইজোরের আওয়াজ করিতে করিতে, নিরুপমা মাতা ও ভগিনীর নিকট উপস্থিত হইল। তিন জনের মধ্যে দশ মিনিট ধরিয়া অনেক কথা হইল। নিরুপমা তাড়াতাড়ি কয়েকখানি পরোটা—নোনা ইলিশের চচ্চড়ি ও একটু খেজুরে গুড় খাইয়া, হাত-মুখ ধুইয়া একটী পান চিবাইতে চিবাইতে আপন শয়ন-কক্ষাভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

ক্ষিতীশ নলিনীকে উপদেশ দিতেছিল, "দেখ নলিনী! এ সব জায়গায় অমন মুখচোরা হইয়া থাকিলে চলিবে না। থিয়েটারের অ্যাক্ট্রেস্‌রা চালাক চট্‌পটে রসিক লোক চায়! নূতন স্থানে আসিয়াছ বলিয়া যদি চক্ষুলজ্জা হয়, আমার পকেটে ফ্লাস্ক্ রহিয়াছে, সোডা ও বরফ আনিতে বেহারাকে বলিয়া দিই,—দুই এক সিপ্ ব্র্যাণ্ডি টানিলেই চোখের পরদা পড়িয়া যাইবে।" নলিনী কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে খুট্ করিয়া জানালার ধারে কিসের শব্দ হইল, নলিনীর দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল ;—সে দেখিল—দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু গবাক্ষ-দ্বার ভেদ করিয়া তাহার মুখের উপর স্থাপিত! চোখোচোখি হইবামাত্র—জানালাটি বন্ধ হইয়া গেল! নলিনী ভাবিল—"এত মধুরতা—এত সৌন্দর্য্য—এত অমৃত—সঙ্গে সঙ্গে এত বিষ,—ও কাহার চক্ষু দুটী? নিশ্চয়ই নিরুপমার!"

সত্যই তাই! নিরুপমা চুপি চুপি আসিয়া—চুপি চুপি জানালাটি খুলিয়া—চুপি চুপি চুরি করিয়া চাহিয়া—তাহার নবাগত নাগরটিকে দেখিয়া লইতেছিল! কি দেখিতেছিল? দেখিতেছিল বোধ হয়—নলিনীর মুখখানি কেমন! নলিনীর চোখ দুটি কেমন! নলিনীর চুলগুলি কেমন! 'নূতন ঘর পাতিতে চলিলাম,—সংসার শান্তি বা অশান্তিপূর্ণ হইবে? এই কুৎসিত পথে পদার্পণ করা পর্য্যন্ত—প্রাণের সুখ কখনও পাই নাই। থিয়েটার লইয়াই ভুলিয়া আছি, কিন্তু বুকের ভিতরটা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে! কে জানে—সুখী কি হইব? শান্তি কি পাইব? তৃপ্তি লাভ কি করিব?' মুহূর্ত্তমধ্যে হৃদয়ের অভ্যন্তরে এইরূপ ভাবের বিচিত্র-সাগর সৃষ্টি করিতে করিতে নিরুপমা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল!

ক্ষিতীশচন্দ্র লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিশেষরূপ সমাদর দেখাইয়া নিরুপমাকে বসাইল! নিরুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "কই—আপনারা পান-তামাক খাইতেছেন না?" ক্ষিতীশ গাল-ভরা হাসি হাসিয়া উত্তর দিল, "অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটীই হয় নাই! যা কিছু অভাব ছিল—তোমারই! এইবার তুমি আসিয়াছ, এ অভাগাদের অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট আর থাকিবে না!"

এইবার নিরুপমা নলিনীর কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনার নাম নলিনীবাবু?"

নলিনী। তুমি কি আমার নাম জান?

নিরুপমা। আপনার নামের সৌরভ, সঙ্গের আঘ্রাণ, গ্রহণ

না করিয়াছে—এমন স্ত্রীলোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! কেবল আমি অভাগিনী—অদৃষ্ট-দোষে পরিত্যক্তা হইয়া আছি!

ক্ষিতীশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাহবা কি বাহবা! এমন নইলে কি বাবা—মেয়েমানুষ? বচন শুনিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়! শুনিলে নলিনী? কথার বাঁধুনি শুনিলে?—রাত্রি দুইটা বাজে, আর দেরি করিয়া কাজ নাই! নিরুপমা! তোমার চাকরকে ডাক'তো ভাই,—সোডা ও বরফ আনাইতে হইবে!"

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে উপযুক্ত ভৃত্য সোডা ও বরফ আনিয়া উপস্থিত করিল। আলমারি খুলিয়া নিরুপমা দুইটি ছোট কাঁচের গেলাস বাহির করিয়া দিল। বিহাইভ্ ব্র্যাণ্ডির ফ্ল্যাস্ক্ খুলিয়া ফেলিয়া সোডা ও বরফ মিশাইয়া, ক্ষিতীশ দুইটি পানপাত্র প্রস্তুত করিল। একটি নলিনীর হাতে দিল, অপরটি নিরুপমার সম্মুখে রাখিল।

নিরুপমা বলিল, "কিছু মনে করিবেন না, ও জিনিস আমি খাই না।"

ক্ষিতীশ। তা হ'লে ভাই আমোদ হয় কি ক'রে? আমি তো ও রসে একদম বঞ্চিত! তুমিও যদি বেসুরো গাইতে সুরু কর, তবে নলিনীই কি খালি চোর-দায়ে ধরা পড়িয়াছে?

নিরুপমা। আপনি ও রসে বঞ্চিত কেন?

ক্ষিতীশ। কি জান ভাই! শুনিয়াছি—ও সামগ্রীর রসাস্বাদন একবার করিলে—আর ভুলিয়া থাকা যায় না! ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও পিপাসা মিটাইতে হয়! আমরা গরীবের

ছেলে! যদি চির-জীবনের জন্য আমার ও আমার সংসারের ভার কেহ গ্রহণ করে, তাহা হইলে আমি বোতল বোতল পার করিতে প্রস্তুত আছি!

নলিনী বলিল,—"ক্ষিতীশ! সকল সময় তোমার বাচালতা ভাল লাগে না। নিরুপমা যদি না খায়, তাহা হইলে আমিও খাইব না! অন্ততঃ—একটি চুমুক খাওয়া চাই।" নলিনীর মুখে এমন একটি নীরব কাতরতার চিহ্ন—নয়নে এমন একটি করুণ ভিখারীর ভাব ও ভাষা—নিরুপমা পাঠ করিল, যাহা লক্ষ্য করিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না!

গর্ভধারিণীর শিক্ষায়—এ পথের পথিক হইলেও—নিরুপমা এখনও রমণীর প্রাণের কোমলতা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া, বেশ্যা-জীবনের কঠোরতা ও নির্ম্মমতা গ্রহণ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ আজ পর্য্যন্ত তাহার জন্য কাতর হইয়া কেহ কোনরূপ আকিঞ্চন করে নাই! আদরের কথা দূরে থাক্, অনাদরের ভর্ৎসনাও সে কখনও শুনে নাই। তাই বুঝি—তাহার মনটা একটু টলিল, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ আবার জ্বলিল, পাষাণে কয়েক ফোঁটা বারি ঝরিল!

নিরুপমা কহিল,—"আমি একটু খেলে কি আপনি সুখী হন?"

নলিনী উত্তর করিল,—"বোধ হয়—হই! কিন্তু আমি জোর করিতে চাই না।"

ক্ষিতীশ বলিল,—"অমায়িকতার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে,—

এইবার যে যার গেলাসটি মুখে তুলিয়া ধরিতে আজ্ঞা হউক, আমি গায়ত্রী জপ করিতে থাকি,—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইবে!”

দুইটি গেলাস এক সঙ্গে উঠিল। একটি নলিনীর অধর স্পর্শ করিল,—আর একটি নিরুপমার মুখ চুম্বন করিল! কাহার তপ্ত ওষ্ঠে বেশী সুধা পাইয়া নির্জ্জীব কাচপাত্র সজীব হইয়া উঠিল, তাহা আমরা নির্ণয় করিয়া বলিতে পারি না।

সময় বুঝিয়া—ক্ষিতীশ বিদায় গ্রহণ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে দুই তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই নলিনীর চরিত্রে বিশেষ একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল। বারবনিতার সহিত সম্বন্ধস্থাপন তাহার পক্ষে এই নূতন নহে, কিন্তু এবার যেন সবই নূতন; নিরুপমা নূতন—নিরুপমার অনুপম সৌন্দর্য্য নূতন—নিরুপমার ভাব ও ভাষা নূতন! নিরুপমা যেন এ পৃথিবীর নয়—নিরুপমার নিখুঁৎ মুখখানি (অবশ্য নলিনীর চক্ষে) এমন একটি নূতনত্বের ছাঁচ দিয়া গঠিত,—যাহার একাধিপত্য লাভ করিয়া, নলিনী এই বিরাট সংসারের প্রত্যেক সামগ্রীটীকে নূতন চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে!

শুনিয়াছি—প্রথম প্রথম নূতনের আসক্তি বড় প্রবল হয়, কিন্তু শেষে পুরাতনেরই আদর! পুরাতনের জন্য হাহাকার করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে হয়! পাঠক! তুমি কি ভালবাস? নূতন না পুরাতন?

নিরুপমার কথাও একটু বলিবার আছে। সেও যে একটু পা পিছলাইয়াছে, গণ্ডীর বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সে যখন-তখন অন্যমনা হইয়া কি ভাবে; কি যেন সে হারাইয়া ফেলিয়াছে; এক একবার চমক ভাঙ্গিয়া বুকের ভিতর কি খুঁজিতে থাকে,—যত দূর দৃষ্টি যায়—সতর্ক হইয়া ভাল করিয়া দেখে! কিন্তু এ কি? অন্তরের অতি নিভৃত প্রদেশে একখানি নবপরিচিত মুখ, জন্মজন্মান্তরের পরিচিতের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, জীবন-মরণের সোনার কাটি রূপার কাটিটী হস্তগত করিয়া, চির-জীবনের মত রাজত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে! নিরুপমা বেশ্যা হোক্,—নিরুপমা প্রাণহীনা হোক্,—সে যে নলিনীকে একটু ভালবাসিয়াছে, এ কথা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

সৌখীন্ নরনারী-মহলে নলিনী ও নিরুপমার কথা লইয়া বেশ একটু আন্দোলন চলিল। কেহ বলিল,—নলিনী নিরুপমাকে বাড়ী কিনিবার জন্য দশ হাজার টাকা দিয়াছে; কেহ বলিল,—নিরুপমার কপাল ফিরিয়াছে,—তাহার দুই স্যুট্ সোনার ও এক-স্যুট্ জড়োয়ার গহনা হইয়াছে। কেহ বলিল,—নলিনী বড় চালাক ছেলে, এইবার সে ফাঁদে পড়িয়াছে। জনরব সহস্র জিহ্বায় বিস্তৃত হইয়া—বহুবিধ অলঙ্কারের সহিত নলিনীর জ্যেষ্ঠ সহোদর

যামিনীভূষণের কাণে পৌঁছিল। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া—নানারূপ অশুভ কল্পনা করিয়া—তাঁহার ললাট চিন্তায় কুঞ্চিত হইল। নলিনীর মাতাও সব শুনিলেন; তিনি অনন্যোপায় হইয়া—মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া—তাঁহার চরণে শুভাশুভ নির্ভর করিলেন। নলিনীর সহধর্ম্মিণী দুর্গাবতী,—স্বামীর অধঃপতন দেখিয়া—পরিণাম চিন্তায় আকুল হইয়া—একটী বুকভাঙ্গা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল। দুর্গাবতী বুদ্ধিমতী—পতিগতপ্রাণা—অপূর্ব্ব-ধৈর্য্যশালিনী। সংসার-অনভিজ্ঞা হইলেও—অদৃষ্টের উপর সুখ দুঃখ ছাড়িয়া দিয়া—সে অনেক সময় নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। দুর্গা মনকে চোখ ঠারিয়া বুঝাইল,—ভাসাইবার মালিক যদি দুঃখের সাগরে ভাসান, আমাদের সাধ্য কি—তাহার প্রতিরোধ করি?

রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে; দুর্গা শয্যায় পড়িয়া এ কথা সে কথা ভাবিতেছে;—একটু ঘুমাইতে পারিলে সে দুর্ভাবনার হাত এড়াইতে পারে, কিন্তু পোড়া চোখে ঘুম আসে কই? এমন সময় নলিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। যে লোক রাত্রি তৃতীয় প্রহর না কাটাইয়া বাড়ী ঢোকে না, তাহাকে এত সকাল সকাল আসিতে দেখিয়া দুর্গা আশ্চর্য্য হইল। হাসি-হাসি মুখখানি স্বামীর মুখের কাছে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত সকাল সকাল অনুগ্রহ হইল যে? আজ কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম! গত তিন চারি মাসের মধ্যে এরূপ সৌভাগ্যের রাত্রি আমার একদিনও আসে নাই।"

লাগিল। দুর্গা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এমন গম্ভীর মূর্ত্তি কেন? কোনও আপনার লোকের সহিত ঝগড়াঝাঁটি হইয়াছে নাকি?" বলিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল! নিটোল গাল দুইখানি—ঈষৎ টোল খাইয়া—বড় সুন্দর—বড় মধুর দেখাইতে লাগিল।

নলিনী উত্তর করিল, "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর এ বাড়ীতে থাকিব না। দাদার সহিত পৃথক হইব, বিষয় ভাগ করিয়া লইয়া দাদার সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিব।"

দুর্গা। কেন—বড় ঠাকুরের সহিত কোনও বচসা হইয়াছে নাকি?

নলিনী। বয়সকালে আমোদ আহ্লাদ না করে, এমন পুরুষ তো দেখি না! যাহারা করে না—তাহারা কেবল 'যকের ধন' আগলাইবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে। দাদাও যে সাধু পুরুষ ছিলেন—তাহা নহে। আমার বয়সে উনিও যথেষ্ট অর্থ অপব্যয় করিয়াছেন। এখন পরমহংস সাজিয়া আমায় উপদেশ দিতে আসেন। আজ এক ঘর লোকের সাম্‌নে আমাকে ডাকিয়া প্রকাণ্ড বিজ্ঞের ন্যায় আমার চরিত্রসমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন! আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না; আসিবার সময় স্পষ্টই বলিয়াছি,—আমার যাহা ইচ্ছা করিব, কাহারও বক্তৃতা শুনিবার তোয়াক্কা রাখি না।

দুর্গা। গুরুজনের মুখের উপর অমন করিয়া জবাব করাটা ঠিক হইয়াছে কি?

নলিনী। তুমিও লেক্‌চার সুরু করিলে? মার কাছে সব কথা বলিতে গেলাম, তিনিও দাদার পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমাকে মিঠে কড়া শুনাইয়া দিলেন! তুমিও দেখিতেছি—আমারই দোষ দিতেছ! ভালই হইয়াছে। তোমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে মনকে প্রবোধ দিতে পারিব যে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া সংসার ছাড়িয়াছি।

মহা অপরাধিনীর ন্যায় দুর্গা কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমায় ক্ষমা কর। আমি না বুঝিয়া কথা কহিয়াছি। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, আমার বাধা দিবার কি অধিকার আছে? তবে তোমার আমার সম্বন্ধ কেবল ইহলোকে নয়, পরলোকেও, তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। আমার পাপের অংশ তুমি লইবে, তোমার পুণ্যের ভাগ আমি গ্রহণ করিব। বিষয় ভাগ করিয়া লইতে চাও—লও, এ বাড়ী ছাড়িয়া নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যাইতে চাও—চল; কিন্তু আমার মিনতি, একটু বুঝিয়া চল। একমাত্র বংশধর, তাহার বিষয় একটু ভাবিও। তাহার মুখের দিকে চাহিও। আমার নিজের কোনও প্রার্থনা নাই,—আমায় তুমি যে অবস্থায় রাখিবে—তাহাতেই আমি সুখী।"

নলিনী। বাড়ী কিনিতে বা তৈয়ারী করাইতে একটু সময় লাগিবে। কিন্তু আমি আর একদিনও দাদার সংস্রবে থাকিতে চাহি না। আপাততঃ তুমি কিছু দিনের জন্য বাপের বাড়ী গিয়া থাক, আমি বাগানে গিয়া বাস করি। আত্মীয় নিতাই বাবু সালিস্

দুর্গা। ভাল—তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হইবে। কিন্তু তুমি যদি বাগানে গিয়া থাক, আমাকে কাছে রাখিতে বাধা কি ?

নলিনী এবার একটু চটিল ; কর্কশকণ্ঠে উত্তর করিল, "যদি সুবিধা বুঝিতাম, অবশ্যই তোমাকে সঙ্গে রাখিতাম। যদি আমার কথার উপর কথা কও, বোধ হয়, এ মুখ আর দেখিতে পাইবে না।"

উত্তর শুনিয়া দুর্গার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সে আপনাকে আপনি বহু ধিক্কার দিল,—মনে মনে বলিল, 'ছি ! আমার নিজের সুখটাই কি এত বেশী ? স্বামীর যাহাতে সুখ, স্বামীর যাহাতে তৃপ্তি, স্বামীর যাহাতে আনন্দ, সেই আমার স্বর্গ—সেই আমার মোক্ষ—সেই আমার পরমার্থ।'

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে দুর্গার মহিমমণ্ডিত মুখমণ্ডলে,—নীলোৎপল-তুল্য নয়নযুগলে,—পবিত্রতার স্বচ্ছোজ্জ্বল দর্পণ কমনীয় ললাটে যে কাতরতার চিহ্ন—যে বিষাদের ছায়া—যে মর্ম্মস্পর্শিনী করুণার মসীময় চিত্র নলিনী প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে দেখিল,—সে মূর্ত্তি আর নাই ; দুর্গা ধীরা—বীরা—গম্ভীরা ! যেন বিশ্বস্রষ্টার—বিশ্ব-প্রিয় মানসপুত্র বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া—অলক্ষিতে অভিনব সৌন্দর্য্যের অপরূপ উপাদান দিয়া,—দুর্গার দুর্গতিনাশিনী মুখপদ্মখানি—বিচিত্র শোভায় বিকশিত করিয়া—মানবচক্ষুর চরিতার্থতা সাধন করিয়া—আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গিয়াছে।

নলিনী সভয়ে দুর্গার মুখপানে চাহিল ; ধীরে ধীরে কহিল,

"কি ভাবিতেছ ?" দুর্গা উত্তর করিল, "ভাবিতেছিলাম—আমি কি স্বার্থপর! আমি কি আত্মসুখপরায়ণা! আমি কি মহা-পাতকিনী! তোমার সুখের পথে কাঁটা হইতে বসিয়াছিলাম! না-না—আর আমার বলিবার কিছুই নাই। তুমি সুখী হও, তুমি শান্তি পাও, তোমার প্রাণের তৃপ্তি অটুট্ হউক! নিষ্ঠুর কাল সকলের সব চুরী করিতে পারে, কিন্তু অদৃষ্ট লইতে পারে না।" নলিনী আর কোনও কথা কহিতে সাহস করিল না, নীরবে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, নিরুপমার নিরুপমকান্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। আর দুর্গা! দীনদুঃখহরা, দৈত্য-দলনী দাক্ষায়ণীর চরণে আপনার ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব অকাতরে অর্পণ করিয়া যুক্তকরে ডাকিল, 'মা! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া, সহোদরের সহিত একরূপ সম্বন্ধ উঠাইয়া, বৃদ্ধা মাতার বুকে বজ্রাঘাত করিয়া, নলিনী নিরুপমাকে লইয়া বাগানবাড়ীতে আসিয়া বাসা করিল। বহু যত্নে রক্ষিত পৈতৃক উদ্যানবাটী এত দিনে পবিত্র হইল।

বিস্তর জুটিয়াছে। বলা বাহুল্য তাহাদের মধ্যে ক্ষিতীশচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ! সপ্তাহে অন্ততঃ দুইদিন বড় রকমের ভোজের আয়োজন হয়;—'পেলিটী' খানা যোগায়, 'পমারি শ্যাম্পেনে'র স্রোত বহিতে থাকে,—কে কত পান করিবে—কর! ক্রমে টাকার অভাব হইল, নিতাই বাবু 'গয়ংগচ্ছ' করিয়া সালিসীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন,—নলিনী দাদার নিকট দশ হাজার টাকা চাহিয়া পাঠাইল। যামিনীভূষণ উত্তর দিলেন, 'নগদ টাকা কিছুই নাই, যাহা কিছু ছিল, ব্যবসায়ে লোক্‌সান হইয়া গিয়াছে। যদি টাকার বেশী দরকার হয়, বাজার হইতে ধার করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।'

উত্তর শুনিয়া নলিনী যারপরনাই বিস্মিত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে স্বয়ং আসিয়া দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিল। বলিল, "আপনি যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছেন—তাহা কি সত্য? দশ হাজার টাকা নগদ আমাদের ষ্টেটে নাই, এ কথা শুনিয়া লোকে বিশ্বাস করিবে কেন?" যামিনীভূষণ ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিলেন, "লোকে কি বিশ্বাস করিবে—না করিবে—সে কথার কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দিতে বাধ্য নই। যাঁহাকে সালিস মানা হইয়াছে, তিনি কিরূপ নিরপেক্ষ লোক ও সূক্ষ্ম বিচারক, তাহা তোমার অবিদিত নাই। কড়ায় গণ্ডায় তোমার ভাগ বুঝিয়া পাইবে। তবে যে দিন পর্য্যন্ত উভয়ে একান্নভুক্ত ছিলাম, সেই দিন পর্য্যন্ত ব্যবসায়ে যা লোক্‌সান হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক দায়ী তুমি।"

নলিনী। আমি কেন দায়ী হইব? ব্যবসা চালাইলেন আপনি, আপনার বিশ্বাসী বন্ধুবান্ধবেরা চুরীচামারী করিয়া পলাইল,—লাভ যদি কখনও কিছু হইয়া থাকে, আপনিই তাহা ভোগ করিয়াছেন! আমার নাবালক অবস্থায় কি হইয়াছে না হইয়াছে, কিছুই জানি না; আজ পর্য্যন্ত বিষয় সম্পত্তির কোনও খবরই রাখি না; তবে আমি অর্দ্ধেক দায়ী কেন হইব?

যামিনী। সে বিষয়ের বিচার তুমিও করিতে পারিবে না, আমিও করিতে পারিব না। দুই জনে হাত কাটিয়া যাঁহাকে সালিস মানিয়া সই করিয়া দিয়াছি, তিনি যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন, আমরা দুই জনে তাহা মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য।

নলিনী। বেশ কথা। এখন আমার টাকার দরকার, কি উপায় করিব, বলিয়া দিন।

যামিনী। সে কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধার করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যদি ইচ্ছা কর, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি।

নলিনী। ঐটুকু করিলেই আপাততঃ আমি যথেষ্ট উপকৃত জ্ঞান করিব।

যামিনী। উত্তম।

তৎক্ষণাৎ গাড়ী তৈয়ারি করাইয়া, নলিনীকে সঙ্গে লইয়া, যামিনীভূষণ পরিচিত উকীলের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাজনকে সংবাদ দেওয়া হইল। সে দশ হাজার টাকার নম্বরী

নোট লইয়া হাসিতে হাসিতে পুণ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিল! নলিনী স্বাক্ষর করিল, টাকা বুঝিয়া লইল, দলিলে সাক্ষী হইয়া সই করিলেন—স্বয়ং যামিনীভূষণ! তার পর যে যার গাড়ীতে উঠিয়া নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল।

মধ্যপথে যাইতে যাইতে যামিনীভূষণ ভাবিতেছিলেন, 'দলীলে সাক্ষীটা না হইলেই ভাল ছিল! কুলোকে কুকথা কহিতে পারে! যে দিন কাল পড়িয়াছে!'

বাগানবাড়ীর গেটের ভিতর গাড়ী ঢুকিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কেবল একটী কথা নলিনীর মনে জাগিতেছিল, 'দশ হাজার টাকার জন্য বিষয় বন্ধক দিয়া আসিলাম! দলিলে সাক্ষী হইলেন—সহোদর! ভালই হইল, দেনা করিবার ভয় কাটিয়া গেল! সরল সুগম পথ—দাদা নিজে দেখাইয়া দিলেন! আর কিসের ভাবনা?'

এইবার নিরুপমার কথা একটু বলিব। বাগানে আসিয়া বাস করা অবধি সে দিবারাত্রি নলিনীকে কাছে কাছে পায়, নলিনী গল্প করে—সে হাঁ করিয়া শোনে! নলিনী 'রৈবতক' পড়ে, সে 'শৈলজা'র অদ্ভুত আত্মত্যাগের কথা শুনিয়া আপনার ক্ষুদ্রত্বের পরিমাণ বুঝিবার চেষ্টা পায়! নলিনী হাসিলে সে স্বর্গসুখ অনুভব করে; নলিনীর মুখ মলিন দেখিলে, সে জগৎসংসার অন্ধকার দেখে।

প্রত্যহ নিরুপমার মাতা আসিয়া রোজগারী মেয়ের খবর লইয়া যায়, কামিনীগাছের আড়ালে লইয়া গিয়া চুপি চুপি শিক্ষা

দেয়, "দেখ' মা, পীরিতে পড়িয়া আপনার আখের নষ্ট করিও না,—মা বোন্‌কে অকূলে ভাসাইও না!"

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে; সে দিন পূর্ণিমা রজনী—আকাশে একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘও নাই, স্বচ্ছ নীল নভোমণ্ডল, সীমা-হীন, অন্তহীন, তরঙ্গবিহীন সমুদ্রের ন্যায়—যত দূর দৃষ্টি যায়—বহিয়া চলিয়া গিয়াছে; পূর্ণচন্দ্র সেই নীলিমময় সুন্দর সাগর-নীরে দীপ্ত মণিখণ্ডের মত হাসিয়া হাসিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে! জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া তরুলতা আমোদিনী, প্রকৃতি আমোদিনী, মেদিনী আমোদিনী!

চন্দ্রিকাদীপ্ত সরোবরের শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত শুভ্র চাতালে বসিয়া—নলিনী ও নিরুপমা! সহচরবর্গ সকলেই বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, ক্ষিতীশ আজ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আসিতে পারে নাই।

ঢুকু ঢুকু ব্রাণ্ডি চলিতেছে। নিরুপমা আজ ইচ্ছা করিয়া একটু বেশী খাইয়াছে! সে প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিল,—মনটাকে আজ সে আকাশের মত উদার করিয়া ফেলিয়াছে,—চন্দ্রের ন্যায় শান্ত ও উজ্জ্বল করিয়াছে,—প্রস্ফুটিত পুষ্প-রাশিসদৃশ পবিত্র বিচিত্রতায় বিকশিত করিয়া ফেলিয়াছে!

নলিনী বিশেষ চেষ্টা করিয়াও হৃদয়ের গুরুভার আজ আর নামাইতে পারিতেছিল না। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার স্মৃতিপটে উদিত হইতেছিল,—সেই উকীলের আফিস্—সেই টাকা ধার—

বেশী করিয়া একটা ডোস্ ঢালিয়া একনিঃশ্বাসে পান করিল। ধার করা প্রফুল্লতা আসিয়া তাহার বিক্ষিপ্ত চঞ্চল চিত্তকে অল্প-বিস্তর খাড়া করিয়া তুলিল। নিরুপমা নলিনীর বুকে মাথা রাখিয়া মধুরকণ্ঠে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "নলিনী! চির-জীবন এমনি করিয়া কাটিবে কি?"

নলিনী। তোমার কি বিশ্বাস?

নিরুপমা। আমি পাগল—আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা জিজ্ঞাসা করিও না। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি,—না—না, আমাদের আবার ধর্ম্ম কি? তোমার মাথা ছুঁইয়া বলিতেছি, জীবনে কখনও ভালবাসা পাই নাই,—কাহাকেও কখনও ভালবাসি নাই—নিজের প্রাণের আগুনে নিজেই পুড়িয়াছি, কাহাকেও জানিতে দিই নাই। যতক্ষণ থিয়েটারে থাকিতাম, কাজকর্ম্মে পাঁচ জনের সঙ্গে কথাবার্ত্তায়—এক রকম ভুলিয়া থাকিতাম। বাড়ী আসিলেই আমার নরকযন্ত্রণা আরম্ভ হইত। সে যে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা—তুমি বুঝিবে না নলিনী! যাক্—সে সব কথা তুলিয়া ফল কি? সত্য বল—যে দেবতা মান, সেই দেবতার দিব্য করিয়া বল,—যে সৌভাগ্যের রাণী আমায় করিয়াছ, সে পদ-মর্য্যাদা আমার চিরদিন বজায় রাখিবে?

নলিনীর চোখে জল আসিল, চুপি চুপি সে মুছিয়া ফেলিল, নিরুপমাকে জানিতে দিল না, তার পর বলিল, "নিরুপমা! আমি যদি বিবাহ না করিতাম, তুমিও সুখী হইতে—আমিও সুখী

নিরুপমা। তাহাতে কি আসিয়া যায়? তিনি গৃহলক্ষ্মী—রাজরাজেশ্বরী—আমি তোমার পদসেবার দাসী!

সুরা রাক্ষসী বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে অতি বড় কপটীর বুকের শির ছিঁড়িয়া—প্রাণের গোপন কথা টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া আসে! নিরুপমা যাহা বলিল, তাহাতে বেশ্যার চাতুরী ছিল না।

নলিনী আর ও কথার উত্থাপন করিল না, অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিল;—বলিল, "চল নিরুপমা, মুঙ্গেরে বেড়াইয়া আসি; আমি অনেক দিন আগে একবার সেখানে গিয়াছিলাম, স্থানটি আমার মনোরম লাগিয়াছিল। কষ্টহারিণীর ঘাটে স্নান করিলে তুমি বড় তৃপ্তি পাইবে; রাজি আছ?"

নিরুপমা। আমার আবার রাজি অরাজি কি? তুমি যেখানে লইয়া যাইবে, আমি সেইখানেই যাইব।

নলিনী। তোমার থিয়েটার?

নিরুপমা। ছার থিয়েটার! তোমার জন্য ছাড়িতে না পারি কি? এক দিন বুঝাইব নলিনী, নিরুপমা বেশ্যা হইলেও ভালবাসিতে জানে। যাহাকে ভালবাসে, তাহার জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারে। নিরুপমা তোমারই,—এই দেখ পদতলে পড়িয়া!

মদিরা! প্রেমিক প্রেমিকার প্রাণে করুণ রসের আবির্ভাব করিতে তুমিই একমাত্র শক্তিশালিনী!

অভাগিনী দুর্গা এখন কোথায়? আকাশে চাঁদ হাসিতেছে,

জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীর কোমল ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া নলিনী হাসিতেছে, নলিনীর পদতলে পড়িয়া কত সুখের—কত আনন্দের—কত প্রফুল্লতার সুখময় ছবি আঁকিয়া নিরুপমা হাসিতেছে; আর নিরাশ্রয় নিরানন্দ নিদ্রিত শিশুসন্তানটিকে বুকে ধরিয়া—অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া—দুর্গা ভাবিতেছে, 'আমি কোথায়—আমার স্বামী কোথায়!'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে নষ্ট-চন্দ্রের ন্যায় ক্ষিতীশচন্দ্র আসিয়া উদয় হইল। নলিনী বলিল, "ক্ষিতীশ! আজ আমরা মুঙ্গের বেড়াইতে যাইবার মনঃস্থ করিয়াছি, তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

ক্ষিতীশ উত্তর করিল, "আমি আর তোমা ছাড়া কবে বল? তুমি যদি স্বর্গে যাও, আমিও গরুর ল্যাজ ধরিয়া স্বর্গে যাওয়ার মত তোমার সহগামী হইব। তুমি যদি নরকে যাও, সেখানেও আমি তোমার প্রাণের সহচর হইয়া ব্র্যাণ্ডীর বোতল বহন করিয়া লইয়া যাইব। তবে ভাই, আমার সাংসারিক অবস্থা তো তোমার অবিদিত নাই। ফিরিয়া আসিতে অন্ততঃ এক মাস কি দেড় মাস লাগিবেই লাগিবে। আমায় কলিকাতা ছাড়িতে হইলে, নিদেন্

এক মাসের সংসারখরচ আমার পরিবারের হাতে দিয়া তবে যাইতে হইবে।”

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, “সে কত টাকা ?”

ক্ষিতীশ হাসিয়া কহিল, “তোমার এক মিনিটের খরচ ! সে কিছুই নয়, অতি সামান্য। এক শত টাকা নগদ দিলেই হইবে। আর তোমার প্রাইভেট-সেক্রেটারী হইয়া তোমার সঙ্গে যাইতে হইলে, উপযুক্ত কাপড়—জামা—জুতা ইত্যাদি চাই। সে জন্য তোমায় নগদ কিছু দিতে হইবে না। শেট্ কোম্পানীর দোকানে একখানি চিঠি লিখিয়া দিলেই হইবে, আমি নিজের পছন্দ মত বাছিয়া লইব।”

তাহাই হইল। নলিনী ক্ষিতীশকে দশখানি দশটাকার নোট দিল, এবং শেট্ কোম্পানির স্বত্বাধিকারীকে চিঠি লিখিয়া দিল যে, পত্রবাহককে ছয়টী ভাল কামিজ, ছয়টী চিকন্ দেওয়া আদ্ধির পাঞ্জাবী, তিনটী মেরুনার কোট, তিন জোড়া দেশী কাপড়, তিন জোড়া বিলাতী কাপড়, ছয়খানি রুমাল, তিন জোড়া হাফ্ মোজা ও দুই জোড়া পছন্দসই জুতা তাহার হিসাবে দিবে। নোট কয়খানি ক্ষিতীশ কোঁচার খুঁটে ভাল করিয়া বাঁধিল ; বার বার আগ্রহের সহিত শেট্ কোম্পানীর চিঠিখানি পড়িল, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নলিনীকে বলিল, “এমন নইলে মেজাজ ? ঢের ঢের বড়লোকের সঙ্গে মিশিয়াছি, কিন্তু এরূপ মুক্তহস্ত পুরুষ কখনও দেখি নাই। তবে আমি এখন যাই ? বাড়ীতে খরচের টাকা দিয়া, কাপড় চোপড় কিনিয়া, যত শীঘ্র পারি, ফিরিয়া আসিতেছি।”

নলিনী। তোমার কতক্ষণ লাগিবে ?

ক্ষিতীশ। বড় জোর—দুই ঘণ্টা।

নলিনী। বেশ কথা। তবে তুমি আর একটি কাজের ভার লও; হাবড়ার ষ্টেশন-মাষ্টারকে একখানি পত্র দিতেছি, একটি ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করিবার জন্য! তুমি গাড়ী জুতাইয়া শীঘ্র চলিয়া যাও।

নিরুপমা বলিল, "ক্ষিতীশবাবু! আমার একটি বেগার,—অনুগ্রহ করিয়া আপনাকে খাটিতে হইবে। বাড়ী যাইবার সময় একবার আমাদের ওখানে নামিয়া মাকে খবর দিবেন যে, আমি আজ মুঙ্গেরে যাইতেছি; খাওয়া দাওয়ার পর একবার আসিয়া আমার সহিত অতি অবশ্য যেন দেখা করে।" ক্ষিতীশ হাসিয়া বলিল, "তোমার অনুমতি আমার স্বতঃ পরতঃ শিরোধার্য্য।" ক্ষিতীশ চলিয়া যাইবার পর নিরুপমা জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিল। বিদেশে যাহাতে নলিনীর কোনরূপ কষ্ট না হয়, নলিনী যে বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে,—এ অভাব যাহাতে সে কিছুমাত্র বুঝিতে না পারে, নিরুপমা এমনই করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া—বিশেষ করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া, সমস্ত সামগ্রী সঞ্চয় করিল। এমন কি, খড়্‌কে কাটিটী পর্য্যন্ত বাদ দিল না। নলিনী একখানি সোফায় শুইয়া চুপটি করিয়া নিরুপমার গৃহস্থালী দেখিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল, কে বলে—নিরুপমা বেশ্যা? এত গুণ গৃহস্থের ঘরে আছে কি না সন্দেহ!

এইবার নিরুপমা একখানি পত্র লিখিতে বসিল।

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে পত্র লিখিতেছ ?".

নিরুপমা অধর টিপিয়া একটু মধুর হাসি হাসিল, কহিল,—"আমার ভালবাসার লোককে !"

নলিনী। কে সে ভাগ্যবান ! নামটা শুনিতে পাই না ?

নিরুপমা। লেখা শেষ হোক, তার পর একবার তোমায় পড়িতে দিব। এ অনুগ্রহটুকু বোধ হয় করিলেও করিতে পার !

নলিনী। আমার শত সহস্র ধন্যবাদ !

নিরুপমার চিঠি লেখা শেষ হইল, সে হাসিতে হাসিতে পত্র-খানা নলিনীর হাতে দিল। নলিনী সে পত্র বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিল। একবার নয়—দু'বার নয়—তিনবার—বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে কয়েক দণ্ড নিরুপমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; পরে কহিল, "সত্যই কি তুমি থিয়েটার ছাড়িলে নাকি ? তোমার এ পত্র যে মুহূর্ত্তে থিয়েটারের ম্যানেজারের হাতে গিয়া পড়িবে, তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইবেন। সমস্ত আক্রোশটা আমারই উপর আসিয়া পড়িবে, আমার লাঞ্ছনা গঞ্জনার একশেষ হইবে।"

নিরুপমা অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর করিল, "তাই যদি হয়, তুমি তাহাতে পেছ্‌পাও নাকি ? আমি আট বৎসর বয়সে ঐ থিয়েটারে যাই, ঐখানেই মানুষ হই, শিক্ষাগুণে বাজারে সুনাম পাই ; থিয়েটার না থাকিলে তুমিও আমাকে চিনিতে না, আমিও তোমাকে চিনিতাম না ! সেই স্থান—সেই বড় সাধের রঙ্গভূমি—আমি স্বচ্ছন্দে—স্বেচ্ছায়—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ছাড়িয়া দিতেছি,—

মমতার বশবর্ত্তী হইয়া এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিতেছি না, আর তুমি—তোমারই জন্য এত দূর অগ্রসর হইয়াছি,—সেই তুমি —আমার জন্য একটু লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিতে পার না ?”

নলিনী নিরুপমার কথার উত্তর দিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইল না,—কিন্তু সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিল, এ বন্ধন চিরজীবনের ! সৃষ্টি লুপ্ত হইবে, চন্দ্রসূর্য্য কক্ষচ্যুত হইবে, সংসার রসাতলে যাইবে, তথাপি যে সোনার শৃঙ্খল সে পায়ে পরিয়াছে, তাহা ইহজীবনে টুটিবার নয়।

এমন সময় নিরুপমার মাতা আসিয়া উপস্থিত হইল। কন্যাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, আঁবগাছের তলায় বসিয়া, সে অনেক কথা কহিল,—অনেক কথা শুনিল। বেশ বুঝিল,—মেয়েটা মজিয়াছে, আর উপায় নাই। নিরুপমার গলা ধরিয়া খুব খানিকটা চোখের জল ফেলিল, ভগবান দেখাইল, সর্ব্বনাশ হইবে—জানাইল ; পরিশেষে থিয়েটারের অধ্যক্ষের নামের পত্রখানি লইয়া—একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, নলিনীকে অভিশাপ দিতে দিতে বিদায় গ্রহণ করিল।

যথাসময়ে ক্ষিতীশ আসিয়া পঁহুছিল। বেলা তিনটার গাড়ী, আর বিলম্ব করিলে ট্রেণ ফেল্ হইবে—এ কথা জানাইল। তৎক্ষণাৎ জিনিস-পত্র লোক জন চাকর বামুন ইত্যাদি ষ্টেশন অভিমুখে রওনা করা হইল। তিনটা বাজিতে বিশ মিনিট বাকি, এমন সময়ে নলিনী, নিরুপমা ও ক্ষিতীশ ষ্টেশনে আসিয়া রেলওয়ে-কর্ম্মচারীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। গাড়ী পূর্ব্ব হইতেই

রিজার্ভ করা ছিল। তিন জনে গাড়ীতে উঠিল; দেখিতে দেখিতে বেল্ পড়িল, ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে, এমন সময় ট্রেণ আসিয়া রামপুরহাট ষ্টেশনে থামিল। পূর্ব্ব হইতেই ব্র্যাণ্ডী চলিতেছিল,—নলিনী ও নিরুপমার তখন ভরপুর নেশা। ক্ষিতীশ বসিয়া বসিয়া মজা দেখিতেছিল, আর মনে মনে হাসিতেছিল। নলিনীর হাত নিরুপমার হাতের ভিতর ছিল,—নিরুপমা এলাইয়া পড়িয়া, নলিনীর বুকে মাথা রাখিয়া,—আরোহিগণ উঠিতেছে; নামিতেছে; রেলওয়ে-কর্ম্মচারিগণ চীৎকার করিতেছে; পান সিগারেট খাবার লইয়া ফেরীওয়ালারা এ গাড়ী ও গাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—একাগ্রমনে তাহাই দেখিতেছিল।

এমন সময় নলিনী বলিল, "এতক্ষণে তোমার চিঠি থিয়েটারের ম্যানেজারের হাতে পড়িয়াছে। তোমার আমার নাম লইয়া সেখানে খুব একটা আন্দোলন চলিতেছে! কেহ হাসিতেছে—কেহ বিদ্রূপ করিতেছে,—কেহ গালি দিতেছে! নিরুপমা! ছেলে-বেলা হইতে যে থিয়েটার তোমার সর্ব্বস্ব ছিল, তাহা ছাড়িয়া আসিতে প্রাণে তোমার খুব চোট লাগিয়াছে,—নয়?"

নিরুপমা কহিল, "ও কথা আবার কেন নলিনী? যাহা ছাড়িয়াছি—যাহা ভুলিয়াছি—যাহার স্মৃতি মন হইতে একেবারে উপাড়িয়া ফেলিয়াছি, সে প্রসঙ্গের উত্থাপন আবার কেন? আমার জন্য আমি ভাবি না, আমার নিন্দা সুখ্যাতিতে কি আসিয়া যায়, সহস্র পুণ্য-কর্ম্ম করিলেও—আমি যে বেশ্যা—সেই বেশ্যা!

সত্য বলিতে কি—থিয়েটারকে আমি খুব ভালবাসিতাম, এখনও ভালবাসি। থিয়েটারের কুৎসা কেহ করিলে এখনও আমার প্রাণে ব্যথা লাগে। আমি কি ভাবিতেছি, জান? তুমি কুপথগামী হইলে—তুমি সংসারের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলে,—আত্মীয়স্বজনের বক্ষে শেলাঘাত করিলে,—পাঁচ জনে বলিবে, থিয়েটারই তার কারণ! থিয়েটার না দেখিলে তোমার অধঃপতন হইত না! থিয়েটার না থাকিলে তুমি আমায় চক্ষেও দেখিতে না! এ কথা যখন আমার মনে হয়, বুকটা যেন ফাটিয়া যায়! তোমার আমার মিলন যদি বিধাতার অভিপ্রেত হইত, আমি সাগরগর্ভে—পর্ব্বতগুহায়—লুক্কায়িত থাকিলেও,—তুমি আমায় খুঁজিয়া বাহির করিতে, আমায় চরণে স্থান দিতে, আদর করিয়া আমায় জীবন-সঙ্গিনী করিতে,—এ কথা কে বুঝিবে? যত দোষ—থিয়েটারেরই হইবে। এই চিন্তায় আমি বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি, মনের ভিতর ঘোরতর অশান্তি যেন রাজত্ববিস্তার করিয়া বসিয়াছে।”

এ কি বলে? নিরুপমা এত কথা শিখিল কোথা হইতে? এত জ্ঞান—এত গভীরতা—এত উচ্ছ্বাস—এত আবেগ—এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা—মানবজীবনের অভিশাপ—বার-বিলাসিনীর প্রাণে কে ঢালিয়া দিল?

নলিনী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; ধীরে ধীরে—অতি যত্নে—অতি সন্তর্পণে—নিরুপমার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া প্রাণ ভরিয়া একবার দেখিয়া লইল! এ কি? এ যে পলকে নূতন! এত সুন্দর—এত মনোহর—এত উন্মাদকর—সে জন্ম

জন্মান্তরেও কখনও কল্পনাও করে নাই! নলিনী বলিল, "দেখ নিরুপমা! যে নিন্দুক—ছিদ্র অন্বেষণ করা তার পক্ষে অতি সহজ। তীর্থস্থানে—দেব-মন্দিরে—ভজনালয়ে উপস্থিত হইয়া, কত শত নরনারী নরকের পথ প্রশস্ত করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার প্রমাণ যিনি চান, আমি হাজার হাজার ইংরেজি বাঙ্গালা বই হইতে বাহির করিয়া দিতে পারি। অনর্থক ভাবনায় মনকে বিচলিত করিয়া জীবনের শান্তি নষ্ট করিও না, এই আমার অনুরোধ।"

ক্ষিতীশ দেখিল, আদি-রসাত্মক নাটক যেরূপ জমাট হইয়া উঠিতেছে, সমস্ত রাত্রির মধ্যে বোধ হয় যবনিকাপতন আর হইবে না! এ দিকে রাত্রিও হইয়া আসিতেছে, পেটও জ্বলিতেছে, আহারাদির আয়োজন না করিলে আর ত' চলে না! এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? চাহিয়া দেখিল, নিরুপমা ও নলিনী উভয়েই নিদ্রিত। ব্র্যাণ্ডীটা আজ প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত কাজ করিয়াছে। স্নেহময়ী জননীর ন্যায়—প্রেম-পীড়িত পুত্রকন্যাকে ঘুম পাড়াইয়া দিয়া, রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিয়াছে। তাড়া-তাড়ি ভাল ভাল খাবার বাছিয়া লইয়া প্রাণ পুরিয়া ভক্ষণ করিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র 'শয়নে পদ্মনাভ' করিল।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুঙ্গের ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। ফোর্টের মধ্যে একটী সুরম্য অট্টালিকা নির্ব্বাচিত করিয়া, নলিনী তথায় গিয়া উঠিল। সুসজ্জিত গৃহ—সুরম্য উদ্যান—প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখিয়া,—নিরুপমা যারপরনাই প্রীতিলাভ

করিল। এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোত তাহার প্রাণের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায়—মুক্ত আকাশে উড়িয়া বেড়াইয়া—স্বাধীনতার সৌম্য-সঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া—সে যেন সংসার—সমাজ—স্বজন—সব ভুলিয়া গিয়া—নবজীবনে উদ্ভাসিত হইয়া নব কলেবর ধারণ করিল।

কষ্ট-হারিণীর ঘাটে স্নান করিবার জন্য নলিনী নিরুপমাকে লইয়া গেল,—নিত্যসহচর ক্ষিতীশচন্দ্রও সহগামী হইল।

পুণ্যসলিলা—পূত-প্রবাহিণী—দীনজনদুঃখহারিণী—সাগরগামিনী—সুরতরঙ্গিণী—পূর্ণযৌবনা যুবতীর মত—আপনার ভাবে বিভোরা হইয়া—সমগ্র পৃথিবীকে তুচ্ছ করিয়া—বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া—নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। নিরুপমা ও নলিনী একগলা জলে নামিল।

ক্ষিতীশচন্দ্র দক্ষিণ হস্তে স্বীয় উপবীতটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে—মাথা মুণ্ড মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে—ভাগীরথীর বক্ষে আসিয়া পাপতাপজড়িত দেহ নিমজ্জিত করিল। নিরুপমা অনেকদিন গঙ্গাস্নান করে নাই, জাহ্নবীর জীবন্ত বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া—সে যেন নবজীবন লাভ করিল। বহুদিনের হৃদয়ের সন্তাপ, সন্তাপহারিণী—নিস্তারিণী মা জননী যেন নিজ হস্তে মোচন করিয়া দিলেন।

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে নিরুপমা বলিল, "নলিনী! তুমি মা গঙ্গাকে ভক্তি কর?"

নলিনী বলিল, "করি।"

নিরুপমা। মা গঙ্গাকে মান কি ?

নলিনী। মানি।

নিরুপমা। একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া, আমি তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার সত্য উত্তর দিতে প্রস্তুত আছ কি ?

নলিনী। আছি।

নিরুপমা। শপথ করিয়া বল, আমায় কখনও ত্যাগ করিবে না ?

নলিনী। করিব না।

নিরুপমা। আমার সহিত কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না ?

নলিনী। করিব না।

নিরুপমা। আমি যাহাতে মনে ব্যথা পাই, এমন কাজ করিবে না ?

নলিনী। করিব না।

নিরুপমা। আমি ও তোমার স্ত্রী ছাড়া—আর কোনও স্ত্রীলোকের মুখ দেখিবে না ?

নলিনী। দেখিব না।

নিরুপমা। আর আমার বলিবার কিছুই নাই। তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করিবে কি ?

নলিনী। করিব।

নিরুপমা। আমি প্রস্তুত।

নলিনী। আমার সহিত তোমার সম্বন্ধ দুই দিনের—না চিরদিনের ?

নিরুপমা। চিরদিনের।

নলিনী। আমায় তুমি যথার্থ ভালবাস? না—চোখের নেশা?

নিরুপমা। যথার্থ ভালবাসি, চোখের নেশা নয়।

নলিনী। দৈববিড়ম্বনায় যদি কখনও তোমার সহিত আমার ছাড়াছাড়ি হয়, আর কখনও—

নিরুপমা। বুঝিয়াছি—এ জীবনে নয়।

নলিনী। আর আমার জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই।

নিরুপমা। শোন নলিনী! কান পাতিয়া শোন,'—মা গঙ্গা বলিতেছেন, তোমার আমার কঠোর শপথের সাক্ষী রহিলেন—তিনি! এ ধর্ম্মের অঙ্গীকার যে ভঙ্গ করিবে, এ পৃথিবীতে সে কখনও সুখী হইতে পারিবে না।

অর্দ্ধঘণ্টা কাল গঙ্গার জলে থাকিয়া ক্ষিতীশ মনে করিল, এ প্রেমের স্রোত আর বেশী গড়াইতে দিলে, শেষে সাগর-সঙ্গমে মিশিবে! এরই মধ্যে সর্দ্দির ভাব দেখা দিয়াছে! এখন বাসায় ফিরিয়া—দুটি ভাত পেটে দিতে পারিলেই বাঁচি! পরে নলিনী ও নিরুপমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমি সাক্ষী রহিলাম, মা গঙ্গা সাক্ষী রহিলেন, ব্রহ্মাণ্ডদেব সাক্ষী রহিলেন, সূর্য্যদেব সাক্ষী রহিলেন, যে দিব্যি গালা হইল, যিনি তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিবেন, ইহকালের দফা তো রফা হইবেই, পরকালের মুখেও তাঁর ছাই পড়িবে!"

নলিনী কহিল, "আমি রাজি!"

নিরুপমা বলিল, "আমিও খুব রাজি!"

মাসাবধি কাল মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়া—প্রেমের নিগড় আরও দৃঢ়রূপে চরণে পরিয়া—নলিনী নিরুপমাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। পৈতৃক উদ্যানবাটী এতদিন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল,—নায়কনায়িকার পদার্পণে তরুলতা মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল, পুষ্করিণীর জল নাচিতে লাগিল, প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ড আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সজীব মূর্ত্তি ধারণ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যেদিন নলিনী ও নিরুপমা মুঙ্গের হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, সেইদিন বৈকালে নিরুপমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী মাথা চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে ও চোখের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে, শশব্যস্তে আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাহাদের মাতা মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা; যদি শেষ দেখা দেখিবার ইচ্ছা হয়, এই মুহূর্ত্তে যাইলে দেখা হইতে পারে।

হাজার হ'ক—মা ত' বটে! নিরুপমার নলিনীময় প্রাণটার ভিতর ঝনাৎ করিয়া উঠিল! বহুদিনের বক্ষো-মধ্যস্থিত রুদ্ধ-কক্ষের অর্গল উন্মোচন করিয়া, পুরাতন স্মৃতির যবনিকা তুলিয়া কে যেন নিরুপমার শৈশবের—কৈশোরের—নব-প্রস্ফুটিত যৌবনের—

করুণার ও কৃতজ্ঞতার অমৃত-সিক্ত দৃশ্যগুলি তাহার নয়নের উপর একে একে প্রদর্শিত করিতে লাগিল। সেই জীর্ণ কুটীর—সেই মলিন শয্যা—সেই—তাহার মাতার বুকের রক্ত দিয়া তাহাকে প্রতিপালন—সেই—কোথাও একটি ভাল সন্দেশ বা মিঠাই পাইলে তাহাকে সযত্নে প্রদান—সেই তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাহার মাতার ভবিষ্যতের কত সুখের কল্পনা—একে একে একে—সন্ধ্যার তারকার মত—নিরুপমার হৃদয়াকাশে একটির পর একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না,—চঞ্চলপদে চঞ্চলচিত্তে নলিনীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনী তখন একখানি ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সট্‌কার নল মুখে দিয়া আপন-মনে ভাবিতেছিল, "জীবন-স্রোত কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, আবার কে জানে কোথায় গিয়া মিশিবে?"—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুরত্ন ক্ষিতীশচন্দ্রের এখনও দেখা নাই। অন্যান্য সহচরবর্গ হল্‌ঘরে বসিয়া তাস খেলিতেছিল। নিরুপমা নলিনীকে তাহার মাতার অসুখের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার বুক ফাটিতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছিল না যে,—"অনুমতি দাও—মাকে একবার দেখিয়া আসি!" নলিনী সকলই বুঝিল। তৎক্ষণাৎ গাড়ী জুতাইয়া, এক জন বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে দিয়া নিরুপমাকে তার মা'র বাড়ী পাঠাইয়া দিল। যাইবার আগে নিরুপমা নলিনীর হাত দুটি ধরিয়া বলিয়া গেল, "আমি সেখানে থাকিব না—থাকিতে পারিব না—একবার দেখিয়াই চলিয়া

আসিব।” নলিনী উত্তর দিবে কি, তাহার প্রাণে তখন প্রলয়ের ঝড় উঠিয়াছে—পৃথিবী টল্‌মল্ করিতেছে—এইবার বুঝি রসাতলে যাইবে! কি জানি—কেন তাহার মনে হইতেছিল, আর বুঝি নিরুপমা ফিরিবে না, আর বুঝি তাহার সহিত দেখা হইবে না, বিচ্ছেদের ঘনান্ধকার যেন তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতেছে!

সে যাহা হউক, নিরুপমা চলিয়া গেল। নলিনী তাস খেলিতে বসিল; ভাল লাগিল না, উঠিয়া পড়িল। হারমোনিয়ম্ লইয়া পুরবী বাজাইতে লাগিল, পরদা ঠিক হইল না, বিরক্ত হইয়া বাদ্য-যন্ত্র ত্যাগ করিল। পুষ্করিণীতে একখানি ছোট নৌকা বাঁধা ছিল। তাহার উপর চড়িয়া দাঁড় ধরিয়া বসিল; দুই একবার এপার ওপার করিল, কিন্তু তাহাতেও শান্তি পাইল না। শেষে সজ্জা-গৃহে প্রবেশ করিয়া, আল্‌মারী খুলিয়া নিজের হাতে চার আউন্স্ ব্র্যাণ্ডী ঢালিয়া এক চুমুকে পান করিয়া ফেলিল। বন্ধুবর্গ কাছে আসিলে, নলিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহাদের সরিয়া যাইতে বলিল। এমন সময় একখানি থার্ডক্লাস্ গাড়ী চড়িয়া ক্ষিতীশচন্দ্র বাগানে প্রবেশ করিল। নলিনা তখন পুকুরঘাটের চাতালের উপর একটী তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া, কেমন করিয়া ছোট ছোট মেঘগুলি একত্রিত হইয়া এক পসলা বর্ষণ করিবার সূচনা করিতেছিল, তাহাই একাগ্রদৃষ্টিতে দেখিতেছিল। ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাত বৃষ্টিপাত আজ তাহার কি করিবে? যাক্—পৃথিবী ডুবিয়া, যাক্—সংসার ভাসিয়া যাক্—

প্রকৃতি পুড়িয়া যাক্—নলিনী ভাবিতেছিল, মরিতে ত হইবেই, তবে আজই সব শেষ হো'ক না কেন! আমি যাই—দুর্গা যাক্—নিরুপমা যাক্—স্রষ্টার সৃষ্টি ওলট্ পালট্ হইয়া যাক্, কেবল বাঁচিয়া থাকুক—আমার একমাত্র বংশধর—সেই সংসারজ্ঞান-অনভিজ্ঞ দুগ্ধপোষ্য বালকটি!

নলিনীর ভাব দেখিয়া ক্ষিতীশ যারপরনাই আশ্চর্য্য হইল, গদগদ স্বরে—করুণার প্রস্রবণ ছুটাইয়া নলিনীর কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে; যদি ব্রহ্মহত্যা দেখিতে না চাও, তবে শীঘ্র বল—এরূপ ধূলিধূসরিত অবস্থায় এমন করিয়া পড়িয়া কেন?" নলিনী উত্তর দিল, "ভাই! নিরুপমা চলিয়া গিয়াছে।" ক্ষিতীশের চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এঁ্যা—নিরুপমা চলিয়া গিয়াছে? এ খবর পাইবার আগে আমি মরিলাম না কেন? সে যে আমার ভগিনীর অধিক ছিল। আর আমায় তেমন যত্নে, নিজের হাতে তৈয়ারি করিয়া পরোটা ও মাছ-ভাজা কে খাওয়াইবে? ওরে ভাই নলিনী—আমি আজ সহোদরাহারা হইয়া ত্রিসংসার অন্ধকার দেখিতেছি! হঠাৎ কি রোগে আক্রান্ত হইয়া সে চলিয়া গেল ভাই?" আবার কান্না—আবার হু হু করিয়া চোখ দিয়া জল,—শেষে ধূলায় পড়িয়া ক্ষিতীশচন্দ্রের ঘোরতর আর্ত্তনাদ!

নলিনী একে একে সমস্ত ঘটনা তাহাকে বুঝাইয়া বলিল। কথা শেষ হইতে না হইতেই ক্ষিতীশ একটী ভয়ানক রকম লম্ফ

প্রদান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সব ছাড়িতে পারা যায়, পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কার ছাড়িতে পারা যায় না! পরে নলিনীর গলা জড়াইয়া মমতামথিতকণ্ঠে কহিতে আরম্ভ করিল, "তাই বল—নিরুপমার কিছু হয় নাই, অসুখ হইয়াছে তাহার মাতার! তা—সে বুড়ো মাগীর ভব-সংসার হইতে বিদায় লইবার সময় ত বহু-পূর্ব্বেই হইয়াছে; এই বেলা যদি ভালয় ভালয় সরিয়া যায়, তাহার পক্ষেও মঙ্গল—আমাদের পক্ষেও মঙ্গল।"

নলিনী কহিল, "ছি! লোকের মরণ কামনা করিতে নাই। কে জানে ভাই—কেন আমার মনে হইতেছে, নিরুপমা বুঝি আর আসিবে না—সে বুঝি পর হইয়া গেল—এত যত্নে যাহার সুখের জন্য সংসার পাতিলাম, তাহাকে বুঝি আর পাইব না।" ক্ষিতীশ একটা বিকট হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "বলিহারি তোমার কল্পনাশক্তি! তুমি ভিন্ন নিরুপমার আর গতি মুক্তি নাই। সে তোমাতে মজিয়াছে—একান্তে ভজিয়াছে—তুমিই এখন তার সর্ব্বস্ব। মা'র অসুখ শুনিয়া একবার দেখিতে গিয়াছে, তাহাতে ভাবনার বিষয় কি আছে?"

নলিনী কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহারই গাড়ী তীরবেগে বাগানের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। যে বিশ্বস্ত অনুচর নিরুপমার সঙ্গে গিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া নলিনীকে খবর দিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে! নিরুপমার মা'র অসুখের কথা সমস্তই মিথ্যা; নিরুপমাকে বাড়ীর মধ্যে পুরিয়া তাহার মহিষমর্দ্দিনী ভগিনী আমাকে গলাধাক্কা দিয়া রাস্তায় বাহির

করিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সদর দরজার হুড়কা বন্ধ করিয়া ফেলিল! কেবলমাত্র একবার নিরুপমার ক্ষীণস্বর আমার কাণে প্রবেশ করিয়াছিল,—সে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "বাবুকে গিয়া খবর দাও—আমাকে জোর করিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছে, যেমন করিয়া হউক—এই দণ্ডে আসিয়া আমাকে উদ্ধার করুক!" আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া নলিনী উঠিল—ছুটিল; নক্ষত্রগতিতে ছুটিল, বিদ্যুৎবেগে ছুটিল;—গায়ে জামা নাই, পায়ে জুতা নাই, রুক্ষকেশ, বিশৃঙ্খল-বেশ, জ্যোতিঃহীননয়ন, লাবণ্যহীনবদন,—সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত যদি যাইতে হয় তাহাতেও স্বীকার,—এই দৃঢ় সংকল্প লইয়া নলিনী ছুটিয়াছে। পশ্চাতে ক্ষিতীশচন্দ্র ও এক জন দরওয়ান। বৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল, চপলা চমকিয়া উঠিল, ক্ষণে ক্ষণে ভীম ভৈরবনাদে বজ্রনির্ঘোষে ভয়ঙ্করী প্রকৃতি আপনার ভৈরবী মূর্ত্তি প্রকটিত করিতে লাগিল। নলিনীর সে দিকে দৃষ্টি নাই, সে চলিয়াছে। কোথায়—কোন্ পথে—কি উদ্দেশে চলিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। ক্ষিতীশচন্দ্র মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল; মনে মনে বলিল, "বাবা! প্রেমের দায়ে যে আমাদের প্রাণ যায়। গাড়ীখানা জুতাইবারও তর সহিল না!" সৌভাগ্যক্রমে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল,—ক্ষিতীশ গাড়োয়ানকে খুসী করিয়া দিবে বলিয়া, নলিনীকে গাড়ীতে উঠাইল। দরওয়ান কোচবাক্সে বসিল। ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে? নিরুপমার বাড়ীতে?" নলিনী—"না!" ক্ষিতীশ—"তবে

কোথায় ?” নলিনী—“থানায় !” ক্ষিতীশ—“থানায় কেন ? কোনো পুলিস-হাঙ্গাম করিবে নাকি ? যাহাই কর, একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া করিও,—শেষে বিপদে পড়িতে না হয়।” এই-বার নলিনী একটু ক্রুদ্ধ হইল,—কহিল, “তোমার ভয় হয়, চলিয়া যাইতে পার,—আমি তোমায় সঙ্গে আসিবার জন্য অনুরোধ করি নাই।” ক্ষিতীশ আর কথা কহিল না, চুপটি করিয়া বসিয়া আপনার দারিদ্র্য ও অদৃষ্টকে বিক্কার দিতে লাগিল। আদেশানু-যায়ী থানার সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। নলিনী ও ক্ষিতীশ থানার ভিতর প্রবেশ করিয়া—একেবারে ইন্‌স্‌পেক্টার যেখানে বসিয়া ডায়েরি লিখিতেছিল, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। ইন্‌স্‌পেক্টার নলিনীকে বিলক্ষণ চিনিত; এরূপ বেশে—এরূপ অবস্থায় নলিনীকে দেখিয়া সে যারপরনাই বিস্মিত হইল; জিজ্ঞাসা করিল, “ব্যাপার কি ?” নলিনী নিরুপমা-সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্ত ইন্‌স্‌পেক্টারের নিকট বিবৃত করিয়া শেষে বলিল,—“ইহার কোনও উপায় হইতে পারে কি ?” ইন্‌স্‌পেক্টার কহিল,—“আপনি যদি নিশ্চিত আমাকে বলিতে পারেন যে, নিরুপমা আপনাকে চায়, তাহার মাতা অথবা ভগিনীর নিকট থাকিতে রাজি নয়, তাহা হইলে আমি এই দণ্ডেই তাহাকে আনিয়া আপ-নার নিকট উপস্থিত করিয়া দিতে পারি।” নলিনী উত্তর করিল,—“আমার যত দূর বিশ্বাস, সে আমাকেই চায়, আর কাহাকেও চাহে না।” “ভাল, দেখা যাক্”—বলিয়া ইন্‌স্‌পেক্টার উঠিল, বেশপরিবর্ত্তন করিল, এক জন হেড্ কন্‌ষ্টেবল ও

এক জন পাহারাওয়ালা সঙ্গে লইয়া নিরুপমার বাটীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। নলিনী ও ক্ষিতীশ থানায় বসিয়া রহিল। সদর-দরজা বন্ধ, অনেক ডাকাডাকি হইল, ভিতর হইতে কেহ সাড়া দিল না। এক—দুই—তিন—পদাঘাতে দ্বার ভঙ্গ হইল, ইন্‌স্‌পেক্টার বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল, নিরুপমার মাতা ও ভগিনী তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিতেছে। ইন্‌স্‌পেক্টার বলিল—"নিরুপমা কোথায়?" নিরুপমার মাতা উত্তর দিল,—"সে উপরের ঘরে ঘুমাইতেছে।" "আমি তাহার সহিত দেখা করিতে চাই,"—এই বলিয়াই ইন্‌স্‌পেক্টার একেবারে দ্বিতলে গিয়া উঠিল। উপরে একটিমাত্র ঘর; দেখিল—বাহির হইতে তালা বন্ধ; উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"ঘরের মধ্যে কে আছ?"—ভয়-চকিত কণ্ঠে নিরুপমা বলিয়া উঠিল, "আমায় জোর করিয়া আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে, আমায় উদ্ধার করুন।" ইন্‌স্‌পেক্টারের হুকুমে তৎক্ষণাৎ চাবি খোলা হইল, নিরুপমা ঘরের বাহিরে আসিয়া ইন্‌স্‌পেক্টারের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল,—"আমায় রক্ষা করুন।"

ইন্‌স্‌পেক্টার। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দাও।

নিরুপমা। কি জিজ্ঞাসা করিতে চান—করুন।

ইন্। তুমি তোমার মার নিকট থাকিতে চাও—না নলিনী বাবুর কাছে যাইতে চাও?

নিরু। আমি নলিনীবাবুর কাছে যাইতে চাই।

নিরুপমার মাতা গর্জ্জিয়া উঠিল, কহিল, "আঁতুড়ঘরে তোর মরণ হইল না কেন? এই জন্যই কি তোকে গর্ভে ধরিয়াছিলাম?"

নিরুপমার ভগিনীও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ইন্‌স্‌পেক্টারের ধমক খাইয়া আর কোনও কথা কহিতে সাহস করিল না।

নলিনী থানায় অপেক্ষা করিতেছে, এ সংবাদ ইন্‌স্‌পেক্টারের মুখে শুনিয়া, নিরুপমা কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমায় সেই-খানে লইয়া চলুন; আমি আর এক দণ্ড এখানে থাকিতে চাহি না।"

সর্ব্বাগ্রে ইন্‌স্‌পেক্টার, মধ্যে নিরুপমা, তৎপশ্চাৎ হেড্ কনষ্টবল ও পাহারাওয়ালা,—এই ভাবে সকলে আসিয়া থানায় পঁহুছিল। নলিনী এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, "কি হয় কি হয়, রণে জয় পরাজয়!"

ইন্‌স্‌পেক্টার হাসিতে হাসিতে আসিয়া নলিনীকে বলিল, "Here is your lost treasure!"

নলিনী কৃতজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হইয়া কি উত্তর দিবে, কিছু ঠিক করিতে পারিল না। "গুরুজীকি জয়!" বলিয়া বগল বাজাইতে বাজাইতে ক্ষিতীশচন্দ্র নিরুপমাকে গাড়ীতে তুলিল। নলিনী উঠিল; দরওয়ান "নারায়ণজী কি জয়!" জপিতে জপিতে গাড়োয়ানের পাশে গিয়া বসিল; গাড়ী ছাড়িয়া দিল; নিরুপমার মাতা ও ভগিনী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

'ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন' "ওয়াটারলু"র যুদ্ধ জয় করিয়া যেরূপ আনন্দে ও উৎসাহে স্ফীত হইয়াছিলেন, নলিনীর অদ্যকার আনন্দ ও উৎসাহ তাহা অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে, বরং অধিক !

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বৎসরাবধি হইতে নলিনী বাগানে আসিয়া বাস করিতেছে। ইতিমধ্যে তাহার প্রায় লক্ষ টাকার কাছাকাছি দেনা হইয়াছে। সম্পত্তিবিভাগ এখনও শেষ হয় নাই ; আত্মীয় নিতাই বাবুর সময় খুব অল্প, নিজের কাজ লইয়াই ব্যস্ত, কাজেই সালিসীর ব্যাপার ধীরপদবিক্ষেপে চলিতেছিল। এরূপ অবস্থায় দেনা করা ভিন্ন আর উপায় কি ? নলিনী একদিন সকালে উঠিয়া নিতাই বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল, বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, নিজের বিষয় থাকা সত্ত্বেও বেশী সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে হইতেছে—তাহাও জানাইল। নিতাইবাবু যেরূপ ভাবে উত্তর দিলেন, তাহাতে নলিনী মনে মনে বিশেষ চটিল। এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে একটু বচসাও হইল। শেষে নিতাইবাবু বলিলেন,—"তিন দিনের মধ্যে তিনি অ্যাওয়ার্ড (Award) দিবেন।" যথাসময়ে নিতাই বাবুর বিচারফল প্রকাশিত হইল। যামিনীভূষণ ব্যবসায়ে যা

লোক্‌সান দিয়াছেন, সংসারের অতিরিক্ত খরচ যাহা হইয়াছে, দেশভ্রমণ, গাড়ী ঘোড়ার খরচ, আমোদ প্রমোদে ব্যয়—এ সকলের জন্য নলিনীর ভাগ হইতে অর্দ্ধেক যাইবে, নিতাই বাবু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন। নলিনী কেবলমাত্র একটিবার জিজ্ঞাসা করিল—"আমার মত লইয়া ব্যবসা করা হয় নাই, সংসারের অতিরিক্ত খরচের বিষয় আমি কিছুই জানি না, গাড়ী ঘোড়া আমি কখনও চড়িতে পাই নাই, আমোদ প্রমোদে কখনও যোগদান করি নাই, তবে আমি এ সব বিষয়ের জন্য দায়ী হইলাম কেন?" নিতাইবাবু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমার বিবেচনার মত আমি কার্য্য করিয়াছি; তোমার যদি মনঃপূত না হইয়া থাকে, আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে পার।" নলিনী, "ভাল—তাহাই হইবে" বলিয়া চলিয়া আসিল।

নালিশের যোগাড়-যন্ত্র হইতে লাগিল; উকীল ব্যারিষ্টারের সহিত পরামর্শ চলিল; অনেক আত্মীয়-স্বজন নলিনীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিল। কিন্তু টাকার অভাব;—হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা করিতে হইলে অনেক টাকার প্রয়োজন। সম্পত্তি দুইবার মর্টগেজ হইয়াছে, আর কেহ টাকা দিতে চাহে না। এ দিকে দুই তিন জন পাওনাদার নলিনীর নামে নালিশ রুজু করিল; তাহার মধ্যে একজন ডিক্রী করিয়া তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিল। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, কেহ কেহ কাণা-ঘুষা করিতে লাগিল,—যামিনীভূষণের প্ররোচনাতেই এইরূপ হইতেছে। নলিনী প্রমাদ গণিল; মনে

মনে বুঝিল—বেশ একখানি চক্রান্তজাল তাহাকে জড়াইবার জন্য বিস্তৃত হইতেছে।

সংসারে স্বার্থ ও অর্থ এত বলবান, সহোদর সহোদরের বুকে ছুরী দেয়; এক দিন সব ছাড়িতে হইবে জানিয়াও অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না,—ইহার পূর্ব্বে সে এতটা বুঝে নাই!

একদিন বিকালে নিরুপমা বেল ও জুঁই ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে বসিয়াছে, এমন সময়ে নলিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরুপমা জিজ্ঞাসা করিল,—"এত দেরি কেন? কোন্ সকালে দুটি ভাত মুখে দিয়া বাহির হইয়াছিলে, সন্ধ্যা হয় হয়—এখন আসিলে! আজকাল তোমার এত কি কাজ পড়িয়াছে? আমায় বল না কেন? তোমার মুখে চিন্তার চিহ্ন তো কখনও দেখি নাই, এখন এত ভাব' কেন? জিজ্ঞাসা করিলে উড়াইয়া দাও,—আমি কি তোমার সুখ দুঃখের অধিকারিণী নই?"

নলিনী বলিল, "আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত;—আমার নামে ওয়ারেণ্ট্ বাহির হইয়াছে। বোধ হয় আমাকে জেলে যাইতে হইবে।" নিরুপমা কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "ও কি কথা মুখে আনিতেছ? আমার বুক কাঁপিতেছে, প্রাণের ভিতর পুড়িয়া যাইতেছে! সব কথা আমায় খুলিয়া বল।"

নিতাই বাবুর সালিসীর বিচার-ফল, জ্যেষ্ঠ যামিনীভূষণের নামে নালিশ করিবার সংকল্প, টাকার দারুণ অভাব, পাওনাদার-গণের নালিশরুজু, এক জনের ডিক্রী করিয়া ওয়ারেণ্ট বাহির করা, একে একে সকল কথাই নলিনী নিরুপমাকে বিস্তারিত

জানাইল ; শেষে বলিল, "আজ জজ সাহেবের কাছে দরখাস্ত করিয়া ডিক্রীর টাকা দিবার জন্য দুই মাস সময় চাহিয়াছিলাম, সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই। কাল বেলা বারোটার মধ্যে সমস্ত টাকা না দিতে পারিলে আমায় জেলে যাইতে হইবে।"

নিরুপমা সব কথা শুনিল, চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল ; মনে মনে কি ভাবিল, পরে কহিল, "দেখ নলিনী ! ভাবিবার সময় আর নাই, হা হুতাশ করিয়া আমি খানিক চোখের জল ফেলিব—তুমি খানিক চোখের জল ফেলিবে—সে অবস্থা এখন নয়। যা হয় উপায় একটা করিতেই হইবে ! আমার কথা তুমি সকলই জান ;—বাড়ী ছাড়িয়া যখন তোমার সঙ্গে বাগানে আসি, এই চুড়ি কয়গাছি ছাড়া মার নিকট হইতে আর কিছুই পাই নাই। মার সহিত এখন যেরূপ মনান্তর দাঁড়াইয়াছে, আর সেখানে যাইবার মুখ আমার নাই। নচেৎ আমার সর্ব্বস্ব তোমার এই বিপদে উৎসর্গ করিতে আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতাম না। বোধ হয় তোমার এ বিশ্বাস আমার উপর আছে। তোমার কত টাকার প্রয়োজন ?

নলিনী। দশ হাজার।

নিরুপমা। আমার একটা কথা শুনিবে কি ?

নলিনী। বল।

নিরুপমা। আর একদণ্ড বিলম্ব না করিয়া তোমার স্ত্রীর কাছে চলিয়া যাও। বিপদের কথা তাহাকে খুলিয়া বল। স্থির জানিও, তোমাকে কিছু চাহিতে হইবে না, কোনরূপ প্রার্থনা

করিতে হইবে না, সে কেবলমাত্র শাঁখা ও লোহাগাছটি বজায় রাখিয়া, তাহার সমস্ত অলঙ্কার তোমার হাতে তুলিয়া দিবে। অনেক নাটকের অনেক চরিত্র অভিনয় করিয়া যত দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, সংসার ছলনাময় হইলেও, পতিব্রতা রমণীর প্রাণ প্রতারণার আধার হইতে পারে না। তাহাকে যে অবস্থাতেই রাখ, যতই হতাদর কর, যতই অসুখী কর, তবু সে তোমার। তোমার বিপদে সে অকাতরে কোঁটা কোঁটা করিয়া বুকের রক্ত দিবে, তাহা আমি বেশ জানি। নাট্যমন্দিরের পবিত্র আশ্রয়ে থাকিয়া এ শিক্ষা আমি পাইয়াছি।

নলিনী একটু ইতঃস্তত করিতে লাগিল। সে যে দুর্গার কাছে অপরাধী, সে যে দুর্গার নিকট বিশ্বাসঘাতক, এ কথা সে বিশেষরূপ জানিত। বোধ হয় সেই কারণেই এই দারুণ দুঃসময়ে তাহার নিকট গিয়া সাহায্য ভিক্ষা করিতে বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল! কিন্তু উপায় নাই। এক দিকে মান সম্ভ্রম, অপর দিকে ব্যক্তিগত লজ্জা! এক দিকে কর্ত্তব্যের তাড়না, অপর দিকে অনুশোচনার গঞ্জনা! ওজনে কোন্ দিকটা ভারি?

নিরুপমা নলিনীর মনোভাব বুঝিল, তৎক্ষণাৎ গাড়ী তৈয়ার করাইল, নলিনী বিপদমুক্ত হউক্—জগজ্জননীর শ্রীচরণ-উদ্দেশে বারবার এই প্রার্থনা জানাইল। জোর করিয়া নলিনীর হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল। নলিনী চলিয়া যাইবার পর,

অর্দ্ধ-সমাপ্ত বেল ও জুঁইয়ের মালা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, কামিনীগাছের তলায় বসিয়া খুব খানিক কাঁদিল।

দুর্গা এখন বাপের বাড়ীতে আছে,—তাহা বোধ হয় পাঠক-বর্গের স্মরণ আছে। প্রাতঃকালে উঠিয়া দুর্গা বহুক্ষণ ধরিয়া শিবপূজা করে; তৎপরে মাতৃপাদোদক পান করিয়া শিশু-সন্তানটিকে লইয়া বালিকার ন্যায় তাহার সহিত ক্রীড়া করে; তাহার নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক মুখমণ্ডলে বড় সাধের স্বামীর প্রতিকৃতি দেখিয়া বারবার আবেগভরে চুম্বন করে; গুরুজনের আহারের সময়ে উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ং তত্ত্বাবধান করে; সাংসারিক সমস্ত কার্য্য আন্তরিক অনুরাগের সহিত সম্পন্ন করে; রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করে।—দুর্গার এখন এই নিত্যকার্য্য। এখানে আসিয়া সে কয়েকবার পত্র লিখিয়া নলিনীকে তাহার সহিত একবার দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। সেই পর্য্যন্ত সে আর কোনও চিঠিপত্র লেখে নাই। দুর্গা পতিগতপ্রাণা—আত্মত্যাগপরায়ণা, কিন্তু চিরকালই সে একটু অভিমানিনী!

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দুর্গা আপনার ঘরে বসিয়া মহাভারতের বনপর্ব্ব পাঠ করিতেছিল, এমন সময় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া সংবাদ দিল যে, "জামাই বাবু আসিয়াছেন!" দুর্গা উঠিয়া দাঁড়াইল; অসংযতকেশরাশি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিল; বক্ষের শোণিত অপেক্ষা প্রিয় নিদ্রিত পুত্রটিকে শয্যার উপর শোয়াইল;

যুক্তকরে মধুসূদনকে ডাকিয়া বলিল, "আজ যদি কোনও বিপদে পড়িয়া তিনি আমার কাছে আসিয়া থাকেন, তাঁহার পায়ে একটি কাঁটা যেন না বিঁধে !"

মহা অপরাধীর ন্যায় নলিনী গৃহে প্রবেশ করিল,—বহুকালের সাধনার পর অভীষ্ট দেবতাকে সম্মুখে পাইলে ভক্তের প্রাণে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, অনেক দিনের পর নলিনীকে দেখিয়া দুর্গার সন্তপ্ত চিত্ত সেইরূপ উল্লাস ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল ! কিন্তু কেমন কিসের একটা অজ্ঞানিত আতঙ্কের ছায়া তাহার সম্পূর্ণ সুখ ও সম্পূর্ণ তৃপ্তি উপভোগের পথে বিষম কণ্টক হইয়া দাঁড়াইল !

নলিনী অনন্যোপায় হইয়া, লজ্জার মাথা খাইয়া, তাহার বিপদের কথা দুর্গাকে জানাইল। দুর্গা কোনও কথা না কহিয়া, কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া, নলিনীর নির্দ্দয় ব্যবহারের কথা কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া, তাহার গহনার বাক্সটি স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়া করুণকণ্ঠে বলিল, "এই আমার সর্ব্বস্ব ! তোমারই সামগ্রী তোমারই কার্য্যে উৎসর্গ করিলাম। আমার একটিমাত্র অনুরোধ, ভ্রাতৃবিরোধ করিও না, তিনি হাতে তুলিয়া যাহা দেন—তাই লইয়াই সুখী হও। যাও—আর বিলম্ব করিও না, আজ রাত্রের মধ্যেই এই সমস্ত গহনা বন্ধক দিয়া টাকার যোগাড় কর। কাল বেলা বারোটার মধ্যে টাকা জমা না দিলে বিপদের অবধি থাকিবে না। আমার দুর্ভাগ্য, এতদিন পরে তোমাকে পাইলাম, প্রাণ ভরিয়া দুটো কথা কহিতে পাইলাম না,

তোমার একটু সেবা করিয়া পরকালের কাজও করিতে পারিলাম না! যাক—সে দুঃখ করিবার সময় আজ নয়, জগদীশ্বর যদি দিন দেন,—অনেক কথা কহিব; কথা তখন আর ফুরাইবে না"—এই বলিয়া নলিনীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া দুর্গা ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

নলিনীর মাথায় তখন আগুন জ্বলিতেছিল! যেমন করিয়াই হউক্ রাত্রের মধ্যেই টাকা যোগাড় করিতে হইবে, নচেৎ মান সম্ভ্রম সকলই নষ্ট হইবে। কাজেই সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না; গহনার বাক্স লইয়া দ্রুতপদে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার বুকের ভিতর হইতে মূর্ত্তিমান বিবেক বাহির হইয়া বারবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কি দেখিলে? কিরূপ স্বর্গীয় ছবি প্রত্যক্ষ করিলে? সত্য বল—কে বড়? দুর্গা, কি নিরুপমা? আজ না বোঝ—শীঘ্রই বুঝিবে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাঠক! পূর্ব্বেই বলিয়াছি আপনারা ব্রাহ্মণকুলতিলক ক্ষিতীশচন্দ্রকে নানা মূর্ত্তিতে দেখিবেন! রঙ্গালয়ের বক্সে, নিরুপমার গৃহে, নলিনীর বাগানবাটীতে, মুঙ্গেরের পথে রেল-গাড়ীতে, ভাগীরথীর বক্ষে, ইন্‌স্পেক্‌টারের সম্মুখে,—ক্ষিতীশ-

চন্দ্রকে ভিন্ন ভাবে—ভিন্ন অবয়বে দেখিয়াছেন! এইবার তাহার প্রেমাভিনয়ের চিত্র দেখিয়া আপনারা হাসিবেন—কি কাঁদিবেন—অথবা পুলকে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন, তাহা বলিতে পারি না!

ক্ষিতীশ যে বাড়ীতে বাস করে, সেই গলির ভিতর আট দশখানা বাড়ীর পরে একখানা জীর্ণ একতালা বাড়ী। দিবাভাগের অধিকাংশ সময়ই বাড়ীটির তালা বন্ধ থাকে। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে তথায় এক একটী করিয়া ১০।১৫টী যুবকের সমাবেশ হয়। তাহাদের মধ্যে যাহাদের চিরপোষিত বিরাট আলস্য ভোগ ব্যতীত অন্য কোনও বিশেষ কাজ নাই, তাহারা সুদীর্ঘ দিবসটীকে রজনীজ্ঞানে পূজা করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সাজগোজ সারিয়া বেতের ছড়ি হাতে হেলিতে দুলিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। যে কয় জন আফিসে কাজ করে, তাহাদের আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটে; আফিস হইতে সকাল সকাল আসিলেও সাজসজ্জা করিতে তাহাদের কিছু সময় লাগে। হাতেমুখে বুকেপিঠে—বারসোপ্‌ই হউক—আর সাজিমাটীই হউক,—একটা কিছু মাজা ঘসা করা তাহাদের অভ্যাস! তারপর কেশরচনাতেও অনেকটা সময় কাটিয়া যায়। কেশ তাহাদের বড় যত্নের সামগ্রী! সাংসারিক অবস্থা শোচনীয় হইলেও,—তাহারা অন্ততঃ লালবাজারের দেশী "Pymn Brothers"এর কাছে মাথাটা দশআনা-ছয়আনা করিয়া আসিয়া, কাণা চোখে কচি খোকার কাজল পরার মতন আপনাদের রূপে আপনারা মুগ্ধ হয়! সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটু পচা এসেন্স্ বা গোলাপজল

দেওয়া,—সুবিধা হইলে একটু লেপের তুলা বাহির করিয়া—তাহাতে একটু পচা আতর বা চন্দনের তেল দিয়া তাহা কানে গোঁজা,—ইত্যাদি ইত্যাদি রূপ নানা প্রক্রিয়াতেও বহুক্ষণ অতিবাহিত হয়! বলা বাহুল্য, এই মহাপুরুষদিগের সমাবেশ-স্থানটী একটী জঘন্য আড্ডা বিশেষ! তথায় সূর্য্যাস্তের পর হইতেই সকলে মিলিয়া লোটা লোটা সিদ্ধি পেট ভরিয়া পান করে; মধ্যে মধ্যে বর্ষার নিবিড় মেঘের ন্যায় গঞ্জিকার ধূম উত্থিত হইয়া উজ্জ্বল কেরোসিন্-ল্যাম্পের আলো নিষ্প্রভ করিয়া দেয়! সময়ে সময়ে লাল জলও চলিয়া থাকে! ওই সকল সৌখীন বাবুসম্প্রদায় প্রত্যহই প্রায় অর্দ্ধরাত্রিব্যাপী অভিনয় করিয়া, আড্ডা জম্‌কাইয়া রাখে! কখনও তাসপাশা—কখনও গান-গল্প—কখন ঝগ্‌ড়া মারামারি! সম্প্রতি আবার সভ্যেরা একটী কন্‌সার্ট পার্টী খুলিয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতেই অনৈক্যতানে বাদন আরম্ভ হয়। প্রতিবেশিগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু কেহ কিছু বলিতে সাহস করে না।

ক্ষিতীশচন্দ্র এই আড্ডার এক জন প্রধান সভ্য। তাহারই চেষ্টায় কন্‌সার্ট পার্টী খোলা হইয়াছে। ক্ষিতীশকে দলস্থ সকলেই অন্তরের সহিত ঘৃণা করিলেও, বাহিরে কেহ তাহার আভাষ দেয় না। তাহার কারণ, সে অনেক স্থান হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেয়। ক্ষিতীশ স্বভাবতঃই না পড়িয়া পণ্ডিত। ইংরাজী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত সে কায়ক্লেশে দেখিয়াছিল; কিন্তু লোক দেখিলে সে Shakespere, Milton

আওড়াইতে আরম্ভ করে। সংস্কৃতে 'ভাস্বরকসিংহ' পর্য্যন্ত ব্যুৎপত্তি হইলেও, সুন্দরী দেখিলে সে মেঘদূত হইতে 'তন্বী বামা বিকটদর্শনা' ইত্যাদি আবৃত্তি করিয়া সৌন্দর্য্যমোহে মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়া পড়ে। ক্ষিতীশ দুই চারি দিন এক-পয়সা-ওয়ালা বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিয়াই এক জন উৎকৃষ্ট বংশীবাদক বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে। কনসার্ট পার্টীতে সে পিক্কু বাজাইত! এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহার মোহন পিক্কু-রবে পিকরাজ পাপিয়া পিউ পিউ বন্ধ করিয়া পুনরায় ছাতারের দলে মিশিয়া গিয়াছে!

আড্ডার সম্মুখেই একটী ছোট ভাঙ্গা দোতালা বাড়ী,—তাহার দরজা ভিতর হইতে বন্ধ থাকে। বাড়ীতে দুইটী বিধবা বাস করে। একটী বৃদ্ধা ও আর এক জন তাহার কন্যা—নাম চন্দ্রা। যৌবনেই জন্মের মত চন্দ্রার কপাল পুড়িয়াছে। এখন তাহার মা ছাড়া বিশ্বসংসারে আর কেহ নাই। চন্দ্রা এই সবেমাত্র উনিশে পা দিয়াছে। অল্প বয়সে পতিহারা হইয়া, বিধবার আচার-বিচারে সে বড় অভ্যস্ত হয় নাই। চন্দ্রা সুন্দরী না হইলেও লাবণ্যময়ী; শারদ-শশীর সহিত তাহার বদনের তুলনা না হইলেও; সে মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে; মৃগনয়না না হইলেও চন্দ্রার কোমল আঁখি দুটীর মোহন কটাক্ষে স্বতঃই যেন বাণবিদ্ধ হইতে হয়; অলক্তকরঞ্জিতদুগ্ধবৎ অনিন্দ্যসুন্দর বর্ণ না হইলেও,—ম্লানকান্তি গোধূলির ন্যায় হর্ষ-বিষাদ-মাখা সেই সুঠাম অঙ্গের স্তরে স্তরে কেমন একটা মোহমদিরাময় ভাবের

সমাবেশ ছিল। চন্দ্রা কল্কাপেড়ে পাছা শাড়ী পরে, পাতা কাটিয়া চুল বাঁধে, পানের সঙ্গে সুর্‌তি খায়; কখনও কখনও নিজের চুলবাঁধা ছোট আরসীখানি লইয়া আপনার মুখখানি আপনি দেখে,—আর মনে মনে কত কি ভাবে! সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, চন্দ্রার এ পর্য্যন্ত চরিত্রের কোনও দোষ ঘটে নাই। তাহার বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেহ নাই,—কোনও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ও কখনও তাহাদের বাড়ী যায় না। তাহার একটু কারণও ছিল! চন্দ্রার মা বড় প্রখরা, কাহারও সহিত তাহার সদ্ভাব নাই। ঝগড়াটা তাহার বড় প্রাণের জিনিস! সেই জন্য কেহ তাহার বাড়ীতে আসিত না।

চন্দ্রা সন্ধ্যার অন্ধকারের ঝোঁকে অনেক সময় গলির দিকের খড়খড়িটী অল্প খুলিয়া বা ঈষৎ ফাঁক করিয়া পথপানে চাহিয়া থাকে; চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কন্‌সার্টের আড্ডার গান গল্প হাসি ঠাট্টা রঙ্গ রহস্য কাণ পাতিয়া শুনে। একদিন সন্ধ্যার পর পিক্‌নু-হস্তে ক্ষিতীশচন্দ্র খড়খড়ির ফাঁক দিয়া চন্দ্রার চন্দ্রাননখানি দেখিতে পাইল। দেখিয়া মোহিত হইয়া, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠামে সে বংশীধ্বনি আরম্ভ করিল। চন্দ্রা ক্ষিতীশকে না দেখিয়াই খড়খড়িটী বন্ধ করিয়া দিল। প্রেমিকের প্রাণে ইহাতে বড়ই ব্যথা লাগিল। মনের আবেগে ক্ষিতীশ তাহার কোকিলকণ্ঠে গাহিল :—

'ওগো তার বরণ কাল,
তারে না দেখা ভাল!
বল সখী, জল আনিতে যাব কি?'—

সেই অবধি প্রত্যহই ক্ষিতীশ আড্ডার জানালায় বসিয়া একদৃষ্টে চন্দ্রার ঘরের দিকে চাহিয়া থাকে ; পিক্লু বাজায়, রসের কথা কয়, নাটকের অভিনয় করে,—কিন্তু চন্দ্রাকে আর দেখিতে পায় না !

চন্দ্রার বাড়ীতে একটী পরিচারিকা আছে। সে বাজার হাট করে, এবং বাসন মাজে। নিকটেই তাহার বাড়ী। রাত্রে সে চন্দ্রার বাড়ীতে থাকে না। ক্ষিতীশচন্দ্র তাহার দ্বারা চন্দ্রাকে একটী প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবে, স্থির করিল। কিন্তু একদিন তাহার সহিত কথা কহিতে গিয়া জানিতে পারিল, সে হাবা ও কালা ! শুদ্ধ ঈঙ্গিত ইসারায় এ সকল গুপ্ত ব্যাপার সাধিত হইবে না ভাবিয়া,—ক্ষিতীশ অন্য উপায় অবলম্বন করিল। কন্‌সার্ট পার্টীতে যে ছোক্‌রা করতালী বাজাইত, তাহাকে ফেরীওয়ালা সাজাইয়া চন্দ্রার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল।

অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে বন্ধুবর ফিরিয়া আসিয়া চুড়ীর ঝোড়াটী রাখিয়া ক্ষিতীশকে বলিল, "দাদা ! এ বড় কঠিন ঠাঁই—গুরু-শিষ্যে দেখা নাই ! যেম্‌নি প্রস্তাব করা, অমনি ঝাঁটা লইয়া তাড়া ! তবে তোমার নাম জানিতে দিই নাই,—এক জন বড়-লোক দেখা করিতে চায়—শুধু এইটুকু বলিয়াছি !—এ কাজে আমি আর নাই,—এই কানমলা—এই নাকে খৎ !" এই বলিয়াই সে বিদায় গ্রহণ করিল। ক্ষিতীশ কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহে ! সে ভাবিল, "যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধ'রে। বারেক নিরাশ হ'য়ে কে কোথায় মরে !"

নবম পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার পর মাসাবধি কাটিয়া গেল। হঠাৎ চন্দ্রার মা কঠিন পীড়ায় আক্রান্তা হইল। তাহার জ্ঞান নাই,—এক একবার চোখ চাহিতেছে, কিন্তু লোক চিনিতে পারিতেছে না। পাড়ার এক চিকিৎসক বলিয়াছেন,—রোগ সাংঘাতিক! চন্দ্রা প্রাণপণ যত্নে মাতার শুশ্রূষা করিতেছে। যথাসময়ে ক্ষিতীশ এ সংবাদ পাইল।

দুই চারি দিনের মধ্যে বৃদ্ধার অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়িল। শেষে ডাক্তার জবাব দিয়া গেল। চন্দ্রা কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না,—কাঁদিতে কাঁদিতে বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিল।

সেই রাত্রেই এক জন অপরিচিত ব্যক্তি চন্দ্রার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কড়া নাড়িয়া 'মাসী!' 'মাসী!' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। চন্দ্রা তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?" আগন্তুক অনেকদিনের পরিচিতের মত একেবারে উপরে উঠিয়া চন্দ্রার সম্মুখে কিছু বেদানা, আঙ্গুর, মিছ্‌রী ইত্যাদি রাখিয়া বলিল, "চন্দ্রা! তুমি আমায় চিনিতে পারিবে না। তোমার মা আমায় ছেলেবেলা মানুষ করিয়াছিলেন। তিনি আমার মাসী হন। তাঁহারই কৃপায় আজ আমি দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া খাইতেছি।

আমি আজ পোনের বৎসর পরে চাকুরীস্থান পশ্চিম প্রদেশ হইতে ফিরিয়াই মাসীর অসুখের সংবাদ পাইলাম। তাই আসিয়াছি। চন্দ্রা! তুমি মাকে সংবাদ দাও; বল—তাঁহার 'সোনা ছেলে' আসিয়াছে। মাসী আমাকে আদর করিয়া 'সোনা ছেলে' বলিয়া ডাকিতেন।"

চন্দ্রা এই দুঃসময়ে এক জন আত্মীয়কে পাইয়া যেন একটু বল পাইল। সে সেই অপরিচিত যুবককে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া মায়ের অবস্থা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর, তাহাকে কিছু খাইবার জন্য অনুরোধ করিল। আগন্তুক সে কথার উত্তরে বলিল, "না দিদি, আমি খেতে আসি নাই। খাওয়া দাওয়ার দিন ঢের আছে। এখন চল, মাসীর কাছে যাই।" তখন উভয়ে গিয়া রোগীর শিয়রে বসিল।

পাঠক! নবাগত পুরুষটীকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? ইনিই আমাদের ক্ষিতীশচন্দ্র!

প্রাণপণ যত্নে ক্ষিতীশচন্দ্র চন্দ্রার মার সেবা করিতে লাগিল। চন্দ্রা তাহার এই অকৃত্রিম যত্ন ও সরল ব্যবহারে কৃতজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হইল! মার পরমায়ুঃ ফুরাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহার অবর্ত্তমানে চন্দ্রাকে যে একেবারে পথে দাঁড়াইতে হইবে না—এই ভাবিয়া তাহার মন কতকটা শান্ত হইল।

ক্ষিতীশচন্দ্র আসা অবধি মার সেবার জন্য অথবা সংসারের হিসাবে চন্দ্রাকে কিছুই ব্যয় করিতে হয় নাই। চন্দ্রা ক্ষিতীশকে পয়সা দিবার ঢের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ক্ষিতীশ তাহা লয়

নাই। একদিন চন্দ্রা বিশেষ পীড়াপীড়ি করাতে ক্ষিতীশ হু হু করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া বলিল,—"চন্দ্রা! তুমি আমায় এত পর ভাব? জানিতাম না যে, আমি এত দুর্ভাগ্য!"

চন্দ্রা আর কোনও কথা বলিল না। সে কিছু লজ্জিতা হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। মনে মনে বলিল, 'ভগবান! ক্ষিতীশ মানুষ—না দেবতা!'

শেষ সেই ভয়ঙ্কর দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ আর চন্দ্রার মার রক্ষা নাই। নাড়ী অতি ক্ষীণ—শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। ক্ষিতীশ ব্যস্ত হইয়া এক জন ডাক্তার আনিল। ডাক্তার বলিয়া গেলেন, "আমায় ডাকিবার আর কোন' দরকার ছিল না। আসন্নকাল উপস্থিত। আপনারা প্রস্তুত হউন!"

চন্দ্রার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ আরও খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল। নিশীথে চন্দ্রার মার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। চন্দ্রার সব ফুরাইল। মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া মায়ের বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া চন্দ্রা কাঁদিতে লাগিল। বাহিরে বিষম দুর্য্যোগ, শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারা পৃথিবী প্লাবিত করিতেছে। মৃতের সৎকার-চিন্তা চন্দ্রার মনে ধীরে ধীরে উদিত হইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষিতীশকে বলিল, "শেষ কার্য্য কি করিয়া হইবে' ভাই?"

ক্ষিতীশ বলিল, "ভাবনা কি চন্দ্রা! আমি আছি। ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝা যা হয় হো'ক্! তোমার ইষ্টের কাছে পৃথিবীর সকল বিপদ আমার নিকট অতি তুচ্ছ। আমি ব্রাহ্মণ ডাকিয়া

আনিতেছি, তোমার কোনও চিন্তা নাই। চন্দ্রা! তোমার মা গিয়াছেন,—আমার কি তিনি কেউ নন?”

ক্ষিতীশ আর বিলম্ব করিল না, সেই ভীষণ রাত্রে—ভয়াবহ দুর্য্যোগে—কয়েক জন ব্রাহ্মণের সাহায্যে নির্ভীকচিত্তে শবদেহ স্কন্ধে লইয়া শ্মশানাভিমুখে ছুটিল। মাতৃহারা চন্দ্রা গৃহমধ্যে ধূলায় পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া শেষ রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সৎকার-কার্য্য শেষ করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ক্ষিতীশ ফিরিয়া আসিল। সে এক জন পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। ক্ষিতীশের অনুরোধে চন্দ্রা স্নানাদি করিয়া শুচি হইল।

সময় কাহারও অপেক্ষায় থাকে না। দেখিতে দেখিতে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। ক্ষিতীশ এখন চন্দ্রার বাড়ীতেই থাকে। এক একবার নিজের বাড়ীতে গিয়া খোঁজখবর লইয়া আসে। উপরে দুইটী ঘর আছে,—একটী ঘরে চন্দ্রা ও আর একটীতে ক্ষিতীশ থাকে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা দুই জনে কত সুখ দুঃখের কথা কয়। ভাল না বাসিলে, ভালবাসা না পাইলে, মানুষ বাঁচিতে পারে না,—ক্ষিতীশ চন্দ্রাকে বিশেষ করিয়া এ কথা বুঝাইল! ক্ষিতীশ চন্দ্রার মন পরীক্ষা করিবার জন্য এক এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ভ্রমণে বাহির হইয়া অনেক রাত্রে নিঃশব্দে চন্দ্রার বাড়ীতে আসিয়া লুকাইয়া তাহার মনোভাব জানিবার চেষ্টা করিত। সে দেখিত,—চন্দ্রা ঘুমায় নাই, খায়

নাই,—চঞ্চলচিত্তে খড়খড়ি খুলিয়া পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছে! শেষে ক্ষিতীশের সাড়া পাইলে তবে তাহার ধ্যানভঙ্গ হইত,—তখন সে নিশ্চিন্ত হইয়া আহারাদি করিত।

একদিন সন্ধ্যার পর বাহির হইতে আসিয়াই ক্ষিতীশ চন্দ্রাকে বলিল,—"চন্দ্রা! আর তোমার সহিত আমার দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি কালই কর্ম্মস্থানে যাইব।" চন্দ্রা এ কথা শুনিয়া সহসা যেন বিবর্ণ হইয়া গেল! তাহার সেই সরল, সুন্দর,—সুকোমল মুখে বিষাদের নিবিড় কালিমা পড়িল,—সলাজ নয়নে দুই ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল। শেষে অতি কাতর, অতি করুণ, অতি মর্ম্মস্পর্শী স্বরে বলিল, "তুমি যাবে—আমি কার কাছে থাকিব?"

সূক্ষ্মদৃষ্টি ক্ষিতীশচন্দ্র বুঝিল,—ঔষধের সুন্দর ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। কার্য্যতৎপর প্রেমিক এইবার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে চন্দ্রাকে বলিল,—"কি করি চন্দ্রা! পৃথিবীটা বড় কঠিন স্থান! এখানে দয়া মায়া কিছুই নাই! চারি দিকে নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতা বিরাজিত! আমি তোমায় স্নেহ করি, প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি, লোকে তাহা সহ্য করিতে পারে না। আমি এখানে সদাসর্ব্বদা থাকি বলিয়া কেহ কেহ আমাদের দুর্নাম রটাইয়াছে।"

চন্দ্রার কান্না আসিতেছিল! কোনরূপে আত্মসংবরণ করিয়া সে কহিল, "দুর্নামের ভয়ে তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছ? তোমার প্রাণে কি দয়া মায়া নাই?"

ক্ষিতীশ সস্নেহে কহিল, "আমি আমার জন্য ভাবি না। নিজের দুর্নাম গ্রাহ্যও করি না! কিন্তু প্রাণের সমস্ত স্নেহ মমতা যাহাকে দান করিয়াছি, তাহার কলঙ্কের কথা সহ্য করিতে পারি না! আমি স্বইচ্ছায় যাইতেছি না—চন্দ্রা! তুমি জান না, নির্দ্দিষ্ট দিনে কর্ম্মস্থলে না যাওয়ায় আমার চাকুরীটুকু গিয়াছে। আমি যাইতে পারিতাম, কিন্তু তোমায় বিপদসাগরে ফেলিয়া যাইতে আমার প্রাণ চাহিল না।

চন্দ্রা। কেন গেলে না ক্ষিতীশ? যেদিন প্রথম আসিয়াছিলে, তার পরদিনই চলিয়া গেলে, আমার আজ এ দুর্দ্দশা হইত না!

ক্ষিতীশ। সে কি চন্দ্রা! তখন যে তোমার কাছে কেহ ছিল না! মার সৎকারকার্য্য কে করিত, ভাই? তোমার কাছে কে থাকিত, চন্দ্রা?

চন্দ্রা। আমার কাহাকেও প্রয়োজন ছিল না। সংসার আমার পক্ষে মরুভূমি ছিল; যে দিকে চাহিতাম, সেই দিকটাই জ্বলিয়া উঠিত! তোমার শীতল ছায়ায়—সুমিষ্ট ব্যবহারে—আমি পৃথিবীকে নূতন চক্ষে দেখিলাম! আবার সেই—সেই কঠোর নির্ম্মম প্রকৃতির কোলে ঝাঁপ দিতে হইবে। ক্ষিতীশ! তুমি আমার কাছে থাকিয়া ভাল কর নাই, আমায় দেখা দেওয়া তোমার উচিত হয় নাই।

ক্ষিতীশ এইবার সুযোগ বুঝিয়া শব্দভেদী বাণ ছাড়িল, কহিল, "চন্দ্রা! তোমার কাছে আত্মগোপন করিব না। তুমি

আমার কি দশা করিয়াছ, জান ? আজ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক দিকে—আর এক দিকে তুমি আমার ! আমার এ ভাব ছিল না চন্দ্রা ! তোমায় দেখা পর্য্যন্ত আমার এই অবস্থা হইয়াছে। এই দেহের অস্থি মাংস মেদ মজ্জা, যেখানটা দেখ,—শুধু চন্দ্রা ছাড়া আর কিছুই নাই। চন্দ্রা ! ধর্ম্ম সাক্ষী, আকাশের চন্দ্র তারা সাক্ষী, আমি মরিতে চলিয়াছি—আর ইহজগতে আমার নাম শুনিতে পাইবে না। বিদায় দাও চন্দ্রা—আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখে থাক।

চন্দ্রা। সুখ ! আমার সুখ ! যে তোমার স্নেহে বঞ্চিত হইতেছে—তার আবার সুখ কি ! তুমি যে পথে যাইতেছ, আমিও সেই পথে যাইব। তুমি যদি আমাকে ফেলিয়া যাও, কাল আর চন্দ্রাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না।

ক্ষিতীশ। না চন্দ্রা ! তুমি কেন মরিবে ? শপথ কর—কাছে এসো !

চন্দ্রা কলের পুতুলটীর মত ক্ষিতীশের কাছে গেল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহার সুন্দর মুখখানি ক্ষিতীশের বদ্ধ আলিঙ্গনের মধ্যে অদৃশ্য হইল !

দশম পরিচ্ছেদ।

দুর্গার সমস্ত অলঙ্কার বন্ধক দিয়া, খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা আদালতে জমা করিয়া নলিনী সে যাত্রা ওয়ারেণ্টের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। কালের বিচিত্র গতি! দুর্ভাগ্য একবার আসিয়া দেখা দিলে, সহজে সে কাহাকেও ছাড়ে না। রোগ—শোক—গৃহবিবাদ—বন্ধুবিচ্ছেদ—নিত্য নিত্য নূতন নূতন আপদ বিপদকে সহচর করিয়া আপন গণ্ডীর ভিতর বেশ জাঁকজমকের সহিত রাজত্ব বিস্তার করিয়া বসে। নলিনীর অদৃষ্টে ঠিক তাহাই ঘটিল। বাজারে সে অনেক টাকা দেনা করিয়াছে, আর ধার পাওয়া যায় না;—অথচ টাকার দারুণ অভাব; মান সম্ভ্রম আর থাকে না,—এ সকল কথা পাঠক পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এক জন পাওনাদার ডিক্রী করিয়া কড়ায় গণ্ডায় টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে, এ সংবাদ অন্যান্য মহাজনদের কাণে পঁহুছিল! দুই একখানা উড়ো চিঠিও তাহাদের হস্তগত হইল; তাহাতে লিখিত ছিল, "নলিনী শীঘ্রই ইন্‌সল্‌ভেন্সি লইবে, এই বেলা পাওনা-গণ্ডা না চুকাইয়া লইলে, নিশ্চয় ফাঁকে পড়িতে হইবে।" জগদীশ্বর জানেন, অলক্ষ্যে থাকিয়া কে এ চক্রান্তের বীজ ছড়াইতেছিল! পাওনাদারেরা আর স্থির থাকিতে পারিল না, একে একে সকলেই উকীলের চিঠি দিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি নালিশ হইল। নলিনী বেশ বুঝিল, যে কাল-

মেঘ তাহার মাথার উপর ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহার পরিণাম বড় ভয়ানক—বড় মর্ম্মান্তিক! কিন্তু উপায় কি? ক্ষুদ্র শক্তিতে মানুষ যতটা ভাবনা ভাবিতে পারে, নলিনী তাহা ভাবিল; প্রাণ উপেক্ষা করিয়া সংসারসংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ যতটা করিতে পারে, আত্মবিসর্জ্জনের জন্য নলিনী সে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইল; কিন্তু যখন একখানির পর একখানি করিয়া আদালতের মোহরযুক্ত সমন্ আসিয়া তাহার হাতে পড়িতে লাগিল, তখন সে চারি দিক অন্ধকার দেখিল,—দিন দিন বুকের রক্ত ঝলকে ঝলকে শুকাইতে আরম্ভ হইল। সহায় নাই—সম্বলও ফুরাইয়া আসিয়াছে,—যে সকল বন্ধু-বান্ধব বাগানে আসিয়া 'পেলিটী'র খানা ও 'পমারী' শ্যাম্পেনের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া যাইতেন, পরামর্শের জন্য তাঁহাদের খবর দিলে, 'অসুস্থ' ও 'সময়াভাব' জানাইয়া কেহ আর এ দিকে বড় ঘেঁসিতে চাহেন না। প্রাণের—প্রাণের ভিতর অন্বেষণ করিয়া—মনের সহিত কথা কহিয়া নলিনী বুঝিল, এ বিশ্ব-সংসারে সে একা! জ্যেষ্ঠ যামিনীভূষণের নামে নালিশ করিয়া আদালতের সাহায্যে নিতাই বাবুর (Award) 'অ্যাওয়ার্ড' পাল্‌টাইয়া দিয়া আপনার পৈতৃক সম্পত্তি দখল লইয়া, তাহার পর পাওনাদারের দেনা শোধ দিয়া নিজের সম্ভ্রম বজায় করা—সে এক প্রকার অসম্ভব মনে করিল। অকূলে কূল না পাইয়া নলিনী দুর্গার পরামর্শগ্রহণ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল। দুর্গা বলিয়াছিল, "ভ্রাতৃ-বিরোধ করিও না, তিনি হাতে তুলিয়া যাহা দেন, তাহা লইয়াই

সন্তুষ্ট হও!” নলিনী বুঝিল, যে আগুন চারি দিকে জ্বলিয়াছে, তাহা নিভাইবার সামর্থ্য তাহার নাই! যে উপায়েই হউক, যামিনীভূষণের সহিত একটা মিট্‌মাট্ করিয়া, মহাজনদের টাকা পরিশোধ না করিলে, তাহাকে জেলে যাইতে হইবে। একবার কল্পনার চক্ষে সে আপনার অবস্থাটা দেখিয়া লইল! শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, যদি জেলে যাইতে হয়, তাহার পূর্ব্বে আত্মহত্যাই একমাত্র উপায়! কিন্তু সেই দণ্ডে—কি জানি কেন—বুকের ভিতরটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মরণের শরণ লইয়া সে চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে, এ সাহস তার কুলাইয়া উঠিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, সে যামিনীভূষণকে এক পত্র লিখিয়া জানাইল, “আমি মিট্‌মাট্ করিতে প্রস্তুত আছি। আমার চারি দিকে বিপদ, আপনি না রক্ষা করিলে কে করিবে? আমার আপনার লোক আর কে আছে?”

চিঠি পড়িয়া যামিনীভূষণ একটু নীরব হাসি হাসিলেন। লিখিলেন, “সুবিধামত আসিয়া আমার সহিত দেখা করিও। তুমি যদি আমার কথা শুনিয়া চল, তোমার কোনও বিপদ থাকিবে না।”

উভয় ভ্রাতায় সাক্ষাৎ হইল; রুদ্ধদ্বার কক্ষে বহুক্ষণ ধরিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিল। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, হতভাগ্য বিপদগ্রস্ত অসহায় নলিনী যামিনীভূষণের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া একটা কাগজে কি সহি করিয়া দিল। ব্যবস্থা এই হইল

যে,—যামিনী নলিনীর হাতনাগাইদ সমস্ত দেনা চুকাইয়া দিবে—এবং নগদ পঁচিশ হাজার টাকা নলিনী পাইবে। বসত-বাটী,—বাগান, ভাড়াটীয়া বাটী এবং অন্যান্য সম্পত্তির উপর নলিনীর আর কোনরূপ দাবী দাওয়া রহিল না।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নলিনী গাড়ীতে উঠিল। একবার তাহার পৈতৃক ভিটার পানে তাকাইয়া দেখিল,—মনে মনে বলিল, "কাল আমি এ বাড়ীর মালিক ছিলাম, আজ পথের ভিখারীর সহিত উহার যে সম্বন্ধ, আমার সঙ্গেও তাই! এতদিনে সর্ব্বস্বান্ত হইলাম!" এ কি বিড়ম্বনা! নলিনী কাঁদিয়া ফেলিল,—চোখের জল আর থামে না! নলিনী অনেক দিন কাঁদে নাই, কান্নার আস্বাদন সে ভুলিয়া গিয়াছিল। প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া তাহার বুকের ভার অনেকটা লঘু করিল। কিন্তু বিবেক ছাড়িবার পাত্র নয়! সে ঠিক সময়ে নলিনীর বুকের ভিতর বসিয়া প্রাণের তারে ঝঙ্কার দিয়া বলিতে লাগিল, "পদাশ্রিতা সতী স্ত্রীকে বিনা দোষে কষ্ট দিতেছ; দিবারাত্রি তাহার চোখের জল পড়িতেছে, বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় প্রাণের বেদনায় ছট্ ফট্ করিতেছে, তাহার সাজা তুমি পাইবে না? তাহার ফল তুমি ভুগিবে না? এখনও সাবধান হও, এখনও কর্ত্তব্যপথ বাছিয়া লও, এখনও আপনার-পর চিনিয়া লইবার চেষ্টা কর,—তোমার মঙ্গল হইবে!"

নলিনীর মনে হইল, "আর যদি এ বিষয় লইয়া তোলাপাড়া করি, নিশ্চয়ই পাগল হইয়া যাইব। দূর হ'ক, মরিতে তো একদিন

হইবেই,—অমর হইয়া কেহ পৃথিবীতে আসে নাই, তবে এত চিন্তা কিসের ? সময়-স্রোতে গা ঢালিয়া দিই, দেখি, কোথায় গিয়া পড়ি !" নলিনীর গাড়ী আসিয়া বাগানে পঁহুছিল। যাহা যাহা ঘটিয়াছে, জ্যেষ্ঠের সহিত যে কথা, ও বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, নিরুপমা সমস্তই শুনিল ;—মলিনমুখে একটু শুষ্ক-হাসি হাসিয়া কহিল, "পরে যা হয় হইবে, এখন তো পাওনাদারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাও ! তোমার অদৃষ্টে যদি সুখভোগ লেখা থাকে, আবার সব হবে—আবার পুরাতন দিন ফিরিয়া আসিবে।"

নলিনী বলিল, "ভবিষ্যতের ভাবনা কখনও ভাবি নাই—ভাবিবও না। তবে আমার বড় দুঃখ এই যে, এই বাগান-বাড়ীর উপর আর আমার অধিকার নাই। ইহার সহিত আমার অনেক সুখদুঃখের স্মৃতি জড়িত আছে। আমি দাদার নিকট হইতে তিন মাসের সময় লইয়াছি,—তিন মাস পরেই এ বাগান-বাড়ী ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

নলিনী জোর করিয়াও চোখের জল চাপিয়া রাখিতে পারিল না ; নিরুপমা নলিনীকে কখনও কাঁদিতে দেখে নাই ; নলিনীর চোখে জল দেখিয়া সেও না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না। উভয়ের তপ্ত অশ্রু বক্ষঃ বহিয়া—গড়াইয়া পড়িয়া—বেদনা ও সহানুভূতির একটি ক্ষুদ্র সাগরের সৃষ্টি করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রাকে লইয়া ক্ষিতীশচন্দ্র এখন নলিনীর বাগানবাড়ীতে আড্ডা গাড়িয়াছে। চন্দ্রার মাতার কিছু নগদ টাকা ছিল, তাহাই চোটায় খাটাইয়া কষ্টে সৃষ্টে তাহাদের দিন গুজরাণ হইত। ক্ষিতীশ সে টাকাগুলি হস্তগত করিয়া, সুদে খাটাইয়া দিবে বলিয়া, চন্দ্রাকে ভুলাইয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছে। নিরুপমা চন্দ্রাকে সঙ্গিনী পাইয়া মনের দুটো কথা কহিতে পারিয়া, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। দুটীতে খুব ভাব! একত্র খায়—এক ত্র থাকে! নলিনী যতক্ষণ না আসে—উভয়ে এক শয্যায় শুইয়া,—ভালবাসা কি সামগ্রী—কে তাহা সৃষ্টি করিয়াছে —তাহার মূল্য কত,—এই লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক, অনেক বাদানুবাদ করে।

নলিনীর বর্ত্তমান অবস্থার কথা ক্ষিতীশ সমস্তই শুনিয়াছে। এ নবাবী চাল আর বেশীদিন চলিবে না, ইহাও সে বিশেষরূপে বুঝিয়াছে। বৎসর যাইতে না যাইতে, পঁচিশ হাজার টাকা যে ফুরাইয়া আসিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই! তবে নলিনীর প্রাণটা যে উচ্চ, যতক্ষণ সামান্য টাকা হাতে থাকে, সে বন্ধু বান্ধবদের জন্য অকাতরে বিলাইয়া দেয়, ক্ষিতীশের এ ধারণা বদ্ধ-মূল ছিল। সে ভাবিল, এই সময় যাহা কিছু হাতাইয়া লইতে পারি,—ভবিষ্যতে আর কিছু পাইবার আশা নাই! কি অস্ত্র

প্রয়োগ করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে? অনেক গবেষণার পর ক্ষিতীশ স্থির করিল, চন্দ্রাকেই অস্ত্র করিতে হইবে।

এক দিন সে চন্দ্রাকে গোপনে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিল,—"নলিনীর সঙ্গে একটু ভাল করিয়া মেলামেশা কর। আমি উহার হাবভাব দেখিয়া বুঝিয়াছি,—তোমাকে পাইলে সে নিরুপমাকে এখনই বিদায় করিয়া দিতে পারে। নলিনী তোমার রূপে মুগ্ধ!"

চন্দ্রা চুপ করিয়া ক্ষিতীশের কথাগুলি শুনিল, ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"তুমি কি আমাকে এই কার্য্যের জন্য কুলত্যাগিনী করিয়া আনিয়াছ?"

ক্ষিতীশ একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তোমার ভালর জন্যই আমি বলিতেছি। আমার ইহাতে স্বার্থ কি? তোমার চরিত্র কলুষিত করিতে আমি অনুরোধ করিতেছি না। তবে যদি একটু হাসির ফাঁসি লাগাইয়া, ওই সর্পচক্ষুর মণি জ্বালাইয়া, এক জনকে ফাঁদে ফেলিয়া, নিজের আখেরের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পার, তাহাতে ক্ষতি কি?"

চন্দ্রা। নিরুপমা আমাকে মার পেটের বোনের মতন ভালবাসে,—সে যদি জানিতে পারে, কি মনে করিবে?

ক্ষিতীশ। তবে আর তোমার বাহাদুরী কি? লাঠীও ভাঙ্গিবে না, সাপও মরিবে,—এমন ভাবে কাজ করিতে হইবে। যদি তুমি আমার পরামর্শ শুনিয়া চল, নগদ দশ হাজার টাকা তোমার হাতে তুলিয়া দিব। ওই টাকার সুদ হইতে তোমার সারাজীবন চলিয়া যাইবে।

চন্দ্রা আর কোনও কথা কহিল না, বুঝিল, সে পাষাণে প্রাণ দিয়াছে। সে রাত্রি এক লহমার জন্যও সে ঘুমাইতে পারিল না।

চন্দ্রা যদিও সুখের মুখ কখনও দেখে নাই, তথাপি সে কল্পনার কিঙ্করী হইয়া অনেক উচ্চ আশা মনে মনে পোষণ করিয়াছিল। এই ঐশ্বর্য্য—এই দাসদাসী পরিবেষ্টিতা হইয়া সুখের উদ্যান-বাস, —নলিনীর মত অমন সুন্দর পুরুষকে পায়ের দাস করিয়া রাখা—সে মন্দ কি? নারীজন্মের সার্থকতা আর কোথায়? নিতান্ত পোড়ারমুখী করিয়া বিধাতা সংসারে পাঠান নাই, তবে অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে দোষ কি?

এখন ক্ষিতীশের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হইল, নিরুপমাকে কি করিয়া বিদায় করা যায়! ও পাপ না অপসারিত হইলে, নলিনীকে কলের পুতুল করিয়া নাচাইতে পারা যাইবে না। মনে মনে অনেক মতলব ঠাওরাইয়া, শেষে এক সিদ্ধান্তে আসিয়া, ক্ষিতীশ একটা আশ্বাসের নিঃশ্বাস ছাড়িল।

এক দিন অপরাহ্ণে—নলিনী তখন বাগানে উপস্থিত নাই,—ক্ষিতীশ নিরুপমাকে ডাকিয়া পুষ্করিণীর ধারে লইয়া লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, "দেখ নিরুপমা! তুমি আমার পুরাতন বন্ধু,—তোমার কিছু মন্দ হইলে আমার প্রাণে কিরূপ লাগিবে, তাহা তুমি অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছ। চন্দ্রা এখন এখানে নাই, সে মুখ হাত ধুইতে গিয়াছে—এই উপযুক্ত অবসর,—এই সুযোগে তোমায় কাথাটা বলিয়া ফেলি! নলিনী চন্দ্রার জন্য উন্মত্ত

হইয়াছে,—চন্দ্রাও নলিনীর জন্য লালায়িত! তুমি যদি এই সময়ে একটু সাবধান না হও, তোমারও আখের নষ্ট,—আর এই গরীব ব্রাহ্মণের মুখের গ্রাসটিও মারা যায়!" নিরুপমার মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল, সে কথা কহিতে পারিল না; তাহার মনে হইল, এ কি সম্ভব? এ সংসার কি কেবল শয়তানের আবাসস্থল? নলিনী কি যথার্থই পিশাচ?

চতুর ক্ষিতীশ নিরুপমার মনোভাব বুঝিল; বলিল, "তুমি আমার কথায় অবিশ্বাস করিতেছ? আমি যদি তোমায় হাতে হাতে ধরাইয়া দিতে পারি?" নিরুপমার মুখে হাসি, চোখে জল! এইবার সে উত্তর দিল, "তা যদি পার, তবে বুঝিব যে, তুমি আমার যথার্থই শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।"

ক্ষিতীশ তড়িৎ-বেগে বলিয়া উঠিল, "তা যদি না পারি—তবে পৈতা ছিঁড়িয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিব।"

এমন সময় নলিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চোখের কোলে কালি, মুখে নিবিড় অন্ধকারের ছায়া, মাথার চুল হাওয়ায় উড়িতেছে, জামার বোতাম খুলিয়া গিয়াছে, গায়ের চাদর ভূমিতে লুটাইতেছে। গাড়ী হইতে নামিয়াই নিরুপমাকে ডাকিয়া বলিল, "আমার বড় বিপদ! আমার স্ত্রীর ভয়ঙ্কর জ্বর,—একশো পাঁচ ডিগ্রীর উপর,—আবোল তাবোল বকিতেছে। জ্ঞান চৈতন্য নাই,—আজ রাত্রি কাটে কি না সন্দেহ!" আর কোনও কথা না বলিয়া, নিরুপমার উত্তরের প্রত্যাশা না রাখিয়া, উন্মত্তের ন্যায় আত্ম-জ্ঞান-শূন্য হইয়া, সেই গাড়ীতে উঠিয়া, বাগান হইতে বাহির

হইয়া চলিয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া ক্ষিতীশ নিরুপমাকে বলিল, "আচরণটা দেখিলে? স্ত্রী কার না আছে? আর—তাহাদের স্বামী ভিন্ন গতি কি? তুমি যে থিয়েটার ছাড়িয়া, নিজের মা বোন ত্যাগ করিয়া, উহার মুখ চাহিয়া পড়িয়া আছ,—তোমার কদর: বুঝি কিছু নাই? কত শত লক্ষপতি তোমার অনুগ্রহের আশায় সর্ব্বস্ব দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে! নলিনীর কি বিবেচনা? তার বড় হইল স্ত্রী, আর তুমি আমোদ-প্রমোদের একটি তুচ্ছ উপাদান? ছিঃ ছিঃ—নলিনী যে এতটা স্বার্থপর—তা জানিতাম না!"

তিন দিন নলিনী আর বাগানে আসে নাই। দিবারাত্রি দুর্গার রোগশয্যার পার্শ্বে থাকিয়া, প্রাণপণ যত্নে' সেবা-শুশ্রূষা করিল। চতুর্থ দিনে দুর্গা একটু সুস্থ হইলে, সে নিরুপমার সহিত আসিয়া দেখা করিল। আসিয়াই বুঝিল, নিরুপমা আজ যেন নূতন মানুষ! নলিনীকে দেখিলে যে নিরুপমা প্রাণের আবেগে ছুটিয়া আসিত, বুকের ব্যথা তুলিয়া লইবার জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিত, পায়ের কাঁটা উঠাইবার জন্য সকাতরে অপেক্ষা করিত, আজ আর সে নিরুপমা নাই! বহুদিন পরে নূতন দেশে আসিয়া, নূতন লোকের সহিত দেখা হইলে, সে যেমন আড়'-আড়' ছাড়'-ছাড়' ব্যবহার করে, নিরুপমার আচরণও আজ ঠিক সেইরূপ!

নলিনী বুঝিল যে, তাহার পীড়িতা পত্নীকে দেখিতে গিয়াছিল বলিয়া, নিরুপমার বিবেচনায় সে অপরাধী! এত দিনে সে প্রাণে

প্রাণে অনুভব করিল যে, প্রাণভরা ভালবাসা পাইলেও, পর—চিরদিনই পর! তাহার স্বার্থের গণ্ডীর বাহিরে পা দিলেই, সে অন্য মানুষ হইয়া যায়। তবে এ কি করিতেছি? কোন্ পথে যাইতেছি? কে আমায় বুঝাইয়া দিবে, কে আমার আপনার—কে পর?

সে দিন অমাবস্যা রাত্রি, অন্ধকার ঘুট্‌ঘুট্ করিতেছে, বিশ্বব্যাপী আঁধারের একটা করালছায়া যেন ধীরপাদবিক্ষেপে শূন্য হইতে শনৈঃ শনৈঃ নামিয়া আসিতেছিল। মৃদুমন্দ বাতাসে নারিকেল ও তালগাছের পত্রগুলি মাথা নাড়িয়া প্রেতের ন্যায় বিভীষিকাময়-স্বরে সাড়া দিতেছিল।

নলিনী ইতিমধ্যে বেশী করিয়া ব্র্যাণ্ডীর মাত্রা চড়াইয়া দিয়া, অর্দ্ধ-সচেতন অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় পুষ্করিণীর চাতালের উপর পড়িয়া, অন্ধকারময় রজনীর নীরব নক্ষত্রের অপরিচ্ছন্ন আলোকে আপনার অস্তিত্ব মিশাইয়া দিয়া, অনেক কথা ভাবিতেছিল। ক্ষিতীশ আসিয়া বলিল, "নিরুপমা আজ এক গেলাসেই ঘাল হইয়া পড়িয়াছে। এমন ঘুম তাহার কখনও দেখি নাই!

নলিনী কহিল, "থাক্—ঘুমাইতে দাও, ডাকিয়া কাজ নাই! তুমিও ঘুমাও—আমিও ঘুমাই—জগতের সকলেই ঘুমাক্! ঘুমেই শান্তি—জাগরণে বড় জ্বালা!"

ক্ষিতীশ সরিয়া আসিল,—চন্দ্রাকে ডাকিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিয়া দিল। চন্দ্রা একটু মধুর হাসি হাসিয়া, রূপের মাধুরী ছড়াইতে ছড়াইতে, নয়নের চোকা চোকা বাণ শাণিত করিতে

করিতে, নিবিড় নিতম্বে তুমুল তুফান তুলিয়া, ধীরে ধীরে নলিনীর শিয়রে গিয়া বসিল। নলিনী তখন কিসের একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায়—প্রাণের বেদনায় অস্ফুটস্বরে কি বলিতেছিল!

চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "কি কষ্ট হইতেছে?"

নলিনী মনে করিল, নিরুপমা তাহার ব্যথার ব্যথী হইয়া আসিয়াছে! নিরুপমার উপর আজ তাহার প্রবল অভিমান জাগিয়াছে। সে প্রাণের আবেগে চন্দ্রার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"আমার কি কষ্ট—তুমি কি বুঝিবে নিরুপমা?"

ক্ষিতীশের পরামর্শে নিরুপমা আজ নেশার ভাণ করিয়া পড়িয়াছিল। যথাসময়ে ক্ষিতীশ নিরুপমাকে ডাকিয়া আনিয়া, কামিনী-গাছের আড়াল হইতে দেখাইয়া দিল যে, নলিনী চন্দ্রার গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রেমালাপ করিতেছে! নিরুপমা আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল,—সহস্র বিষধর একত্র হইয়া তাহার মাথায় দংশন করিতে লাগিল। চীৎকার করিয়া সে ডাকিল,—"নলিনী!" ভয়চকিতা চন্দ্রা অন্ধকারে লুক্কায়িতা হইল। দ্রুতপদে নিরুপমা নলিনীর কাছে আসিয়া তাহার মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে জাগাইল, বলিল,—"এরূপ কপট ঘুম শিখাইল কে? আর আমি বেশী কথা কহিতে চাহি না, তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। আমি আমার মার কাছে যাইব। বাধা দিও না; বাধা দিলে আমি সে বাধা মানিব না।"

সেই অন্ধকারে, সেই মসীময় নীরব নিশীথে, সেই মন্দ

পবনান্দোলিত বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরশব্দে—প্রকৃতির বিভীষিকাময়ী লীলার মধ্যে—নিরুপমার কর্কশ কঠোর কোমলতাহীন কণ্ঠস্বর, নির্ম্মম নির্দ্দয় নিষ্ঠুর প্রস্তাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া নলিনীর মর্ম্ম স্পর্শ করিল! সে বলিল, "তুমি যদি যাইতে চাও, আমি কেন বাধা দিব? তোমার মুক্তপথ, যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও। পর আপনার হয় না,—এ কথা বুঝি নাই বলিয়াই আজ আমার এই দুর্দ্দশা!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নিরুপমার মাতার মনঃকষ্টের সীমা নাই। কোথাকার এক আপদ উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া তাহার রোজগারী মেয়েকে পর করিয়া দিল, এ ক্ষোভ রাখিবার স্থান ছিল না। সে নিত্য গঙ্গাস্নান করে, শশ্মানেশ্বরের মন্দিরে গিয়া মাথা খোঁড়ে, মনে মনে নলিনীকে শত সহস্র গালি পাড়িয়া অতি শীঘ্র তাহার নিপাত কামনা করে। যে বাড়ীতে তাহারা পূর্ব্বে বাস করিতে-ছিল, সে বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া হোগলকুঁড়িয়ার ভিতর একখানি সামান্য ঘর ভাড়া করিয়া, সে একাকিনী কোন মতে দিন কাটাইতেছিল। জ্বালার উপর জ্বালা! তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাও আজ দুই মাস হইল ঝগড়াঝাঁটি করিয়া, তাহার পূর্ব্ব প্রণয়ীকে লইয়া খালধারে গিয়া বাস করিতেছে।

নিরুপমার মাতা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে দুঃখের ভাত সুখ করিয়া খায়, গহনাগুলি পুতু-পুতু করিয়া এক রকম বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া শোয়, নগদ টাকা কড়ি যাহা কিছু ছিল, প্রতিদিন তিন চারিবার গণ্ডা গণ্ডা করিয়া গণিয়া সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া চাহিয়া ভাল করিয়া পুঁটুলি বাঁধিয়া যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমায়।

নিরুপমা যখন মাতার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া নলিনীর সহিত চলিয়া যায়, তখন সে তাহার গহনাপত্র ও টাকাকড়ি কিছুই লইয়া যায় নাই, এ কথা পাঠকবর্গ অবগত আছেন।

রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশ ঘনঘটায় পূর্ণ, জনকোলাহলময়ী মহানগরী একরূপ সুপ্ত বলিলেই হয়। এমন সময় একখানি ঘরের গাড়ী আসিয়া নিরুপমার মাতা যে বাড়ীতে ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিল, তাহারই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে ও কে নামিল? আমাদের নিরুপমা না? হাঁ—সেই তো বটে!

নিরুপমা কড়া নাড়িয়া 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। নিরুপমার মাতা তখন অঘোর নিদ্রায় মগ্ন; সে স্বপ্ন দেখিতেছিল যে, তাহার মেয়ে আসিয়া গহনার বাক্স ও নগদ টাকা জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে. আর সে প্রাণপণে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল, শুনিল, সদর দরজার কড়া নাড়িয়া কে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতেছে! এ কি! এ যে নিরুপমার কণ্ঠস্বর! না—

না—এও কি সম্ভব ? অসম্ভবই বা কি ! হয় তো নলিনীকে সঙ্গে করিয়া দলবল লইয়া সমস্ত গহনা ও টাকাকড়ি লইয়া যাইতে আসিয়াছে ! ভয়ে ও ভাবনায় বৃদ্ধার বুক শুকাইয়া গেল। সে পা টিপিয়া টিপিয়া সদর দরজার কাছে গিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল, কয় জনে কথা কহিতেছে ! কেবল নিরুপমার গলাই শুনিল, কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। আবার ঘরে ফিরিয়া গেল, প্রদীপটি হাতে করিয়া তুলিয়া লইল, ভাল করিয়া উস্কাইয়া দিয়া আবার দরজার কাছে আসিল। ফাঁক দিয়া দেখিল, নিরুপমাই বটে,—সঙ্গে আর কেহই নাই। বাহির হইতে তখনও কড়া-নাড়ার আওয়াজ শোনা যাইতেছিল। নিরুপমার মাতা জিজ্ঞাসা করিল, "কে—নিরুপমা ?"

নিরুপমা বলিল, "হাঁ—আমি ! শীঘ্র দরজা খোল'—বৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল।"

"তুই একা—না সঙ্গে কেউ আছে ?"

"আমি একা। সন্দেহ করিও না, তোমার মেয়ে আবার তোমার কাছে আসিয়াছে।"

এইবার নিরুপমার মাতা সাহসে ভর করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। মা ও মেয়ে দুই জনে দুই জনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া খুব খানিক কাঁদিল। তার পর নিরুপমাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া ভাল করিয়া মাথা মুছাইয়া দিল, আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া একখানি জরিপেড়ে ঢাকাই শাড়ী পরাইল, গহনার বাক্স খুলিয়া কানে দুল দুলাইয়া দিল, গলায় নেক্‌লেস্ ঝুলাইল, কোমরে বিছা

পরাইল! এতদিন পরে আবার নিরুপমাকে সেই রঙ্গময়ী, ব্রীড়াময়ী, লালসাময়ী নিরুপমা দেখাইতে লাগিল।

ঘরে একটু দুধ ও একটি সন্দেশ ছিল, মাতার অনুরোধে নিরুপমা তাহাই খাইল। তারপর একে একে নলিনীর ব্যবহার, চন্দ্রার সহিত গুপ্তপ্রেম স্বচক্ষে দর্শন, নলিনীর নিকট বিদায়গ্রহণ, গভীর রাত্রে দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া পলায়ন,—সমস্ত কথা—সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিল। নিরুপমার মাতা কোনও কথার উত্তর না দিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল। পরে কহিল, "বাবা সত্যনারায়ণের দিব্য গেলে বল্, আর আমাকে ছেড়ে যাবিনি?"

নিরুপমা বলিল, "মা, আমাদের আবার দিব্য কি? দেবতা কি? ধর্ম্ম কি? যে ব্রতে আমরা ব্রতী, অধর্ম্মই আমাদের একমাত্র ইষ্টমন্ত্র। আমি অন্য শপথ জানি না, তোমার মাথা ছুঁইয়া বলিতেছি, বড়লোকের সহিত পিরীত করার সাধ আমার মিটিয়া গিয়াছে। ব্যবসা বজায় করিয়া যদি কাহাকেও ভালবাসিবার ইচ্ছা হয়, তবে গরীবের ছেলেকেই ভালবাসিব। যে আমার হুকুম মানিয়া চলিবে, তাহাকে আপনার করিবার চেষ্টা করিব।"

ইহাকেই বলে জন্মার্জ্জিত সংস্কার!

শেষে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ঝগড়া করিয়া খালপারে চলিয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া নিরুপমা প্রতিশ্রুত হইল যে, কাল সকালে সে নিজে গিয়া বোনকে ডাকিয়া আনিবে। অনেক দিন পরে মা ও মেয়ের আবার মিলন হইল; সেই ক্ষুদ্র গৃহে আনন্দের স্রোত

উথলিয়া উঠিল; তৈলশূন্য প্রদীপ নিবিয়া নিবিয়া জ্বলিতে লাগিল।

পাঠকবর্গ! আজিকার এই শুভ সম্মিলনের দিনে গ্রন্থকারের সহিত মিলিত হইয়া আপনারা উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করুন!

নলিনীর কি হইল? এইবার সে কথা বলিব।

নিরুপমা যখন নলিনীর নিকট বিদায় চাহিল, তখন নলিনী বলিয়াছিল, "তোমার মুক্ত পথ!" তার পর নিজে গাড়ী তৈয়ারী করিবার হুকুম দিল, নিরুপমাকে গাড়ীতে উঠিতে বলিল, কয়েক-খানি নোট তাহার হাতে দিল, নিরুপমা তাহা কোচ্‌ম্যান্, সইস্ ও বাগানের মালীদের ডাকিয়া হাসিমুখে বিলাইল।

কাহারও মুখে কথা নাই, উভয়েই নিজ নিজ চিত্ত যেন দধীচির অস্থিতে নির্ম্মিত করিতেছিল,—কে জানে—এ বজ্রাগ্নিতে কে পুড়িয়া মরিবে?

নিরুপমার একবার মনে হইল, যাইবার সময় একটীবার বলিয়া যায়, "আমি চলিলাম, তুমি সুখী হও।" নলিনীরও—"তোমার জন্য আমি কি কিছু করি নাই? তুমি বিনা দোষে আমায় ত্যাগ করিয়া চলিলে?" এই কথা বলিবার জন্য বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু প্রাণের কপাট রুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া, মুখের কপাট কাহারও খুলিল না।

এমনই হয়, যখন ভাঙ্গে, এমনই করিয়াই ভাঙ্গে, সহস্র চেষ্টা করিলেও আর গড়া যায় না।

এইবার ক্ষিতীশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া সস্নেহে

নিরুপমাকে বলিল, "নিরুপমা! চলিলে ভাই? বড় আনন্দেই মিলিয়া মিশিয়া দিন কাটাইতেছিলাম,—অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! হায়—হায়—বিধাতার কি নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা!" নিরুপমা নীরব!

ক্ষিতীশচন্দ্র আবার বলিল, "নিরুপমা! নিতান্তই যদি চলিলে একটা কথা তোমাকে বলিয়া দিই। তোমার মা এখন তোমাদের পুরাতন বাড়ীতে নাই, তিনি হোগলকুঁড়িয়ায় উঠিয়া আসিয়াছেন।"

নিরুপমা কোনও কথা কহিল না।

অনন্যোপায় হইয়া ক্ষিতীশ তখন কোচ্‌ম্যানকে বিশেষ করিয়া নিরুপমার মাতার নূতন বাসস্থানের ঠিকানা বুঝাইয়া দিল।

গাড়ী চলিল। প্রথমে আস্তে আস্তে—তারপর একটু জোরে—তার পর বাগানের গেট্ পার হইলে, তীব্র কশাঘাতে ব্যথিত হইয়া অশ্বিনী যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া চলিল।

নলিনী প্রাণপণযত্নে মন বাঁধিয়াছিল বটে, কিন্তু এইবার আর চোখ বাঁধিতে পারিল না। যেন বহুকালের রুদ্ধ প্রস্রবণ মন্ত্র-প্রভাবে মুক্ত হইয়া শতধারে ছড়াইয়া পড়িয়া শুষ্ক তপ্ত অভিশপ্ত মরুভূমির বক্ষে করুণায় মথিত হইয়া গড়াইয়া চলিল। ক্ষিতীশ কাছে বসিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। চন্দ্রা দূরে দাঁড়াইয়া নৈশ অন্ধকারে মিশাইয়া গিয়া নিঃস্পন্দ হইয়া এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

নলিনী এক বোতল ব্র্যাণ্ডী লইয়া আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ

করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। নেশায় বিভোর হইয়া সে ভাবিতে লাগিল, দুর্লভ মানব-জন্ম ধারণ করিয়া সংসারে আসিয়া পিতৃপ্রদত্ত অজস্র অর্থ অপব্যয় করিয়া কি করিলাম—কি পাইলাম—কি শিখিলাম? অন্ধ হইয়া যে রত্নের অন্বেষণে এত দিন ঘুরিয়া মরিলাম, তাহার পরিণাম কি হইল? কাঞ্চন ফেলিয়া কাঁচে গেরো দিলাম! সুধা ফেলিয়া গরল তুলিয়া আনিলাম! আর দুই দিন পরে পথের ভিখারী হইতে হইবে। তখন কে আমার মুখ চাহিবে? কে আমার সহিত কথা কহিবে? কে আমার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে?”

এইবার দুর্গার কথা মনে পড়িল। আহা! তেমনটি কি আর হয়! কত অত্যাচার—কত অনাদর—কত অবিচার—সে নীরবে সহ্য করিয়াছে। কখনও মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলে নাই। আমার শত সহস্র অপরাধ সে চিরজীবন গুণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। পাপকার্য্য করিতে গিয়া বিপদে পড়িয়া তাহার কাছে দাঁড়াইবামাত্র সে তাহার যথাসর্ব্বস্ব আমার হাতে তুলিয়া দিয়াছে, কখনও কিছু প্রতিদানের আশা করে নাই। আমি পিশাচ! তাহার বুকে শেলাঘাত করিয়াছি, আমার এখনও অনেক দুর্দ্দশা বাকি!

নলিনী বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। ছিঃ ছিঃ নলিনী! এত জল তোমার চোখে ছিল? ঠিক সময়ে যদি ইহার ফোঁটা কতক ফেলিতে পারিতে, তবে আজ তোমাকে রুদ্ধ-গৃহে কণ্টক-শয্যায় শয়ন করিয়া—স্মৃতির বৃশ্চিক-দংশনে উন্মাদ

হইয়া এরূপ মৃত্যুযন্ত্রনা অনুভব করিতে হইত না! অনুতাপ ও আত্মগ্লানিতে নলিনীর প্রাণ পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিশু সন্তানের চারু চন্দ্রানন—রঙ্গালয়ের দৃশ্যপটের ন্যায় তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনীর তখন খুব নেশা! সে কল্পনার চক্ষে স্পষ্ট দেখিল, তাহার একমাত্র বংশধর শিয়রে দাঁড়াইয়া সজলনয়নে বলিতেছিল,—'তুমি তো আমোদ করিয়া সব উড়াইয়া দিলে, আমার ভবিষ্যতের জন্য কি করিলে? আমি কার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইব?' নলিনী আর সহ্য করিতে পারিল না, অচেতন হইয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

মানুষের জীবনে অনুশোচনার দিন অনেক আসে, মনে হয়, এইবার নূতন মানুষ হইব, জীবনস্রোত নূতন পথে ফিরাইয়া দিব, বুকের ভিতর যাহাতে আগুন জ্বলে, এমন কাজ আর কখনও করিব না। কিন্তু তা হয় না, মানুষ ঠেকে,—কিন্তু একবারে শেখে না! একবারের আঘাতে যদি চৈতন্যের উদয় হইত, তবে সংসার সুখময় হইত।

কে জানে—এইবার নলিনীর জ্ঞানদৃষ্টি বিকশিত হইবে—না—মোহের অন্ধকারে আবার সে ডুবিয়া যাইবে!

সে ভয়ানক রাত্রি এই ভাবে কাটিয়া গেল।

পরদিন বেলা আটটা বাজিতে না বাজিতে ক্ষিতীশ চন্দ্রাকে ডাকিয়া আনিয়া হল্-ঘরে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "চন্দ্রা! আপদ ত' বিদায় হইয়াছে। এইবার তোমার রাজত্ব! যাহা

কিছু পার, এইবার হাতাইয়া লও। তার পর এখান হইতে সরিয়া পড়ি, চল।”

চন্দ্রা ভ্রূকুটী করিল, উচ্চকণ্ঠে বলিল, “যাহা হইবার হইয়াছে, পাপের মাত্রা বাড়াইতে আমি আর প্রস্তুত নহি। তোমার লজ্জা করে না—এমন কথা তুমি মুখে আন? তুমি কি মানুষ? যে তোমায় ভালবাসিয়া. কুলে কালি দিয়া, তোমার উপর সর্ব্বস্ব নির্ভর করিয়া তোমার সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে, তুচ্ছ অর্থ উপার্জ্জনের জন্য তাহাকে ওরূপ নীচকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পরামর্শ দাও? ছিঃ! তুমি এত দূর স্বার্থপর? পূর্ব্বে যদি বুঝিতাম, তাহা হইলে এ পথে আসিয়া দাঁড়াইতাম না।”

ক্ষিতীশ রাগিবার পাত্র নহে, সে রাগিল না, হাসিয়া হাসিয়া বলিল, “তোমার বয়সও কাঁচা, বুদ্ধিও কাঁচা! পরে বুঝিবে—আমি তোমায় ভাল পরামর্শ দিতেছি, কি তোমার মন্দের জন্য বলিতেছি! আমার বাঁধা আয় কিছুই নাই। এখন হইতে দুটো সংসার ঘাড়ে পড়িল। চালাইব কি করিয়া? তোমার যা কিছু নগদ টাকা আছে, তাই কি ভাঙ্গাইয়া খাইব? নলিনী যদি নিরুপমার হাতটা একবার ধরিত, তাহা হইলে সে কি যাইতে পারিত? কেবল তোমাকে পাইবার আশাতেই নলিনী নিরুপমাকে ছাড়িয়াছে। এ সুযোগ কেন অবহেলা কর?”

চন্দ্রা দলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল, “আবার যদি তুমি আমার কাছে ওরূপ নীচ প্রস্তাব কর, আমি এই দণ্ডে চলিয়া যাইব। আর কখনও তোমার মুখ দেখিব না।”

ক্ষিতীশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া চন্দ্রার মুখ চাপিয়া ধরিল, কহিল, "কি কর? আমার সর্ব্বনাশ করিবে, মনঃস্থ করিয়াছ? সাম্‌নের ঘরে নলিনী শুইয়া আছে! সে শুনিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? তাহার বিশ্বাস—তুমি তাহাকে ভালবাস। সে যদি বোঝে, আমি তোমাকে পরামর্শ দিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতেছি, তা হইলে আজই আমাদের বিদায় করিয়া দিবে। তোমায় লইয়া কোথায় দাঁড়াইব, বল দেখি?"

চন্দ্রা উঠিয়া দাঁড়াইল, ললিত ললাট কুঞ্চিত হইল, লালসা-লুব্ধ নয়নে অনল জ্বলিল, কুন্দ দন্তে কম্পিত ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, "তুমি পাষণ্ড! তুমি নরাধম! তুমি ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক!"

চন্দ্রার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে, নলিনীর শয়ন-কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল, রুদ্ধ অর্গল খসিয়া পড়িল, হল্-ঘরের মার্ব্বেল টেবিল উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। বিবর্ণবদন—মলিননয়ন—বিস্রস্তবসন নলিনী—কক্ষ-চ্যুত গ্রহের ন্যায় ক্ষিতীশ ও চন্দ্রার সমক্ষে উপস্থিত হইল। চন্দ্রাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "চিন্তা কি চন্দ্রা, তুমি আমার ভগিনী—আমার সহোদরা—আমার স্নেহময়ী সোদরা। আমি বড় দুঃখী, আমার কেহ নাই;—যাহারা আমার আপনার ছিল, ইচ্ছা করিয়া তাহাদের পর করিয়াছি! আমি তোমার নিকট ভ্রাতৃপ্রেমের ভিখারী! এ সংসার আমার চক্ষে মরুভূমি। দাও ভগিনী! আমায় একটু সহোদরার স্নেহ দাও!"

বৃন্তচ্যুত অপরাজিতার মত চন্দ্রা নলিনীর পদতলে লুণ্ঠিতা হইয়া করুণকণ্ঠে কহিল,—"ভাই—ভাই—তুমি মানুষ না দেবতা ?" নবোদিত সূর্য্য আকাশ হইতে এ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া হাসিল, পবিত্র প্রভাতবায়ু নলিনীর মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কমল-বালা নলিনীকে সম্ভাষণ করিবার জন্য দুলিয়া দুলিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল। ক্ষিতীশ স্তম্ভিত হইয়া একখানা কৌচের উপর বসিয়া পড়িল। সেই পর্য্যন্ত নলিনীর সহিত ক্ষিতীশের চির-বিচ্ছেদ ঘটিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যামিনীভূষণের একমাত্র পুত্র সজনীকান্ত এখন বেশ মাতব্বর হইয়া উঠিয়াছে। সে হ্যাণ্ডনোট কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে, মেয়েমানুষ রাখিয়াছে, মদ ধরিয়াছে, 'কাপ্তেন' বলিয়া বাজারে বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে! অনেকগুলি 'বাপে-খেদান' 'মায়ে তাড়ান' ভদ্রসন্তান-নামধারী ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক মোসাহেব-রূপে জুটিয়াছে। ভাল করিয়া নাম সহি করিতে শিখিবার পূর্ব্বেই সজনী বিদ্যালয়ের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছিল।

যামিনীর বন্ধুবান্ধবেরা সজনীর গুণাগুণের কথা তাঁহার কর্ণ-গোচর করিলে, তিনি হাসিয়া উত্তর দিতেন, "ও সব কথা কি

কাণে তুলিতে আছে? ও বয়সে আমারাও ঢের করিয়াছি। পাঁচ রকম না দেখিলে শুনিলে মানুষ কিরূপে শিক্ষালাভ করিবে?”

যামিনীভূষণ বিশেষ বুদ্ধিমান হইয়াও পুত্রের সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তিনি বৃহৎ কার্য্যে বৃহৎ ভুল করিয়াছিলেন, তাই শেষ রক্ষা হইল না। বিধাতার অপূর্ব্ব বিধান! এক জন এক জনকে ঠকাইয়া বেশ গুছাইয়া ওঠে, মনে মনে গর্ব্বিত হইয়া আপনার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করে, কিন্তু উপরে যে এক জন দাঁড়ি-পাল্লা ধরিয়া নিরপেক্ষভাবে পাপ পুণ্যের ওজন করিতেছেন, সে কথা ধারণা করিতে একেবারেই ভুলিয়া যায়। শেষে এমন দিন আসে, যখন যুক্ত-করে সজলনেত্রে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে আকাশপানে চাহিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিতে হয়, ‘প্রভু! অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা কর! যাহা লইয়াছি, সমস্ত ফিরাইয়া দিতেছি। আমার প্রাণের শান্তিটুকু আবার আমায় দাও, আমি কুটীরে গিয়া বাস করিব।’

যাহা পুরাতন, যাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, সৃষ্টির বিকাশ হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা চলিয়া আসিতেছে, যামিনীভূষণের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। চরিত্রহীন হতভাগা যুবক নলিনীকে নানারূপ চক্রান্তজালে জড়িত করিয়া, যদিও তিনি জলের দামে তাহার সমস্ত সম্পত্তি আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া মনে মনে আপনাকে খুব বাহাদুর ঠাওরাইয়াছিলেন, কিন্তু যিনি দুনিয়ার মালিক—তিনি নিজস্থানে বসিয়া—বিশ্বপ্রসারিত দৃষ্টিতে সমস্ত দেখিয়া—বিদ্রূপের

হাসি হাসিয়া পূর্ব্ব হইতেই জমা-খরচ ঠিক করিয়া কৈফিয়ৎ কাটিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। বড় সাধের একমাত্র পুত্র হইতেই যামিনী-ভূষণের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, সজ্জিত সংসার কিরূপে ছারখারে গিয়াছিল, স্রষ্টার সৃষ্টি-রহস্য—কবির তূলিকায় চিত্রিত বিচিত্র চিত্রের ন্যায় কিরূপ উজ্জ্বলবর্ণে বিভাসিত হইয়াছিল, তাহার যথাযথ বিবরণ আবার পাঠকবর্গকে যথাসময়ে জানাইব।

দুর্গা এখন আর তাহার বাপের বাড়ীতে নাই। নলিনীর মাতা তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছেন। বড় বৌয়ের চাল একটু উঁচু, স্বভাব একটু গর্ব্বিত; দুর্গা মাটীর মানুষ—শ্বাশুড়ী-অন্তপ্রাণ,—শ্বাশুড়ীর সেবা করিতে পাইলে সে যেন স্বর্গ হাতে পায়, মুখে সর্ব্বদা হাসিটী লাগিয়াই আছে, তাই নলিনীর মাতা দুর্গাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন; তাহার অদৃষ্টের কথা মনে মনে স্মরণ করিয়া গোপনে অশ্রুবর্ষণ করেন, তাহার সব আছে, অথচ কিছুই নাই—এই ভাবিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যায়। এক একদিন গভীর রাত্রে চুপি চুপি দুর্গার ঘরে গিয়া দেখেন—সে তখনও ঘুমায় নাই, শাপভ্রষ্টা দেববালার ন্যায়—আলুলায়িতকেশে—দীনা-হীনা মলিনার বেশে—ভগবান রামকৃষ্ণদেবের পটখানি সম্মুখে রাখিয়া ভক্তিভরে পূজা করিতেছে। শয্যার উপর সুন্দর সুকুমার শিশুটি অকাতরে ঘুমাইতেছে। দূর হইতে দেখিয়া—দেখিয়া—দেখিয়া, চাহিয়া—চাহিয়া—চাহিয়া, নলিনীর মাতা আত্মবিস্মৃতা হইয়া, উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে—অশ্রুপূর্ণলোচনে—

ভগবানের উদ্দেশে বলেন, 'প্রভু! সত্যই কি কলিতে তোমার মহিমা লোপ পাইয়াছে?'

নিরুপমার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, ক্ষিতীশ ও চন্দ্রাকে বাগান হইতে বিদায় দিয়া, দিবা দ্বিপ্রহরে অনাহারে অসুস্থ-অবস্থায় নলিনী বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনীর মাতা ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নলিনী অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুই এক গ্রাসমাত্র খাইল। তার পর দুর্গার সহিত সাক্ষাৎ হইল।

নলিনী আজ প্রাণ খুলিয়া কথা কহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এ কি—মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না, মন ছোটে ছোটে ছোটে না!

দুর্গা হাসি-হাসি-মুখে শিশু সন্তানটিকে বুকে লইয়া নলিনীর কোলে তুলিয়া দিল। মধুর অধরে হাসির লহরী তুলিয়া, প্রাণের পুত্র নলিনীর কোলের উপর খেলিতে খেলিতে কোমল কিশলয়তুল্য করপল্লব নলিনীর পায়ের উপর রাখিয়া, বুকভরা ব্যথা লইয়া, কঠোরচিত্ত পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যদিও সে তখনও ভাল করিয়া কথা কহিতে শেখে নাই, তথাপি নলিনী যেন স্পষ্ট শুনিল,—সেই সংসার-অনভিজ্ঞ বালক বলিতেছিল, 'ছিঃ ছিঃ, তুমি এত নিষ্ঠুর? আমার মাকে কাঁদাইতেছ, আমাকে কাঁদাইতেছ, তোমার কি ভাল হইবে?'

নলিনীর মনে হইল, 'যদি এই মুহূর্ত্তে আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা সুখী কে?'

সাগর-তরঙ্গ কোনও রূপে প্রতিরোধ করিয়া নলিনী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "দুর্গা! সব শেষ হইয়াছে। আমার সাধের স্বপ্ন ফুরাইয়াছে। যে ভুল বুঝিয়া মজিয়াছিলাম, যাহার কুহকে আত্মহারা হইয়া পাপ পুণ্য বিচার করি নাই, এই স্বার্থপূর্ণ সংসারে যাহাকে সর্ব্বস্ব ভাবিয়াছিলাম, যাহার ভালবাসা জীবনের নিত্য-উপভোগ্য সামগ্রী জ্ঞানে তোমার মুখ চাহি নাই, সন্তানের মুখ চাহি নাই, মার মুখ চাহি নাই, আত্মীয় স্বজনের মুখ চাহি নাই, সে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তোমার সহিত যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি, চিরজীবন ধরিয়া তোমাকে যেরূপ মর্ম্মান্তিক মনঃকষ্ট দিয়াছি, নিজের সুখের ও স্বার্থের জন্য পিশাচের অধম হইয়া তোমাকে যেরূপ হতাদর করিয়াছি, তাহার শতাংশের একাংশও তাহার সহিত কখনও করি নাই। তবুও বিনা দোষে—বিনা কারণে—বৃথা সন্দেহে—সে আমায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সব জানিয়াও, সমস্ত বুঝিয়াও, এ দুর্ব্বল চিত্তকে কিছুতেই বশে আনিতে পারিতেছি না। প্রাণ কাঁদিতেছে, বুকের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে, ছুটিয়া গিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য মন আকুল হইতেছে। ছি! ছি! পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছিলাম কেন? হৃদয়ের উপর যাহার একটুও আধিপত্য নাই, তাহার মরণই মঙ্গল। দুর্গা! মনের পাপ মুক্তপ্রাণে তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম, হতভাগ্যের অপরাধ মার্জ্জনা করিও।"

নলিনী আর চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না, কাঁদিয়া

কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুর্গার মুখ—বুক—রমণী-জীবনের সুখ—সমস্ত ভাসাইয়া দিল।

যে রাক্ষসী মন্ত্রপ্রভাবে মোহজাল বিস্তার করিয়া তাহার সাধের স্বামীকে পর করিয়াছিল, অজানিত অপরিচিত অপ্রত্যাশিত সুদূর প্রদেশ হইতে আসিয়া যে পিশাচী তাহার অভীষ্ট দেবতার স্বর্গীয় স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিতেছিল, পতিপ্রাণা পতিব্রতা রমণীর হৃদয়-রাজ্য হইতে তাহার রাজাধিরাজকে কাড়িয়া লইয়া যে শয়তানী আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল, সে পাপ স্বেচ্ছায় বিদায় হইয়াছে, এ সংবাদে দুর্গা যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিল। কাহার না হয়? দুর্গা রক্ত-মাংস-গঠিতা মানবী তো বটে! কিন্তু নলিনীকে কাঁদিতে দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, ভগবান রামকৃষ্ণের চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া সে মন বাঁধিল; নশ্বর জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত সাধ, সমস্ত আহ্লাদ বিলাইয়া দিয়া, ক্ষুদ্র স্বার্থের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, সে নলিনীকে বলিল, "সে অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তুমি ডাকিলেই আবার আসিবে। আমি বেশ জানি, সে তোমায় ভালবাসে। তা না হইলে, মাকে পর করিয়া, থিয়েটার ছাড়িয়া, সে তোমার আশ্রয়ে আসিত না। তুমি একবার তাহার সহিত দেখা করিয়া, প্রাণের ব্যথা জানাইয়া, দুটো মিষ্ট কথা বলিলেই সে আর স্থির থাকিতে পারিবে না। তুমি যাও, তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া আবার সুখী হও। আমার জন্য ভাবিও না,—তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ, তোমার তৃপ্তিতেই আমার

তৃপ্তি। তোমায় কেহ পর করিতে পারিবে না। আমি তোমার পদসেবার দাসী, চিরদিন দাসীই থাকিব। ভগবান রামকৃষ্ণের পট তুমিই আমায় আনিয়া দিয়াছিলে, তুমিই আমায় পূজা করিতে শিখাইয়াছিলে। দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী সকলের পূজা ছাড়িয়া, এখন আমি রামকৃষ্ণের পূজা সার করিয়াছি। তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই কর; আমার কোনও দুঃখ নাই।”

হিন্দুর সর্ব্বস্ব গিয়াছে বটে, হিন্দু আজ দীনহীন পথের ভিখারী বটে, হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম কালমাহাত্ম্যে প্রায় লোপ পাইতেছে বটে, কিন্তু এখনও তাহাদের গর্ব্ব করিবার যাহা আছে,—আজ পর্য্যন্ত যে অমূল্য রত্নের তাহারা অধিকারী, তাহার তুলনায়—শত সহস্র সাম্রাজ্য তুচ্ছ—নগণ্য—তৃণাদপি ক্ষুদ্র !! সে সামগ্রী আর কিছুই নহে,—দুর্গার মত পতিপ্রাণা—আত্মত্যাগপরায়ণা—সতী কুলরাণী—

হিন্দুরমণী !!

নলিনীর মনে হইল, বহুদিন পূর্ব্বে ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জনৈক ভক্ত গুরুদেবের একখানি চারু চিত্র তাহাকে উপহার দিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ নরদেবতার পট বলিয়া নলিনী দুর্গাকে সে ছবি উপহার দিয়াছিল! নলিনী সে মহাপুরুষকে ভুলিয়াছে, দুর্গা তাঁহাকে সাকার ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করে। তাঁহার চরণে তাহার অটল বিশ্বাস।

সরমে মরমে মরিয়া গিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, পরম-

পুরুষ পরমহংসদেবের পবিত্র পাদপদ্ম হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া, বড় বেদনায় বড় যাতনায় নলিনী ডাকিয়া বলিল, "করুণাময়! অশিক্ষিত রমণীর হৃদয়ে বল দিয়া তাহাকে উন্নত করিলে, আর আমার সমস্ত শক্তি অপহরণ করিয়া সংসারে এরূপ বর্ব্বর করিয়া রাখিলে কেন?"

নলিনী দুর্গাকে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বহির্বাটীতে কিসের একটা গোলমাল শোনা গেল। নলিনী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সজনীকান্ত মাতাল হইয়া আসিয়া দরোয়ানকে খুব মারিয়াছে! চাকর বাকর যে সম্মুখে আসিতেছে, তাহাকেই মুষ্ট্যাঘাত করিতেছে, বাড়ীতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

আর কেহ কোনও কথা কহিতে সাহস করিল না; দরোওয়ান দেউড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া গেল, চাকর বাকরেরা যে যার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তখন সজনী টলিতে টলিতে নানারূপ অশ্রাব্য বচন আওড়াইতে আওড়াইতে, আপনার বৈঠকখানায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

দ্বিতলের ছাদ হইতে যামিনীভূষণ সমস্ত দেখিলেন, সমস্ত শুনিলেন; মনে মনে ভাবিলেন, "দোষ কাহার? যেমন দেখাইয়াছি, পুত্রও তাহাই শিখিয়াছে। এ প্রাণনাশী খেলার আমিই শিক্ষক!"

ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কে তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নিতান্ত অনিচ্ছায় নলিনীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র এখন চন্দ্রাকে লইয়া হাড়কাটার গলির ভিতর একখানি জীর্ণ একতলা বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিল। চন্দ্রার যে নগদ টাকা ছিল, ক্ষিতীশ তাহা হইতে পূর্ব্বেই কিছু খরচ করিয়াছিল। এইবার চন্দ্রা সমস্ত টাকাকড়ি নিজের হাতে লইয়াছে, ক্ষিতীশের সে অর্থের উপর আর কোনও অধিকার নাই। নানা উপায়ে কোনদিন এক টাকা—কোনদিন আট আনা আনিয়া সে চন্দ্রার হাতে দেয়, তবে বাজার হয়, তবে রান্নাবান্নার জোগাড় হয়। এ দিকে তাহার বিবাহিতা স্ত্রী, পুত্রকন্যাগণ অন্নাভাবে মারা যাইতে বসিয়াছে। পরিবারের বস্ত্র শতছিন্ন, দারুণ শীতে একখানি গরম গায়ের কাপড় নাই; কোনও দিন একসন্ধ্যা—কোনও দিন উপবাস। তাহার উপর আবার বড় মেয়েটী বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে; সে এগারো উতরাইয়া বারোর কোটায় পা দিয়াছে, আর কোনও মতে রাখা যায় না। কিন্তু সে চিন্তা করে কে? ক্ষিতীশ চন্দ্রাকে লইয়া উন্মত্ত। সে সব ছাড়িতে পারে, সমস্ত ভাসাইয়া দিতে পারে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সংসার, সমাজ,—তাহার পক্ষে তৃণাদপি তুচ্ছ, কিন্তু চন্দ্রা তাহার সর্ব্বস্ব—চন্দ্রা তাহার জীবনের জীবন। চন্দ্রা চোখের অন্তরাল হইলে সে পলকে প্রলয় দেখে। ক্ষিতীশের পত্নীর নাম অন্নপূর্ণা। ধৈর্য্যে—গাম্ভীর্য্যে—দয়ায়—

দাক্ষিণ্যে—পতিসেবায়—সংসারপরিচালনায় অন্নপূর্ণা যথার্থই অন্নপূর্ণা। তাহার যৎসামান্য কিছু অলঙ্কার ছিল, তাহাই এক একখানি করিয়া আধাকড়িতে বেচিয়া, সে কোনমতে পুত্রকন্যা-গণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এইবার তার কানের দুইটী মাকড়ী, আর দুই হাতের আটগাছি চুড়ী ভিন্ন আর কিছুই সম্বল নাই। তাহাও বিক্রয় করিবার জন্য সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত,—সোনা রূপার মায়া তাহার কিছুমাত্র নাই,—বিন্দু বিন্দু করিয়া তাহার দেহের সমস্ত শোণিতপাত করিতেও সে পশ্চাৎপদ নহে; কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের কি হইবে, জাতি ধর্ম্ম কিসে রক্ষা পাইবে, শ্বশুরকুলের মান সম্ভ্রম কিসে বজায় থাকিবে, এই ভাবিয়াই সে আকুল হইয়াছে। স্বামীকে দেখা করিবার জন্য অনেক দিব্য দিয়া বার বার পত্র লিখিয়াছে, কিন্তু 'কাকস্য পরিবেদনা', কে কার খোঁজ লয়, কে সে সকল পত্রের উত্তর দেয়, কে বাজে সময় নষ্ট করিয়া ক্ষণকালের জন্যও চন্দ্রার দৃষ্টির বহির্ভূত হয়? ক্ষিতীশ এখন চন্দ্রাময়। তাহার মনে হয়,—'কে সে অন্নপূর্ণা? সে ত' একটা পুরাতন বন্ধনমাত্র, তাহাতে নূতনত্ব কি আছে? যিনি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আহার যোগাইবেন, আমি কেন ভূতের বেগার খাটিয়া মরি? পৃথিবীতে দুই দিনের জন্য আসিয়াছি, মৃত্যু নিশ্চিত, কে কবে যায়—তাহার স্থিরতা কি? সংসারে উপভোগ করিবার একমাত্র সামগ্রী—রূপ! সেই রূপের সমুদ্র যখন ঘরের মধ্যে পুরিয়াছি, ভাল করিয়া হাবুডুবু খাই। চোখ বুজিলে কে কার?'

মানব-চরিত্রের অদ্ভুত বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব এই যে, ঘোরতর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াও, জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিয়াও, বিবেকের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও, বিধাতার নীতি-রাজ্যের নিয়মাবলী স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করিয়াও, আমরা ভগবানের দোহাই দিতে ভুলি না, বৈরাগ্যের বিচিত্র উপদেশগাথা বিস্মৃত হই না,—আর মরণের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীকে অসার জ্ঞান করি। সুতরাং ক্ষিতীশ যে অপরাধী, এ কথাই বা কেমন করিয়া বলি? তাহার পুত্রপরিবার, অন্নভাবে ক্লেশ পাইতেছে, সে জানিয়া শুনিয়াও মনকে প্রবোধ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে,—'যিনি জীব দিয়াছেন—তিনিই আহার যোগাইবেন'। আর মৃত্যু? সে ত আছেই! হয় রোগে ভুগিয়া, না হয় ফাঁসি-কাঠে, অথবা বিষপানে!

সে যাহা হউক, অর্থের অভাবে ক্ষিতীশচন্দ্র বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। পুত্রপরিবারের ভাবনা না ভাবিলেও, চন্দ্রার ভাবনা এখন তাহাকে নিত্য ভাবিতে হইতেছে। চাকরী বাক্‌রী নাই, নলিনী সময়ে অসময়ে সাহায্য করিত, তাহার সহিতও অসদ্ভাব হইয়াছে। চন্দ্রারও যাহা কিছু ছিল, তাহাও সে নিজের দখলে রাখিয়াছে। এখন চলে কি করিয়া? অল্পদিন হইল, এক জন অবস্থা-পন্ন বন্ধুকে চন্দ্রার বাড়ীতে লইয়া আসিয়া, তাহার সহিত আলাপ করাইয়া দিয়া, কিছু টাকা ধার করিবার মতলব করিয়াছিল; কিন্তু বন্ধুবর তাহারই কপালে 'তেঁতুল' গুলিবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিয়া, ক্ষিতীশচন্দ্র

সেই পর্য্যন্ত আর তাহাকে চন্দ্রার বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াইতে দিত না।

চন্দ্রা এখন কথায় কথায় বলে, "এরূপ কষ্টে আর কতদিন চলিবে? আমায় অনুমতি দাও, আমি আমার আত্মীয়স্বজনের নিকট ফিরিয়া যাই।"

ক্ষিতীশ চুপ করিয়া থাকে, চক্ষু দুইটী জলে ভরাইয়া ফেলে, কোনও উত্তর দেয় না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, সে এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিল। তাহার এক ডাক্তার বন্ধু ছিল; তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া, চন্দ্রাকে ধাত্রীবিদ্যা শিখাইয়া বাজারে জাহির করিবে, এইরূপ স্থির করিল।

ডাক্তার বাবু বেশ সৌখীন লোক—নাম অনঙ্গমোহন চৌধুরী। তাঁহার মনে মনে এইরূপ ধারণা যে, তাঁহার মত সুন্দরকান্তি পুরুষ ডাক্তারশ্রেণীর ভিতর আর কেহ নাই। চন্দ্রা পূর্ব্ব হইতেই অল্প অল্প ইংরেজী জানিত। অনঙ্গমোহন বাবু স্বয়ং শিক্ষক হইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই চন্দ্রাকে ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শিনী করিলেন, এবং ক্ষিতীশচন্দ্রকে উপদেশ দিলেন, "চাঁদমুখের সর্ব্বত্র জয়! চন্দ্রার ন্যায় সুন্দরী ধাত্রী বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। তুমি প্ল্যাকার্ড ও হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া, 'পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী,' বলিয়া চন্দ্রার নাম বাহির কর। আমি উহার পশ্চাতে থাকিয়া উহাকে তুলিয়া ধরিব। অর্থের অভাব অচিরে তোমার ঘুচিয়া যাইবে।"

অতঃপর কলিকাতার প্রত্যেক রাজপথে বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল,—"পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী শ্রীমতী চন্দ্রা

দেবী সর্ব্বসাধারণের সাহায্যের জন্য হাড়কাটা গলির—নং বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার রূপেরছটায় রোগী আরোগ্য হইবে, চিকিৎসা ত' দূরের কথা !!"

চন্দ্রা তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, জনমনোরঞ্জনকারিণী, প্রতিভারূপিণী রমণী। অতি অল্প দিনের মধ্যেই সে বেশ পশার জমাইয়া ফেলিল। ডাক্তার অনঙ্গমোহন তাহার প্রধান সহায়। তাঁহারই গাড়ীতে তাঁহারই পাশে বসিয়া সে রোগী দেখিতে যায়। যাহা কিছু রোজগার করে, ক্ষিতীশের হাতে আনিয়া দেয়; ক্ষিতীশ তাহাতেই সন্তুষ্ট বটে, কিন্তু প্রাণের শান্তি তাহার বিন্দুমাত্র নাই। চন্দ্রা অনঙ্গমোহনের সহিত যখন তখন বাহির হইয়া যায়, এক এক দিন গভীর রাত্রে ফিরিয়া আসে; জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয়, "রোগী দেখিতে গিয়াছিলাম" !

চন্দ্রা রোজগারী, ক্ষিতীশ বেকার,—সে অবস্থায় তাহার চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায় কি ? কিন্তু প্রাণে ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছে, হৃদয়ে প্রবল দাবানল জ্বলিয়াছে, বৃশ্চিক-দংশন অপেক্ষা অসহ্য যন্ত্রণা সে দিবারাত্র ভোগ করিতেছে।

এক দিন রাত্রি দশটার পর অনঙ্গমোহন আসিয়া চন্দ্রাকে বলিল,—"বেলেঘাটার এক জন পাটের মহাজনের স্ত্রীকে প্রসব করাইতে হইবে, সে ষোল টাকা ভিজিট দিবে; বিলম্ব করিও না, আমার গাড়ী প্রস্তুত।"

চন্দ্রা অনঙ্গমোহনের সহিত চলিয়া গেল। ক্ষিতীশ তখন তথায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু একটী কথাও কহে নাই। এইবার

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিয়া একখানি সেকেণ্ড্-ক্লাস্ গাড়ী ভাড়া করিল। ডাক্তার বাবুর গাড়ীর ঠিক পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে পারিলে পুরস্কার দিবে বলিয়া গাড়োয়ানকে প্রলোভন দেখাইল।

অনঙ্গমোহনের গাড়ী চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিতীশের গাড়ীও ছুটিয়াছে!

বেলেঘাটার পোল পার হইয়া, প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, অনঙ্গমোহনের গাড়ী একটী সুন্দর, সুরম্য, সুসজ্জিত উদ্যানবাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষিতীশচন্দ্রের গাড়ীও যথা-সময়ে আসিয়া বাগানের গেটের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাগানের মালী তখন ফটক বন্ধ করিতেছিল, ক্ষিতীশ ছুটিয়া গিয়া তাহার হাতে দুইটী টাকা দিয়া বলিল, "আমাকে একবার ভিতরে যাইতে দাও, উহাদের দুই জনের কি কথা হয়, আমি দূর হইতে শুনিব!"

টাকা দুইটী ট্যাঁকে গুঁজিয়া মালী বলিল, "আমার মুনিব—যিনি এই বাগানের মালিক—তিনি ওই ডাক্তার বাবুর বিশেষ বন্ধু। ডাক্তার বাবু আজ রাত্রের জন্য এই বাগান চাহিয়া লইয়াছেন। যদি চুপি চুপি দেখিয়া—সাবধানে কথাবার্ত্তা শুনিয়া চলিয়া যাইতে পার, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।"

ক্ষিতীশ সে প্রস্তাবে সম্মত হইল। তীব্র অন্ধকার ভেদ করিয়া, পদে পদে পদস্খলিত হইয়া, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরশব্দে ও ঝিল্লীরবে সচকিত হইয়া, নৈশ সহচর পেচকের বিকট ধ্বনিতে

চমকিত হইয়া, ক্ষিতীশ একটী সজ্জিত কক্ষের গবাক্ষের নিম্নে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। হরি! হরি! সে কি শুনিল? ডাক্তার অনঙ্গমোহন বলিতেছে, "ছি ছি চন্দ্রা! তুমি এমন রূপবতী, তুমি এমন গুণবতী, তুমি কি না ওই একটা মূর্খ হতভাগ্য গর্দ্দভের সহিত মিলিত হইয়া, আপনার সুযশ, সুনাম, সৌভাগ্য—সমস্তই ডুবাইতে বসিয়াছ? তুমি যদি আপনাকে চিনিতে পার, প্রতিমাসে তোমার পাঁচ শত টাকা ঘোচায় কে?"

চন্দ্রা বড় আদরে, বড়, সোহাগে বড় উল্লাসে অনঙ্গ-মোহনের বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, "ক্ষিতীশ আমার কে? তুমি যদি আমার হও, আমি আর কাহাকেও চাহি না। আমি তোমার রূপে মজিয়াছি। আমার আর উপায় নাই। আমি তোমার, আমায় পায়ে রাখিবে কি?"

কোটী বজ্র মস্তকে ধারণ করিয়া, মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া, ক্ষিতীশ দ্রুতপদে সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া, একেবারে গাড়ীতে আসিয়া বসিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "শীঘ্র আমায় পঁহুছাইয়া দাও, যাহা ভাড়া চাও, দিব।"

সংসার এই ভাবেই চলিতেছে। কুহকিনী-চরিত্র এই ভাবেই গঠিত! বুকের ভিতর বুক ঢাকা দিয়া রাখিলেও তাহারা কখনও আপনার হয় না,—এ কথা কে না জানে, কে না বোঝে? জানিয়া শুনিয়াও এ মোহে কে না মজে?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধে নলিনী এখন বাড়ীতেই বাস করিতেছে। তাহার আচরণে সকলের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, এইবার সে শোধরাইয়া গেল, আর কখনও কুপথগামী হইবে না। সে শিষ্ট শান্ত ছেলেটীর মত সময়ে খায়, সময়ে শোয়, বড় একটা বাড়ীর বাহির হয় না, বন্ধুবান্ধবদের আসা যাওয়াও একেবারে কম হইয়াছে; কারণ, নলিনী এখন মধুশূন্য। কিন্তু নলিনীর প্রাণে শান্তি নাই, তাহার জীবন শূন্যময়, মনের ভিতর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রবলবহ্নি রাবণের চিতার ন্যায় জ্বলিতেছে। যৌবনের উদ্দাম ও দুর্দ্দমনীয় স্রোতে গা ভাসান দিয়া মধ্যস্থলে আসিয়া, সে চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছে! সন্তরণের সাধ তাহার মেটে নাই, সে এখনও এপার ওপার হইতে পারে নাই! তরঙ্গের কোলাহল বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় তাহার কানে বাজিয়াছিল, এখন হঠাৎ ঢেউ থামিয়া গিয়াছে,—সে এমন একটা নীরবতার রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, যথায় কাহারও সাড়াশব্দ নাই, যথায় পাখী ডাকে না, চাঁদ ওঠে না, তারা ফোটে না,—কেবল মূর্ত্তিমতী নিশীথিনীর স্বপ্ন-সঙ্গিনীগণ মধ্যে মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ ঝুম্ ঝুম্ শব্দ করিয়া কানের ভিতর বেসুরা আওয়াজ ঢালিয়া দিয়া যায়।

এই গভীর নীরবতা নলিনীর আর ভাল লাগিতেছে না। নীরবতায় কি আনন্দ, কি অনির্ব্বচনীয় সুখ, কি মধুর অমৃতের

আস্বাদ, নলিনী তাহা আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই, তাই সে আবার কোলাহলময় জীবনস্রোতে ঝাঁপ দিবার জন্য হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। এ দিকে টাকার দারুণ অভাব! যাহা কিছু ছিল, সমস্তই উড়াইয়া দিয়াছে, এখন একরূপ কপর্দ্দকশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। টাকা—টাকা—টাকা—কি করিয়া টাকা পাওয়া যায়, এখন সেই চিন্তাই প্রবল হইল। চোখ কান বুজিয়া একদিন যামিনীভূষণের কাছে হাত পাতিয়া কিছু টাকা চাহিল। যামিনী-ভূষণ উত্তর দিলেন, "খাও দাও, বাড়ীতে থাক', টাকা কড়ির নাম মুখে আনিও না। বিশেষতঃ তোমার হাতে টাকা পড়িলেই আবার তুমি বিগড়াইয়া যাইবে।" সেই মুহূর্ত্তে নলিনীর মনে হইল, "এ জীবন আর রাখিব না, আত্মহত্যাই আমার মঙ্গল। পরপ্রত্যাশী, পরের অন্নদাস; স্ত্রীপুরুষের ভরণপোষণ পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে, নিজে সামর্থ্যহীন—তবে আর কেন? যবনিকা ফেলিয়া দিয়া অভিনয় শেষ করি।"

বহির্বাটীতে আসিয়া ভৃত্যের সাহায্যে আপনার আংটী বন্ধক দিয়া দশটী টাকা আনাইল। একটী টাকা ভৃত্যকে বখ্‌সিস্ করিয়া, এক বোতল ব্র্যাণ্ডী ও এক টাকার আফিম কিনিয়া আনিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল। পুরস্কার পাইয়া ভৃত্য তৎক্ষণাৎ ছুটিল,—এক বোতল ব্র্যাণ্ডী ও এক টাকার আফিম আনিয়া নলিনীর হাতে দিল। নলিনী দ্বার রুদ্ধ করিয়া, একেবারে এক কোয়াটার্ মদ ঢালিয়া, বিন্দুমাত্র জল অথবা সোডা না মিশাইয়া, সমস্তটা পান করিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্তমধ্যেই

নেশা মাথায় চড়িয়া গেল। পিতৃবিয়োগের দিন হইতে একে একে সমস্ত ঘটনা, অতীত জীবনের সমস্ত ইতিহাস, আগ্নেয় অক্ষরে তাহার স্মৃতিপটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নলিনী প্রাণের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিয়া বুঝিল, তাহার মরণে কাহারও কোনও ক্ষতি হইবে না, কাহারও কিছু যাইবে আসিবে না, সংসার যেমন চলিতেছে তেমনই চলিবে, যেরূপ চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছে, সৃষ্টির শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেইরূপই উঠিবে, কিন্তু বড় রকমের একটা চোট লাগিবে তাহার বৃদ্ধা মাতার প্রাণে,—আর বুকখানা চৌচির হইয়া ফাটিয়া যাইবে,—সেই অভাগিনী দুর্গার!

আশ্চর্য্য! নলিনী তাহার শিশুসন্তানের বিষয় একবারও ভাবিল না। অথবা কে জানে, সে ভাবনা বুঝি দুর্গার ভাবনার সহিত একত্রীভূত হইয়া, একেবারে পরমাণুর সহিত মিশাইয়া গিয়া—চিন্তাস্রোত দুই পথে ধাবিত হইতে দেয় নাই।

নলিনী আর এক গ্লাস্ মদ ঢালিল; আফিমের ডেলাটী ভাল করিয়া মদের সহিত মিশাইল; তাহার পর গলায় ঢালিবার জন্য কাচপাত্রটী শূন্যে তুলিল। কিন্তু ও কি—ও কি? সম্মুখে ও কাহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি? কে ওই নির্ব্বিকার পরমপুরুষ সস্নেহে, সস্মিতবদনে, করুণ-নয়নে, নলিনীর পানে চাহিয়া রহিয়াছেন? অনাবৃত দেহ, অনাবৃত পদযুগল,—কিন্তু দেহের দিব্য-সৌন্দর্য্যে মণিমাণিক্যের জ্যোতিঃ বিভাসিত! পদনখে শত শত কোকনদ প্রস্ফুটিত! হাসিয়া হাসিয়া, ঝলকে ঝলকে সুধা বর্ষণ করিয়া,

বীণাবিনিন্দিতস্বরে করুণাময় ও কি বলিতেছেন ?—"ভয় নাই আমি তোমাকে আশ্রয় দিব। আত্মহত্যা করিও না; কাপুরুষে আত্মহত্যা করে;—তুমি ভক্তবীর, তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। কিন্তু তোমার ভোগের এখনও শেষ হয় নাই, আর কিছুদিন তোমাকে ভুগিতে হইবে: পোড়্ না খাইলে, সোনা খাঁটী হয় না।" নলিনী মানসনয়নে স্পষ্ট দেখিল, ভগবান রামকৃষ্ণদেব তাহার সম্মুখে! তাহার মরা হইল না; সে উঠিয়া দাঁড়াইল, পদধূলি লইবার জন্য যুগলকর প্রসারিত করিল। কিন্তু কই, আর কিছু দেখিতে পাইল না! সব মিলাইয়া গিয়াছে; স্বর্গের সামগ্রী স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে; বিন্দুতে সিন্ধু মিশাইয়া গিয়াছে; কায়া ছায়ায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ নরদেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নলিনী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "প্রভু! আমি প্রেমহীন, জ্ঞানহীন, মমতাহীন। আমি তোমার পদে আশ্রয় পাইবার যোগ্য কি? আমার সহধর্ম্মিণী তোমার চরণ-পূজা ইহজীবনের সার করিয়াছে, দুর্ব্বলা রমণী—সে তোমাকে চিনিয়াছে, আমি অধম, আমি তোমাকে চিনিতে পারিলাম না। বুঝিলাম, এখনও আমার ভোগের শেষ হয় নাই। কতদিনে হইবে—কে জানে?"

অহিফেনমিশ্রিত হলাহলরূপী মদ্য নলিনী জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল। তারপর সে অঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

দুর্গা দুই তিনবার লোক পাঠাইয়া খবর দিল, ভাত কোলে

করিয়া সে বসিয়া আছে। কিন্তু ভৃত্য গিয়া সংবাদ দিল, 'বাবুর অসুখ—বাবু ঘুমাইতেছেন'। সেদিন দুর্গার উপবাসে কাটিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে নলিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার মনে হইল, সে যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে গিয়া পড়িয়াছিল! সে স্থান নরক অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর; তথায় আলো নাই, কেবল অন্ধকার! আশা নাই, কেবল নিরাশার তীব্র হুহুঙ্কার; তৃষ্ণার একফোঁটা জল নাই, কেবল নিরানন্দময় নীলশিখাপূর্ণ অনন্ত অগ্নিকুণ্ডের অভাবনীয় বিস্তার! বিকট-অবয়ব যমদূতেরা বিষ খাওয়াইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু এক মহা-মহিমময়, অলৌকিক শ্রী ও ধীসম্পন্ন, করুণার ও মমতার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি তাহাকে বাঁচাইয়া আনিয়াছেন, তাহার জীবনদান করিয়াছেন, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল গন্তব্যপথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

নলিনী অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার ভাবনাস্রোত আর এক পথে গিয়া পড়িল। এক মাড়োয়ারী জহুরী তাহার নিকট হইতে দেড় হাজার টাকা পাইবে, তাহাকে কাল সকালে আসিতে বলিয়াছে, টাকা না দিলে সে অপমান করিবে। কি উপায়ে টাকা সংগ্রহ হইবে? আপনার লোক এমন কে আছে যে, এ দুঃসময়ে তাহাকে অর্থসাহায্য করিয়া তাহার মানরক্ষা করে! নলিনী অনেক চিন্তা করিয়া দেখিল, এক দুর্গা ভিন্ন তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইবার, তাহার মুখ চাহিবার, তাহার মানরক্ষা করিবার আর কেহই নাই। কিন্তু দুর্গার আর ত' কিছুই নাই, এখন তাহার কাঁচের চুড়ী সার হইয়াছে। তবে কোথা

হইতে টাকা পাওয়া যায় ? অনেক ভাবিয়াও নলিনী কিছু কুল-কিনারা করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে আপনার শয়নকক্ষে গিয়া, সামান্য কিছু মুখে দিয়া, সে শুইয়া পড়িল। দুর্গা পদতলে বসিয়া সমস্ত রাত্রি ব্যজনে নিযুক্তা রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রে নলিনী ঘুমাইতে পারিল না। ভোর বেলা একবার চোখ দুইটী বুজিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে জাগিয়া উঠিল। মুখে কালিমার ছায়া, হৃদয়ে অশান্তি, অন্তরে অব্যক্ত বেদনা লইয়া, সে বহির্বাটীতে আসিয়া আপনার ঘরে চুপটী করিয়া বসিল। দেখিতে দেখিতে আটটা বাজিয়া গেল। নলিনীর মনে হইল, "সেই মাড়োয়ারী জহুরী এখনই টাকার তাগাদায় আসিবে। তাহাকে কি বলিব ? কি বলিয়া ফিরাইব ? সে যেরূপ প্রকৃতির লোক, আজ টাকা দিতে না পারিলে দাদার কাছে গিয়া অভিযোগ করিবে। দাদা হয় ত' এমন দুই একটা কথা শুনাইবেন, যাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না ; তখন জীবন-স্রোত হয় ত' আবার অন্য পথে গিয়া পড়িবে। নিজের জন্য কখনও ভাবি নাই ; এখনও ভাবিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু স্ত্রী পুত্র লইয়া দাঁড়াইব কোথায় ?"

হৃদয়-সাগর আলোড়িত করিয়া এইরূপ নানা চিন্তা-তরঙ্গ তুফান তুলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় সেই জহুরী আসিয়া উপস্থিত হইল; সেলাম করিয়া টাকা চাহিল। নলিনীর মুখ শুকাইয়া গেল; বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, ঋণ করিয়া পরিশোধ করিবার শক্তি যাহার না থাকে, সে হতভাগ্যের মৃত্যুই একমাত্র বন্ধু। নিতান্ত বিনীতভাবে সে আর দুই দিনের সময় চাহিল। এইবার মাড়োয়ারী মহাপ্রভু নিজমূর্ত্তি ধরিয়া, নাক মুখ ঘুরাইয়া আপনার ভাষায় বলিল, "আমি আর এক ঘণ্টাও অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নই। এই দণ্ডে টাকা না পাইলে, বড়বাবুর কাছে গিয়া নালিশ করিব। যাহার সামর্থ্য নাই, সে দেনা করিয়া নবাবী করে কেন?" নলিনীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে আত্মসম্বরণ করিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলমারী খুলিয়া একখানি পুরাতন চেকবহি বাহির করিল। দেড় হাজার টাকার একখানি চেক্ লিখিয়া, জহুরীর হাতে দিয়া কহিল, "কাল ভাঙ্গাইয়া লইও। আমি কালকের তারিখ দিয়া চেক্ দিতেছি।" জহুরী আর অপেক্ষা করিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল; যাইবার সময় বলিয়া গেল, "কাল ব্যাঙ্ক হইতে চেক্ ফেরত আসিলে, ফৌজদারী আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইব।"

সম্ভ্রম রক্ষা করিতে গিয়া নলিনী বিশেষ দুঃসাহসিকতার কার্য্য করিল। প্রায় ছয় মাস হইল, ব্যাঙ্কের সহিত তাহার এক প্রকার হিসাব-নিকাশ হইয়া গিয়াছে, কেবল পাঁচটী টাকা তথায়

পড়িয়া আছে। এ অবস্থায় দেড় হাজার টাকার চেক্ কাটিয়া দিয়া, সে নিজের বিপদ নিজে ডাকিয়া আনিল।

ভাবিব না মনে করিলে ভাবনা ছাড়িবে কেন? তাহার ত' একটা আশ্রয় চাই! নচেৎ তাহার অস্তিত্ব বজায় থাকে কি করিয়া?

নলিনী যত ভাবনার হাত এড়াইতে চাহে, নূতন নূতন ভাবনা আসিয়া তাহাকে ততই জড়াইয়া ধরে। মাড়োয়ারী জহুরী চলিয়া যাইবার পর সে ভাবিতে লাগিল, 'এখন উপায় কি? ক্ষণিক অপমান হইতে আত্মরক্ষার জন্য একটা বিরাট অমঙ্গল ডাকিয়া আনিলাম! ব্যাঙ্কে কিছুই নাই, হাতেও কিছু নাই, টাকা সংগ্রহেরও পন্থা দেখিতেছি না। এ অবস্থায় পুলিস-কেস্ অনিবার্য্য! ঘোরতর দুরবস্থায় পড়িয়া একরূপ মাথা গুঁজিয়া দাদার আশ্রয়ে ছিলাম, এইবার গাছতলা ভিন্ন আর উপায় দেখিতেছি না। এমন দিন গিয়াছে, অমন কত দেড় হাজার টাকা মুক্তহস্তে দান করিয়াছি, আজ সেই আমি—!' নলিনীর চোখে জল আসিল।

পাপীর অশ্রু প্রবল অনুতাপ ব্যতীত নিবারিত হয় না। নলিনীর অনুতাপের দিন এখনও আসে নাই, তাই চোখের জল তাহাকে ছাড়িতেছে না।

বহুদিন পরে নলিনীর এক পুরাতন বন্ধু—নাম ফটিকচাঁদ পাকড়াসী—নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হইল। ফটিক উকীলের বাড়ী কাজ করে, বয়স ত্রিশের মধ্যে, বেশ

চালাক চট্‌পটে, সর্ব্বদাই হাসিমুখ, সহস্র কুকথা বলিয়াও কেহ কখনও তাহাকে চটাইতে পারে নাই। ফটিককে দেখিয়া নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে ফটিক, এতদিন পরে কি মনে ক'রে ?" ফটিক চির-অভ্যস্ত হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "আর ভাই—তুমি এখন ভাল ছেলে—বাড়ীতে থাক—আমরা সবচিন্ লোক, পাছে লোকে মনে করে, আবার তোমায় কুপথে লইয়া যাইতে আসিয়াছি, সেই ভয়ে এ দিক মাড়াই না।"

নলিনী। তবে হঠাৎ আজ এ অনুগ্রহ কেন ?

ফটিক। তোমার বাড়ীর সামনে আজ একটা চালওয়ালার দোকান শীল করিতে আসিয়াছিলাম, তাই একবার পুরাতন বন্ধুকে দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। রোদে চাঁদী ফেটে গেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে ; একটা বিয়ার খাওয়াও না ভাই !

নলিনী হাসিয়া বলিল, "বিয়ারের লোভে বুঝি এখানে পদার্পণ হয়েছে ?"

ফটিক। তা যাই বল ভাই, আমার তাতে আপত্তি নাই। তোমার ঢের খেয়েছি ! এক বোতল বিয়ারের দাম তো আট গণ্ডা পয়সা ! আরো কি জান'—আমরা উকীলের বাড়ীর লোক, স্বার্থ ভিন্ন বড় একটা চলি না !

নলিনী দুই বোতল বিয়ার আনাইল। ফটিক গেলাসের অপেক্ষা না করিয়া, একটী বোতল একেবারে গলায় ঢালিয়া দিল। নলিনীও লোভ সংবরণ করিতে পারিল না, অল্প-বিস্তর

পান করিল। মাতাল স্বর্ণমুদ্রার থলি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু মদ পাইলে আট্‌কাইয়া পড়িবেই পড়িবে! এইবার নলিনীর চিন্তাকুলিত চিত্তে অল্পমাত্রায় স্ফূর্ত্তি দেখা দিল। নলিনী বলিল, "ফটিক! আমি না বুঝিয়া একটা কাজ করিয়া যারপরনাই বিপদে পড়িয়াছি। অভিমানে আকুল হইয়া, আত্মসম্মান রক্ষা করিতে গিয়া এখন মাথার শিয়রে জেল রাখিয়া বসিয়াছি। তোমার মাথায় অনেক ফন্দি খেলে, তুমি যদি ভাই একটা উপায় ঠাওরাইয়া দিতে পারো, তাহা হইলে চিরজীবন তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব।—আরও জানিও, মানুষের চিরদিন সমান যায় না;—আজ দুর্দ্দিন পড়িয়াছে বলিয়া দুই দিন পরে যে সুদিন না আসিবে, এমন কোনও কথা নাই। সে সময় আমার কর্ত্তব্য আমি করিব।" ফটিক উত্তর করিল, "ব্যাপারটা আমায় সব খুলিয়া বল; আমি উকীলের বাড়ী কাজ করি বলিয়া, আমাকে শয়তান মনে করিও না। তোমার আমি ঢের খাইয়াছি। আমার দ্বারা যদি তোমার কোনও কাজ হয়, আমি যথাসাধ্য স্বার্থ ত্যাগ করিয়া তোমার উপকার করিতে প্রস্তুত আছি।"

নলিনী সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল।—বিবরণ শুনিয়া ফটিক ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, ছোট ছোট চক্ষু দুইটা বড় জোরে বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "সর্ব্বনাশ! করিয়াছ কি?—ব্যাঙ্কে টাকা নাই, অথচ চেক্ দিয়াছ?—চেক refuse হইয়া আসিলে যে, criminal caseএ পড়িবে। চারি দিকে বদ্‌নাম!

নিজেরও খুব বিপদ! শেষে মেটামিটী না হইলে যে অব্যর্থ জেল!”

নলিনী। তা' ত বুঝিয়াছি, এখন উপায় কি?

ফটিক। উপায় আর কি! যেমন করিয়া পারো, আজকের মধ্যে টাকার যোগাড় কর। কাল বেলা দশটার মধ্যে টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইবেই। চেক present করিবার পূর্ব্বে—

নলিনী বাধা দিয়া বলিল, “অত কথা কেন আমাকে বলিতেছ? আমি সমস্তই জানি—সমস্তই বুঝি! কিন্তু টাকার জোগাড় আমার দ্বারা কোনও মতেই সম্ভব নহে। আমার সকল কথাই ত' তুমি জানো!”

ফটিক। দাদাকে বিপদের কথা জানাইয়া টাকা চাও।

নলিনী। তিনি দিবেন না।

ফটিক। অবশ্য দিবেন। তুমি কি বলিতে চাও, তিনি চোখের উপর দেখিবেন,—ভাই জেলে যাইবে?

নলিনী। তর্কের প্রয়োজন নাই। দাদার কাছ থেকে কোনও মতেই টাকা সংগ্রহ হইবে না।

ফটিক। ভাল—মা'কে সত্য ঘটনা বলিতে বাধা কি? তিনি তোমার বিপদ শুনিয়া কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

নলিনী। আমি জানি—তাঁর হাতে টাকা নাই। কেন মিছে এ সকল কথা শুনাইয়া তাঁহাকে ভাবাইব?

ফটিক। বেশ—পরিবারের গহনা বাঁধা দাও।

এইবার নলিনী চুপ করিল,—অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে—(শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া) দেখিতে দেখিতে বড় বড় দুই ফোঁটা চোখের জল তাহার গণ্ডস্থলের উপর গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল, "ফটিক! নোয়া গাছটী ছাড়া তার আর সমস্ত গহনাই এ পিশাচ ইতিপূর্ব্বেই অপহরণ করিয়াছে। এখন সেই গাছি ঘুচিলেই সে অভাগিনীও নিশ্চিন্ত হয়, আমিও নিশ্চিন্ত হই!"

ফটিকের প্রাণটার ভিতর কাঁদিয়া উঠিল,—তার আর সে দিন আফিস যাওয়া হইল না। যে কোনও পন্থায় হ'ক—সে টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবে বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইল।—কিন্তু সামান্য টাকা নহে—দেড় হাজার টাকা—কেমন করিয়া—কোথা হইতে জোগাড় হয়? নিজের বিপদ মনে করিয়া ফটিক ভাবিতে বসিল।

ফটিক স্বার্থপর বটে, আপনার গণ্ডা বেশ ভাল বুঝিত বটে, কিন্তু লোকটা একেবারে প্রাণশূন্য পিশাচমূর্ত্তি ছিল না। অনেক অবস্থাপন্ন ভদ্রবেশধারী ভদ্রসন্তান অপেক্ষা সে হৃদয়বান ছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ফটিক বলিল, "এক উপায় আছে। কিন্তু সেও আর একটা জুয়াচুরী। কিন্তু উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, তাহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই!"

নলিনী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "বল—বল, কি উপায়? যেমন করিয়া পারো, এ যাত্রা আমায় উদ্ধার কর!"

ফটিক কহিল, "আমার এক জহুরীর সহিত আলাপ আছে।

সে তোমাকে বিশেষরূপ চেনে। তোমার ভিতরের অবস্থা যাহাই হউক, বাজারে এখনও তুমি সান্‌সা কাপ্তেন বলিয়া পরিচিত। আমি এখনি তাহার কাছে যাইতেছি। কতকগুলি জড়োয়া গহনা লইয়া তাহাকে এখানে আসিতে বলি। তুমি বাছিয়া গুছিয়া হাজার পাঁচেক টাকার জিনিস রাখিয়া দিয়া একখানা বিল সই করিয়া দাও। পরে ঐ জহরৎ অন্য এক জায়গায় বন্ধক দিয়া দেড় হাজার টাকা সংগ্রহ করা যাক্। তোমার কিছু লোকসান হইবে বটে, কিন্তু আমি এ অবস্থায় আর অন্য উপায় দেখি না।"

নলিনী আর চিন্তা করিবার সময় পাইল না, বলিল, "লোকসান হয় হোক, আপাততঃ পুলিস-কেস হইতে উদ্ধার পাইব ত'! তুমি যাও ভাই, আর বিলম্ব করিও না। আমি আশাপথ চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।"

ফটিক চলিয়া গেল। নলিনী স্নান আহার সারিয়া প্রস্তুত হইয়া আপনার বৈঠকখানায় আসিয়া আশা-আশঙ্কায় উদ্বেলিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

যথাসময়ে এক বৃদ্ধ জহুরীকে সঙ্গে লইয়া ফটিক পুনরায় নলিনীর নিকট উপস্থিত হইল। জহুরীর নাম করমচাঁদ,—পাকা ব্যবসাদার—আদবকায়দা বিশেষরূপ দোরস্ত। কথায় কথায় সেলাম, কথায় কথায় 'আপকা তাঁবেদার হ্যায়' ইত্যাদি ইত্যাদি বিনয়পূর্ণ বচনপ্রয়োগে করমচাঁদ চির-অভ্যস্ত। ফটিক বেশ ধূমধামের সহিত নলিনীর পরিচয় প্রদান করিল। করমচাঁদ

একে একে অনেকগুলি জহরতের অলঙ্কার নলিনীকে দেখাইল। সে এক ছড়া সাতনর, এক জোড়া হীরার বালা, একটী নেকলেস্ ও কয়েকটী আংটী নির্ব্বাচিত করিল। মোটের উপর দাম হইল, পাঁচ হাজার ছয় শত পঁয়ত্রিশ টাকা। বিল সই করাইয়া লইয়া, পুনঃপুনঃ সেলাম করিয়া, বৃদ্ধ করমচাঁদ বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় কেবলমাত্র বলিয়া গেল,—"বিলের টাকাটা আমার দুই মাসের মধ্যে চাই। লাভ অতি সামান্যই রাখিয়াছি, সুতরাং বেশী দিন টাকা ফেলিয়া রাখিলে আমাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।"

তৎক্ষণাৎ একখানা গাড়ী ডাকাইয়া, উক্ত জহরৎ বন্ধক দিয়া টাকা জোগাড় করিবার জন্য ফটিক ও নলিনী বাহির হইয়া গেল।

বাগবাজারের হরদয়াল নামে এক সুদখোর ব্রাহ্মণের সহিত ফটিকের আলাপ ছিল। সে গহনা বন্দক রাখিয়া টাকা ধার দিত, এবং শতকরা মাসিক দুই টাকা হিসাবে সুদ লইত। নলিনীকে লইয়া ফটিক তথায় উপস্থিত হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। হরদয়াল সবেমাত্র গায়ত্রী-জপ শেষ করিয়া দপ্তরখানায় আসিয়া বসিয়াছেন; ফটিক নলিনীর পরিচয় করাইয়া দিল। হরদয়াল সসম্ভ্রমে নলিনীকে আহ্বান করিয়া বসাইলেন। তার পর কাজের কথা আরম্ভ হইল। হরদয়াল জহরৎগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, "মালে বড় ঠেক্‌চে না! জহুরী বেটা বেশ দু পয়সা লাভ ক'রে গেছে!

মোট কত দাম নিয়েচে ?" ফটিক উত্তর করিল "প্রায় ছয় হাজার টাকা।" হরদয়াল হো হো করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "বেশ কাপ্তেন পেয়েছে যা হোক! দু হাজার টাকা হ'তে বাই জন্মে যায়! সে যা হোক, আমার কাছে স্পষ্ট কথা! আমি আঠার শো টাকার উপর একটী পয়সাও দিতে পারিব না। আর আমার সুদের হার ফটিক বাবু ত' সমস্তই জানেন! তবে লেখাপড়ায় একটা কথা থাকবে যে, দুমাসের মধ্যে খালাস করতে না পারলে সব জিনিস আমার হ'য়ে যাবে।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া নলিনীকে সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। হরদয়াল বড় পাকা লোক ছিলেন; যে প্রকার দলীলই হউক, তাহার লেখাপড়ার জন্য তিনি কখন উকীলের বাড়ী যাইতেন না। অনেক উকীলের তিনি কাণ কাটিয়া ছাড়িয়া দিতেন। তিনি বাক্সের ভিতর হইতে একখানা আট আনার ষ্ট্যাম্প কাগজ বাহির করিয়া বেশ মুন্‌সিয়ানার সহিত একটী লেখাপড়া প্রস্তুত করিলেন। নলিনী সেই দলীলে দস্তখত করিয়া, আঠার শত টাকা লইয়া, হরদয়ালকে প্রাতঃ-প্রণাম করিয়া উঠিয়া আসিল। সাক্ষিরূপে ফটিককেও সই করিতে হইল।

নলিনী ও ফটিক চলিয়া আসিবার পর, পক্বকেশ হরদয়াল আর একবার জহরৎগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাঁহার মুখে বড় হাসি দেখা যাইত না,—কিন্তু আজ তিনি একটু হাসিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, 'দাঁওটা

আজ হইল মন্দ নয়! কাপ্তেনের জিনিস—আর বড় খালাস করিতে হইবে না!'

হরদয়াল জহরৎ বিশেষরূপ চিনিতেন,—তথাপি মনের সন্দেহ মিটাইবার জন্য কাল আহারাদির পর একবার বড়বাজারে গিয়া জহরৎগুলি যাচাইয়া আসিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন।

এই সূত্রে নলিনীর যে বিপদ উপস্থিত হইল, তাহা ভাবিলেও বুক শুকাইয়া যায়। মহাজনের বাক্য, সোজা পথের চেয়ে আর পথ নাই। সোজা পথ ছাড়িয়া যে বাঁকা পথ ধরিতে যায়, তাহার পরিণাম চিরদিনই ভয়াবহ! নলিনীর অবস্থাও ঠিক সেইরূপই হইল! সে হাতের সামান্য একটী ফোস্‌কা তুলিতে গিয়া, সর্ব্বাঙ্গে আগুন ধরাইল ফেলিল। মানুষ সব বোঝে, সব জানে, কিন্তু কালের কুটিলচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া কয় জনে সোজা পথে চলিতে পারে?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা দশটার মধ্যে নলিনী ফটিককে সঙ্গে লইয়া ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবার জন্য বাহির হইল। কিছু কম আঠার শত টাকা নলিনীর সঙ্গে ছিল,—ফটিকের পরামর্শে সে ষোলশ' টাকা জমা দিল, বাকী টাকা হাতে রাখিল। এইবার যেন সে

হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। আনন্দ ও উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া নলিনী ফটিককে বলিল, "ফটিক! তুমি আজ আমার যে উপকার করিলে, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমার স্মরণ থাকিবে। তুমি বুদ্ধি করিয়া টাকার যোগাড় না করিয়া দিলে, আমার পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হইত, তাহা ভাবিলেও বুক কাঁপিয়া উঠে। চল,—'পেলিটীর' হোটেলে গিয়া তোমাকে খানা খাওয়াইয়া আনি।" ফটিক একগাল হাসি হাসিয়া কহিল—"এ প্রস্তাবে খুব রাজী আছি ভাই! তবে খানা হজম করিতে হইলে দু একটা পেগের প্রয়োজন।" একখানা ফীটন ভাড়া করিয়া দুই জনে 'পেলেটীর' হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইল। খানসামা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একটা ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া বসাইল। নলিনী হুকুম করিল, "পেগ্ লেয়াও!" খানসামা দুইটী কাচপাত্র ভরিয়া হলাহলরূপিণী সুরা আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে পাত্র দুইটী শূন্য হইয়া গেল। আবার হুকুম, আবার পেগ আসিল! নেশা অল্প চড়িল,—আবার পেগ আসিল! একবার নয়—দুইবার নয়—তিনবার!

অর্থের অপব্যয় করা যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের স্বভাবের বৈচিত্র্য এই যে, আজ একটা টাকার অভাবে কষ্টের সীমা পরিসীমা নাই, আবার কাল কিছু টাকা হাতে পড়িলে যতক্ষণ না তাহা খরচ হইয়া যায়, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। এ শিক্ষা নলিনীর চরিত্র-পাঠে পাঠকবর্গ অবগত হইতেছেন।

এইবার ফটিকের জঠরানল প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল। সে

খানসামাকে ডাকিয়া খানা আনিবার আদেশ দিল। অতঃপর উভয়ে আহারে প্রবৃত্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে এক এক 'সিপ্' ব্র্যাণ্ডীও চলিতে লাগিল। নলিনী ও ফটিক ভরপুর নেশায় বিভোর হইয়া, খানা খাইতে খাইতে প্রাণের কথা আরম্ভ করিল। ফটিক বলিল, "নলিনী! জীবনে অনেক মেয়েমানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়াছ, সত্য বল দেখি, কাহাকে বেশী ভাল-বাসিয়াছ?" নলিনী উত্তর দিল, "তোমার নিকট মিথ্যা বলিব না, যদি কাহাকেও প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া থাকি, তবে সে একমাত্র নিরুপমাকে। আমার মনে মনে স্থির বিশ্বাস ছিল, এজন্মে তাহার সহিত কখনও ছাড়াছাড়ি হইবে না। সেও বলিত, আমাকে ছাড়িলে সে বাঁচিবে না; আমারও ধারণা ছিল, সে চলিয়া গেলে জীবনভার বহন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে। কেমন করিয়া—কোথা দিয়া—কি হইয়া গেল, কিছুই বুঝিলাম না। সত্য বলিতে কি, প্রথম প্রথম আমার মনে হইয়াছিল যে, বুঝি বুক ফাটিয়া মরিয়া যাইব। কিন্তু যে করিয়া সে আঘাত সামলাইয়াছি, তাহা আর তোমাকে কি বলিব?" কথা শেষ করিয়া পাত্রাবশিষ্ট সুরাটুকু নলিনী পান করিয়া ফেলিল। ফটিক আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আর তাহাকে তোমার দেখিতে ইচ্ছা হয় না?"

নলিনী। খুব ইচ্ছা হয়। এক এক সময় মনে হয়, লজ্জা সম্ভ্রম পদদলিত করিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া খানিক কাঁদিয়া আসি। কিন্তু কেমন বাধ-বাধ ঠেকে। মনে হয়, একদিন যে আমার সর্ব্বস্ব ছিল, সে হয় ত' অপরের হইয়াছে।

হয় ত' গিয়া দেখিব, আর কাহারও সহিত বসিয়া সে আমোদের ফোয়ারা ছুটাইতেছে। এ চোট বুকে বেজায় লাগিবে। সে ঘা সহ্য করিতে পারিব কি না সন্দেহ!

ফটিক। চল, আজ একবার তার বাড়ী যাওয়া যাক্! সে এখনও তোমায় ভালবাসে কি না—এখনও তোমায় চাহে কি না, আমি ভাব দেখিয়া ঠিক বলিয়া দিব।

নলিনী। আপত্তি নাই, কিন্তু যদি অপমানিত হই?

ফটিক। তুমি কি পাগল হইয়া গিয়াছ? নিরুপমা তোমাকে অপমান করিবে? আমি তাহার জন্য দায়ী রহিলাম। তুমি যাইতে কুণ্ঠিত হইও না।

নলিনীর প্রাণটা ছুটিয়াছে, অনেকদিনের পর নিরুপমার নাম শুনিয়া তাহার মদিরামোহ-দীপ্ত হৃদয় উধাও হইয়া চলিয়াছে। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। একটু সুপ্ মুখে দিয়াই উঠিয়া পড়িল। খানসামাকে ডাকিয়া, বিল চুকাইয়া দিয়া, তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া, ফটিককে সঙ্গে লইয়া ফীটনে চড়িয়া নিরুপমার বাটীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

সুরার একটী আশ্চর্য্য মহিমা এই যে, প্রাণের ষোল আনা টান থাকিলেও, লজ্জাবশতই হউক, অথবা সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই হউক, কিম্বা কোন রূপ বাধা বিপত্তির নিমিত্তই হউক, সাদা অবস্থায় যে স্থানে, যাহার নিকটে, মানুষ যাইতে চাহে না, বা পারে না, মদিরামধুপানোন্মত্ত ব্যক্তি অনায়াসে, অসঙ্কোচে, দ্বিধাশূন্য, বিচার-শূন্য ও বিবেকশূন্য হইয়া সেইখানে তাহার কাছে ছুটিয়া যায়!

নিরুপমার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিলে, ফটিক প্রথমে গিয়া নিরুপমাকে খবর দিল যে, নলিনী তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। নিরুপমা আগ্রহের সহিত সদর-দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। ফটিক গাড়ীর কাছে গিয়া নলিনীকে ডাকিয়া আনিল! অনেক দিনের পর দেখা! সেই নিরুপমা—সেই নলিনী—সেই পূর্ব্ব প্রেম—সেই পূর্ব্বস্মৃতি—উভয়ের মানসপটে আগ্নেয়-অক্ষরে অঙ্কিত হইতে লাগিল। নলিনী দেখিল, সকল বিষয়েই নিরুপমার বেশ একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; পূর্ব্বে বেশ-ভূষার পারিপাট্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, কিন্তু এখন সাজগোজের ঘটা কিছু বেশী। কপালের টিপ্‌টি পর্য্যন্ত এমন একটু সৌখীন ভাবে আঁটা, যাহা দেখিলে স্বতঃই মনে হয়, যেন সংসার ওলট পালট করিবার জন্য নিরুপমা বদ্ধপরিকর হইয়াছে!

আর এক বোতল ব্র্যাণ্ডী আসিল। বহুকাল পরে আবার নলিনী ও নিরুপমা একত্র পান করিতে বসিল। ফটিক বলিল, "আমায় একবার আফিস যাইতেই হইবে। একদম্ কামাই হইলে মনিব ভয়ানক চটিয়া যাইবে। আমায় একটা পেগ্ দাও, আমি এইবার চলি।" নলিনী আপত্তি করিল না। ফটিক খুব বেশী করিয়া খানিকটা ব্র্যাণ্ডী ঢালিয়া লইয়া এক চোঁচায় পান করিয়া, নলিনীকে নিরুপমার হাতে সঁপিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বিদায় গ্রহণ করিল।

এইবার পুরাতন প্রেম ঝালাইবার পালা আরম্ভ হইল!

নলিনী অনেক কথা বলিল, অনেক প্রেমের কাহিনী জানাইল, কত ব্যথা—কত সোহাগ—কত অনুরাগ—প্রাণ খুলিয়া ঢালিয়া দিল, কিন্তু নিরুপমার এমন একটু আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব, এমন একটু স্বভাবে অভাব, এমন একটু উদাস—অলস—অসংযত ভাষার প্রয়োগ লক্ষিত হইল, যাহাতে নলিনী প্রাণে প্রাণে বেশ অনুভব করিল, এ নিরুপমা আর সে নিরুপমা নহে, অত কাছে থাকিয়াও যে মনে করিত—সে অনেক তফাতে রহিয়াছে, সে আজ এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, সহস্র চেষ্টা করিলেও আর তাহাকে নিকটে আনা যাইবে না। যাহাকে বুকের ভিতর বুক ঢাকা দিয়া রাখিয়াও তৃপ্তিলাভ হইত না, এখন সে কেমন করিয়া এতটা পর হইয়া গেল ?

নলিনী আর এক পাত্র সুরা পান করিয়াই ঢলিয়া বিছানার উপর অচেতন হইয়া শুইয়া পড়িল।

এ দিকে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত চতুর হরদয়াল আহারান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে, ছাতাটী মাথায় দিয়া, জহরৎগুলি সঙ্গে লইয়া যাচাইবার জন্য বড়বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে করমচাঁদ নামক জহুরীর নিকট হইতে নলিনী জহরৎগুলি লইয়াছিল, সেই বৃদ্ধের সহিত হরদয়ালের বহুদিন হইতে আলাপ পরিচয় ছিল। হরদয়াল করমচাঁদের দোকানে আসিয়া, একে একে জহরৎগুলি দেখাইলেন, এবং তাহার মূল্য কত হইতে পারে, তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। করমচাঁদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আপনি এ সকল কোথায় পাইলেন ?" হরদয়াল উত্তর

করিলেন, "স্বর্গীয় অবনী বাবুর পুত্র নলিনীভূষণ এই সকল জহরৎ বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ লইয়াছে।" করমচাঁদ আর কোনও কথা না বলিয়া, দেওয়াল হইতে পাগ্‌ড়ী পাড়িয়া লইয়া মাথায় দিয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। হরদয়াল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ধীরপদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

করমচাঁদ বরাবর পুলিস-আদালতে গিয়া তাহার উকীলের সহিত সাক্ষাৎ করিল। জহরৎ-ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত উকীলকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাতে ফৌজদারী হইতে পারে কি না?" উকীল পরামর্শ দিলেন, "তুমি যে জহরৎগুলি বিক্রয় করিয়া বিল সই করাইয়া লইয়াছ, এ কথাটি তোমায় গোপন করিতে হইবে। তুমি গিয়া পুলিসে খবর দাও যে, অমুক তোমার নিকট হইতে জহরতের সামগ্রী লইয়া যাচাইয়া দাম ঠিক করিবেন বলিয়া, অমুক যায়গায় সেই সকল জিনিস বন্ধক দিয়াছেন। তাহা হইলেই Police Cognisable case হইবে।"

করমচাঁদ আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া থানায় গিয়া ঐ মর্ম্মে ইন্‌স্পেক্টরের নিকট নালিশ রুজু করিল। ইন্‌স্পেক্টার বড় জমাদারকে ডাকিয়া এক জন পাহারাওয়ালাকে সঙ্গে দিয়া বলিয়া দিলেন, "বাগবাজারে গিয়া হরদয়াল বাবুর নিকট অনুসন্ধান কর, নলিনী বাবু তাঁহার নিকট জহরৎ বন্ধক রাখিয়াছেন কি না? যদি এ কথা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে নলিনী বাবুর নিকট গিয়া খোঁজ লও, তিনি এই ব্যক্তির নিকট হইতে সেই সকল জহরৎ লইয়াছিলেন কি না? এবং তাহার মুল্য বাবদ কিছু টাকা

দিয়াছিলেন কি না ? যদি এই জহুরীর কথা সত্য হয়, এরূপ বুঝ, তাহা হইলে নলিনী বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া আইস।” বেশ বড় রকম দাঁও হইতে পারে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, জমাদার সাহেব গোঁপে তা দিতে দিতে বেশপরিবর্ত্তন করিয়া এক জন পাহারাওয়ালা সঙ্গে লইয়া গন্তব্য স্থানে চলিল। করম-চাঁদও অনুগামী হইল।

হরদয়াল পুলিসের নিকট সমস্ত জহরৎগুলি বাহির করিয়া অকপটে স্বীকার করিলেন, নলিনী এই সকল জিনিস বন্ধক দিয়া তাহার নিকট হইতে আঠার শত টাকা ধার লইয়া গিয়াছে। এইবার জমাদার সাহেব বিশেষ উৎসাহের সহিত নলিনীর মস্তক ভক্ষণ করিবার জন্য দ্রুতপদে কাণপুরী জুতা মস্‌মস্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

ও দিকে সন্ধ্যার পরই নলিনীর নেশা কাটিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিয়া দেখিল, তাহার পাশে শুইয়া নিরুপমা তখনও নিদ্রা যাইতেছে।

নলিনীর মনে হইল, সে কোথায় আসিয়াছে ? এ স্থান অপেক্ষা নরক আর কি ভয়ঙ্কর স্থান ? নিরুপমার শয্যা—সঙ্গ—গৃহ—দেহ—পুরীষ অপেক্ষাও পঙ্কিল ও কলুষিত বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। এরূপ পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া হইল ? কেন হইল ? যাহার অঙ্গের সৌরভ একদিন পারিজাতের সুগন্ধকে পরাজিত করিত, যাহার নিমীলিত নেত্র দুইটীর পানে চাহিয়া নলিনী আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া যাইত, যাহার যুগ্ম ভ্রূ, কমনীয়

কপোল, অনিন্দনীয় ও অতুলনীয় জ্ঞানে জীবন-প্রবাহের রূপান্তর হইয়াছিল, সেই নিরুপমাকে এইরূপ ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিয়াই পলাইয়া আসিবার জন্য নলিনীর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সে চুপি চুপি উঠিয়া দাঁড়াইল, চুপি চুপি জামাটী গায়ে দিল, জুতাটী পায়ে পরিল, চুপি চুপি দরজাটী খুলিয়া চোরের ন্যায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সভয়ে, সসঙ্কোচে, সলজ্জে নিজবাটীর দেউড়ীতে প্রবেশ করিতে গিয়াই নলিনী দেখিল, জমাদার ও পাহারাওয়ালা সঙ্গে লইয়া জহুরী করমচাঁদ তথায় অপেক্ষা করিতেছে। করমচাঁদ নলিনীকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "এই সেই লোক।" জমাদার সাহেব গুরুগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন আরম্ভ করিল, "আপনার নাম নলিনীবাবু ?"

নলিনী। হাঁ।

জমাদার। এই জহুরী করমচাঁদ বাবুকে আপনি চেনেন ?

নলিনী। চিনি।

জমাদার। ইঁহার নিকট হইতে আপনি কতকগুলি জহরৎ লইয়াছিলেন ?

নলিনী। লইয়াছিলাম।

জমাদার। তাহার দরুণ কিছু টাকা দিয়াছিলেন কি ?

নলিনী। না।

জমাদার। সে সকল জহরৎ আপনি বাগবাজারের হরদয়াল বাবুর নিকট বন্ধক দিয়াছেন ?

নলিনী। হাঁ,—দিয়াছি।

জমাদার। আমার কসুর লইবেন না, আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হইলাম।

নলিনী। আমার অপরাধ ?

জমাদার। থানায় চলুন, সে কথা ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু বুঝাইয়া দিবেন। আপনি ভদ্রলোক, আপনাকে বেইজ্জৎ করিব না ; একখানা গাড়ী ভাড়া করুন,—পথে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি না।

নলিনী মনে মনে বলিল, "এই আমার উপযুক্ত শিক্ষা ! বার বার পাপপথে পদার্পণ করিয়াও যাহার চৈতন্য হইল না, জেলে গিয়া চোর ডাকাতের সহিত বাস করাই তাহার পক্ষে বিধেয় !"

একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া নলিনী, করমচাঁদ, জমাদার ও পাহারাওয়ালা থানার দিকে চলিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রার পাপ-অভিনয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাণের আগুনে পুড়িতে পুড়িতে ক্ষিতীশ বাসায় ফিরিয়া আসিল। তাহার মনে হইল, যাহা দেখিলাম, তাহা স্বপ্ন না সত্য ? চন্দ্রা কলঙ্কিনী ! চন্দ্রা ব্যভিচারিণী ! চন্দ্রা পরপুরুষের প্রেম-অনুরাগিণী ! না—না, এও কি সম্ভব ? নিশ্চয়—আমি ভুল দেখিয়াছি।

আবার ভাবিল, "আমি কি মূর্খ ! চোখে দেখিয়া, হাতে

হাতে ধরিয়া, এখনও সন্দেহ করিতেছি—চন্দ্রা দোষী কি নির্দ্দোষ ? মানুষ যখন রূপের ফাঁস গলায় জড়ায়, তখন এমনই করিয়াই মরে ; আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলে। আমার অবস্থাও ঠিক তাই। কি কুক্ষণে চন্দ্রাকে দেখিয়াছিলাম, কি কুক্ষণে তাহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম, কি কুক্ষণে তাহাকে জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়াছিলাম ! এতদিনে বুঝিলাম, দুনিয়ায় সবই ফক্কিকার ! এ সংসারে মানুষ তবে কেন আসে ? কেন থাকে ? কোন্ সুখে, কিসের প্রত্যাশায়, ভাঙ্গা হাটে ব্যাসাত করিবার জন্য ছুটাছুটী করিয়া মরে ?” তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্ষিতীশ কি ভাবিতে লাগিল। প্রথমে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে বালকের ন্যায় আকুল হইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, ললাট কুঞ্চিত হইল, শিরায় শিরায় ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া প্রতিহিংসার প্রবল বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে উন্মাদের ন্যায় ঘরের ভিতর এধার ওধার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আপন মনে বলিল—“যার মোহে মজিয়া সতী সাবিত্রী স্ত্রীর মুখ চাহি নাই, ঔরসজাত পুত্র কন্যাদের অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়াছি, সমাজের চক্ষে আত্মীয় স্বজনের চক্ষে একটা ঘৃণ্য পশুরও অধম হইয়া রহিয়াছি, সেই যখন আমার বুকে ছুরী দিয়াছে, হৃদয়ে রাবণের চিতা জ্বালাইয়াছে, তখন আর তার উপর আমার কিসের মায়া, কিসের মমতা ? আমি যদি তাহাকে লেখা পড়া না শিখাইতাম, ধাত্রী না করিতাম, পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ

পরিচয় করাইয়া না দিতাম, তাহা হইলে এত দিনে তাহাকে বাজারে বাহির হইয়া ঘর ভাড়া করিতে হইত। আর ডাক্তার অনঙ্গমোহন কি ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক! এত মাখামাখি, এত বন্ধুত্ব, তাহার এই পরিণাম! কেন,—সুন্দরী নারী খুঁজিলে কি আর মিলিত না? পৃথিবীতে চন্দ্রাই কি একমাত্র রূপবতী? প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! যদি যথার্থ ব্রাহ্মণসন্তান হই, এ দাগার প্রতিদান না দিয়া কোনও মতে ক্ষান্ত হইব না।" বেড়াইয়া বেড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া এইবার ক্ষিতীশ মাটীর উপর বসিয়া পড়িল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। স্তিমিত আলোকের ছায়া গৃহমধ্যে প্রেতের ন্যায় নৃত্য করিতেছিল। রাজপথ নিস্তব্ধ; বাটীর দাস দাসী নিদ্রায় আচ্ছন্ন; কোথাও কোনরূপ সাড়া নাই, শব্দ নাই; যেন গভীর নীরবতা দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ক্ষিতীশকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছিল। তাহার ভয় হইল, সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। একটা বিকট দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল, "উঃ"! এমন সময় চন্দ্রার গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। ক্ষিতীশ তাড়াতাড়ি শয্যায় গিয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল। চন্দ্রা ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করিল; ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে বেশপরিবর্ত্তন করিল; ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে ক্ষিতীশের গাত্র স্পর্শ করিয়া ডাকিল। ক্ষিতীশ উঠিয়া বসিল। গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রি কত?" চন্দ্রা উত্তর দিল, "কেন, ঘরে কি ঘড়ি নাই?"

ক্ষিতীশ। ঘড়ি আছে বই কি! ঘড়ি দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি—রাত্রি কত?

চন্দ্রা। যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহাতে আমাদের রাত্রিই বা কি, আর দিনই বা কি?

ক্ষিতীশ। ঠিক; আমারই ভুল হইয়াছে। কত টাকা রোজগার করিয়া আনিলে?

চন্দ্রা। যা দিবার কথা হইয়াছিল, তা অপেক্ষা ঢের বেশী পাইয়াছি। আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহারা এক শত টাকা দিয়াছেন।

ক্ষিতীশ। কই, টাকা দেখি?

চন্দ্রা। আজ এতটা অবিশ্বাস কেন? এই দেখ।

এই বলিয়া দশখানি দশ টাকার নোট ক্ষিতীশের হাতে গুঁজিয়া দিল। ক্ষিতীশের মনে হইল, নোটগুলা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু নানা কারণে মনের রাগ মনেই মারিতে হইল।

চন্দ্রা বলিল, "তোমার খাবার যে এখনও ঢাকা রহিয়াছে দেখিতেছি! তুমি এখনও খাও নাই?"

ক্ষিতীশ আর সহ্য করিতে পারিল না, কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "চন্দ্রা! আত্মীয়তা দেখাইতে তোমার লজ্জা করিতেছে না? তুমি কি মনে কর, কলিকাল বলিয়া ধর্ম্ম একেবারে লোপ পাইয়াছে? আমিও ধর্ম্মত্যাগী হতভাগ্য বটে, আমিও যে সাজা পাইব না, বা পাইতেছি না, এমন কথা বলি না। কিন্তু

তোমারও শীঘ্র এমন দিন আসিবে, যে দিন তুমি যন্ত্রণায় আকুল হইয়া প্রাণের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিবে ; এমন দিন আসিবে, যে দিন তুমি অন্তরে অন্তরে বুঝিবে, এ জন্মের প্রায়শ্চিত্ত এ জন্মেই হয়,—পরজন্মের অপেক্ষা করিতে হয় না ! সংসার মরুভূমি হইলেও, প্রাণঢালা ভালবাসার একটা মূল্য আছে।” চন্দ্রা মনে মনে একটু ভীতা, বিচলিতা, সঙ্কুচিতা হইল। কিন্তু বঙ্গ-মহিলার মত সে আর অন্ধকারে নাই ; শিক্ষিতা হইয়াছে ; আলোক পাইয়াছে ; সে বুঝিল, ক্ষিতীশ হয় ত’ কোনও সূত্রে অদ্যকার ঘটনার আভাস পাইয়াছে ; এ অবস্থায় সে যদি সাহস হারাইয়া ফেলে, তবে তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সে বেশ করিয়া বুকে বল বাঁধিল, গোলগাল মুখখানি একটু নাড়িয়া চাড়িয়া, মদিরাময় চক্ষু দুইটীতে কৃত্রিম ক্রোধের আবেশ আনিয়া ক্ষিতীশকে বলিল, “তুমি অত কথা কহিতেছ কেন ? আমার প্রতি তোমার সন্দেহ হয়, আমায় ত্যাগ কর। তুমি তোমার ব্রহ্মতেজে পৃথিবী ভস্ম করিতে পার, কিন্তু আমার অদৃষ্ট কাড়িয়া লইতে পারিবে না !”

চন্দ্রার কথা কয়টী শব্দভেদী বাণের মত ক্ষিতীশের বুকে গিয়া বাজিল, সে আর মুখ বন্ধ করিত পারিল না, ভাবের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিল ;—বলিল, “তুমি কি সেই চন্দ্রা ? আমার মুখপানে চাহিয়া কথা কহিতে যাহার সাহস হইত না, আমার আদেশ যে বেদ-বাক্য বলিয়া প্রতিপালন করিত, আমার সামান্য ইঙ্গিতে যে জীবন বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইত না, তুমি কি সেই চন্দ্রা ? বেশ

বুঝিয়া দেখ, আমিও কি তোমার জন্য কিছুই করি নাই? যে দিন তুমি মাতৃহীনা হও, যে সময় তোমার আপনার বলিতে এত বড় সংসারে একটী প্রাণীও ছিল না, নিরাশ্রয় সহায়সম্বলহীন হইয়া যে মুহূর্ত্তে তুমি আমার মুখের পানে কাতরদৃষ্টিতে তাকাইয়াছিলে, আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া, সংসার সমাজ সম্ভ্রম সমস্ত ভাসাইয়া দিয়া, বড় আশায় তোমায় আপনার করিয়া বুকে তুলিয়া লইয়াছিলাম। তাহার কি এই প্রতিদান? একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব—সত্য উত্তর দিবে?"

চন্দ্রা। মিথ্যা বলিয়া বিশেষ কিছু লাভ হইবে কি?

ক্ষিতীশ। এক হাতে আমার পায়ে হাত দাও—আর এক হাতে আমার পৈতা ছোঁও!

চন্দ্রা তাহাই করিল। এইবার ক্ষিতীশ বলিল, "আজ তুমি কোথায় গিয়াছিলে? কাহার সহিত দেখা করিয়াছিলে? কি কথা কহিয়াছিলে?"

চন্দ্রা স্থির বুঝিল, যে উপায়েই হউক, ক্ষিতীশ সব জানিতে পারিয়াছে। অনেক বিজ্ঞ দার্শনিক অপেক্ষা পুরুষচরিত্র চন্দ্রা ভালরূপ বুঝিত। পুরুষ গরম হইলে—স্ত্রীলোককে একদম্ নরম হইতে নাই, এ শিক্ষা চন্দ্রা আপনা-আপনিই পাইয়াছিল। এইবার সে নিজমূর্ত্তি ধরিল; ক্ষিতীশের পা ছাড়িয়া দিল, পৈতা ত্যাগ করিল, সুর চড়াইয়া তীব্র ভাষায় উত্তর দিল, "যে আমার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া এরূপভাবে আমায় শপথ করাইতে চাহে, আমি তাহার সহিত কোনওরূপ সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা

করি না। মেয়েমানুষ যদি অবিশ্বাসিনী হইতে চায়, সিন্দুকের ভিতর তালা আঁটিয়া রাখিলেও, তাহাকে কেহ আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে না। আমায় ক্ষমা কর, ওরূপ নীচ প্রসঙ্গ লইয়া তোমার সহিত বাদানুবাদ করিতে আমি প্রস্তুত নহি।”

শেষ কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রা দ্রুতপদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্য ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। ক্ষিতীশ বজ্রাহত তরুর ন্যায় নীরব ও নিঃস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একবার তাহার মনে হইল, “চন্দ্রাকে ত্যাগ করিয়া জীবনধারণ করা কি আমার পক্ষে অসম্ভব? যে আমাকে চাহে না, আমার সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইবার জন্য যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কৃতজ্ঞতার ছায়ামাত্র যাহার প্রাণে নাই, সেই অবিশ্বাসিনীকে পরিত্যাগ করা কি এতই দুরূহ? বুক ফাটিয়া মরিতে হয় মরিব, তথাপি চন্দ্রার আর মুখদর্শন করিব না, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কিন্তু সে যে অন্যের অনুরাগিনী হইয়া তাহাকে প্রেম বিলাইবে, হাসিয়া হাসিয়া তাহার বুকে মাথা রাখিয়া অজস্র সোহাগ ঢালিয়া দিবে, এ দৃশ্য আমি দেখিতে পারিব না! চন্দ্রার বুকে ছুরী বসাইব, তাহার রক্ত চুম্বন করিয়া বিকট প্রেমাভিনয়ের যবনিকা ফেলিব।”

পাপীর সঙ্কল্প কোনও কালেই স্থির থাকে না, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হয়। ক্ষিতীশের দশাও তদ্রূপ হইল। চন্দ্রার হত্যা কল্পনা করিতে গিয়া তাহার প্রাণের ভিতর একটা আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, “ভাল—তাহার

বুকে না হয় ছুরী বসাইলাম, কিন্তু চন্দ্রা যে মরিবে, তাহার স্থিরতা কি ? এমন ত' শুনিয়াছি যে, অনেকে ছুরীর আঘাত পাইয়াও আবার আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছে ! যদি তাই হয়,—যদি চন্দ্রা বাঁচিয়া যায় ! তাহা হইলে তাহার সুখ ভোগের পথ তো রুদ্ধ হইল না ? তাহার পর আমার পরিণাম কি ? পুলিসে ধরিবে, হাতে হাতকড়ি দিবে, শেষে ফাঁসির হুকুম হইবে ! না—না, খুনে কাজ নাই, চন্দ্রা সুখে থাকুক, দুঃখে থাকুক, আমার তাহাতে কিছু যায় আসে না, আমি আবার গিয়া সংসারী হইব !"

আল্‌গা মনটাকে অনেক করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "মন ! আমি ত' চন্দ্রাকে ত্যাগ করিব, তুমি স্থির থাকিতে পারিবে ত' ?" নির্লজ্জ মন উত্তর দিল, "তুমি পাগল ! যদি চন্দ্রাকে ছাড়িতে চাও, আগে আমায় ছাড়। আমি তোমায় ছাড়িতে পারি, কিন্তু চন্দ্রাতে যে আমি মিশাইয়া গিয়াছি।"

ক্ষিতীশ পরাজয় স্বীকার করিল; দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল, 'চন্দ্রা !' কোনও উত্তর নাই। আবার ডাকিল, "চন্দ্রা ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। আর তোমার উপর কখনও অবিশ্বাস করিব না। তুমি নির্দ্দয় হইলে আমি আত্মহত্যা করিব।" চন্দ্রা লজ্জানম্র নববধূর মত ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। ক্ষিতীশের হাত দুইটী ধরিয়া, কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া, মৌনমুগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল, "ক্ষিতীশ, আমি তোমারই !"

অতঃপর উভয়ে আহারাদি করিয়া শয়ন করিল।

রাত্রিজাগরণের ক্লেশ চন্দ্রা অকাতরে সহ্য করিতে পারিত। পরদিন বেলা আটটা বাজিতে না বাজিতে সে মুখ হাত ধুইয়া, চুল শুকাইবার জন্য বারাণ্ডায় আসিয়া চিক তুলিয়া রোদ লাগাইতে লাগিল। এমন সময় একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, গাড়ীর ঝিলিমিলির ভিতর দিয়া দুইটী ব্যাকুল চক্ষু যেন তাহার দিকে তাকাইয়া আছে; কে আসিয়াছে, কোথা হইতে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে, খবর লইবার জন্য এক জন চাকরাণীকে নীচে পাঠাইয়া দিল। চাকরাণী আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবুর পরিবার বাবুর সহিত দেখা করিবার জন্য আসিয়াছে।" ক্ষিতীশ তখনও ঘুমাইতেছিল, চন্দ্রা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া বলিল, "তোমার স্ত্রী তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। ছিঃ—ছিঃ! একবারও বাড়ী যাও না, দেখ দেখি—ব্রাহ্মণের মেয়ে এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন!" ক্ষিতীশ অন্নপূর্ণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোনও মতেই সম্মত হইল না। চন্দ্রা বারবার বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিল, কিন্তু ক্ষিতীশ অচল, অটল! চন্দ্রা বিরক্ত হইয়া কহিল, "তুমি মানুষ হইয়া জন্মিয়াছিলে কেন? কাল রাত্রে তুমি না বলিতেছিলে, সংসার মরুভূমি হইলেও যথার্থ ভালবাসার একটা মূল্য আছে! এই যদি তোমার ভালবাসা হয়, তবে তাহার মূল্য একটী কাণাকড়িও নহে। নিজের গৃহলক্ষ্মীকে যে উপেক্ষা করে, নিজের স্ত্রীকে

যে ভালবাসিতে জানে না, নিজের ঘর সংসারের উপর যাহার মায়া নাই, সে পরকে কেমন করিয়া যত্ন করিবে, পরকে কেমন করিয়া ভালবাসিবে, পরের উপর কেমন করিয়া তাহার মায়া হইবে ?" আর কোনও কথা না কহিয়া অবজ্ঞার তীব্র কটাক্ষে ক্ষিতীশকে জর্জ্জরিত করিয়া, চন্দ্রা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গাড়ীর ভিতর গিয়া অন্নপূর্ণার সহিত সাক্ষাৎ করিল। অন্নপূর্ণা বলিল, "তুমি কে, আমি বুঝিয়াছি। আমি তোমার সহিত দেখা করিতে আসি নাই। যদি দয়া করিয়া একবার আমার স্বামীকে আমার কাছে পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট উপকার করা হইবে। আমি নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত বলিয়াই এখান পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি। তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে জানিলে আমি কখনই আসিতাম না।" অন্নপূর্ণার শ্লেষ-পূর্ণ গর্ব্বিত বচন শুনিয়া চন্দ্রার মনে একটু রাগ হইল. কিন্তু সে বুদ্ধিমতী, তৎক্ষণাৎ মনকে বুঝাইল, অন্নপূর্ণার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ, তাহাতে তাহার উপর রাগ করিবার চন্দ্রার কোনও অধিকার নাই। অন্নপূর্ণা স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, পতিপ্রেমবঞ্চিতা, দুঃখিনী ব্রাহ্মণনন্দিনী, কিন্তু তথাপি সে "সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধনে"র অধিকারিণী। তাহার তুলনায় চন্দ্রা কত ক্ষুদ্র—কত নগণ্য, কত তুচ্ছ !

মনের সহিত কথা কহিয়া চন্দ্রা বেশ বুঝিল, অপরাধ তাহারই। সে অন্যের সামগ্রী জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছে, পতিপ্রাণা সাধ্বীর বুকে শেল মারিয়া তাহাকে চিরজন্মের মত

অনাথা করিয়াছে, সোনার সংসারে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। ছি! ছি! কোন্ মুখ লইয়া সে অন্নপূর্ণার উপর রাগ করিতে যায়?

মমতায় বিগলিত হইয়া চন্দ্রা অন্নপূর্ণাকে বলিল, "দিদি! আমি ইচ্ছা করিয়া এই পোড়ার মুখ তোমাকে দেখাইতে আসি নাই। তোমার দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু আমার সৌভাগ্য—যে, তুমি আমার দরজায় আসিয়াছ। তোমার স্বামী তোমার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক নহেন। তুমি বিশ্বাস করিবে কি না, জানি না; আমি অনেক জেদ করিয়াও তাঁহাকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিতে পারিলাম না। তুমি নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলে পাছে মনে কর, আমি অন্তরায় হইয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দিলাম না, সেই জন্য আমি নিজে তোমার কাছে আসিলাম। যদি দয়া করিয়া একবার বাড়ীর ভিতর আইস, আমি চরিতার্থ হইব।" অন্নপূর্ণা উত্তর করিল, "তোমার ভদ্রতায় আমি মুগ্ধ। তোমার বিষয় আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তোমার আচরণে ঠিক তার বিপরীত দেখিলাম। কিন্তু ভগিনী! ক্ষমা করিও, আমার সব গিয়াছে বটে, কিন্তু বংশের সম্ভ্রম ও নারীর অভিমান এখনও দূর হয় নাই। যে কারণেই হউক, বাড়ীর ভিতর আমি যাইতে পারিব না। আমি স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আর আমার সে ইচ্ছা নাই। তিনি যখন আমার সহিত দেখা করা দরকার বিবেচনা করেন না, আমিই বা কেন তাঁহাকে আর কষ্ট দিব? তবে একটা কথা তাঁহাকে বলিও, তিনি আমায় পায়ে ঠেলুন, অনাদর করুন, দূর করিয়া দিন, তবু

তিনি আমার দেবতা। তিনি আমায় ফেলিতে পারেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে কখনও ফেলিতে পারিব না। কারণ, আমাদের সম্বন্ধ কেবল ইহকালের নয়, পরকালেও তিনি আমার সর্ব্বস্ব। আমার কাঁচের চুড়ি সার হইয়াছে বটে, তথাপি কখনও তাঁহাকে অর্থাভাব জানাই নাই, শাক ভাত খাওয়াইয়া পুত্র কন্যা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এবার যে বিপদে পড়িয়াছি, তাহা তাঁহাকে না জানাইলে নয়। বড় মেয়েটীর বার বৎসর অতিক্রম হইবার উপক্রম হইয়াছে, আর বিবাহ না দিলে কুলে কালী পড়িবে। এ ব্যবস্থা আমার দ্বারা হইতে পারে না। তাঁহার কন্যা, তিনি সত্বর একটা উপায় করুন। তারপর আমি অনাহারে মরিলেও আর কখনও তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসিব না। আমরা বামুনের মেয়ে, উপবাস করিয়া মরিতে জানি।" বলিতে বলিতে অন্নপূর্ণা আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিধাতার বিচিত্র মহিমা! অন্নপূর্ণার বেদনায় ব্যথিত হইয়া চন্দ্রাও কাঁদিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দিদি! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও। আমিও বামুনের ঘরের মেয়ে। অতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলাম, স্বামী কি, তাহা জানি নাই। তাহার পর নানারূপ প্রলোভনে পড়িয়া নিজের চরিত্র বিসর্জ্জন দিয়াছি বটে, কিন্তু রমণী-প্রাণের কোমলতা, মমতা, দয়া, মায়া সমস্তই অক্ষুণ্ণ আছে। আমি শপথ করিতেছি, প্রতিদিন তোমার স্বামীকে বাড়ীতে পাঠাইব। আমার বিশ্বাস, তিনি আমার অনুরোধ

ঠেলিতে পারিবেন না; কারণ, তিনি এখন আমা-অন্ত-প্রাণ। যদি তিনি আমার অনুরোধ না রাখেন, তাঁহার সহিত আর আমার কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না। আরও বলিতেছি, যদি তোমার স্বামী তাঁহার কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে না করেন, আমার অনেক ভদ্র পরিবারের সহিত আলাপ আছে, অনেক ভদ্র-মহিলা আমায় কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন, আমি যেমন করিয়া পারি, তোমাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিব। আমি ঘৃণিতা হইলেও আমার প্রস্তাব উপেক্ষা করিও না। কন্যাদায়ে, পিতৃদায়ে, মাতৃদায়ে লোকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া থাকে। এস দিদি! বেলা হইল, আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।" অন্নপূর্ণা কৃতজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিল, "ভগিনী! তুমি সুখী হও।" চন্দ্রা ভক্তিভরে অন্নপূর্ণার পদধূলি গ্রহণ করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া আসিল। অন্নপূর্ণা বিদায় গ্রহণ করিল।

চন্দ্রা উপরে আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, ক্ষিতীশ আবার ঘুমাইতেছে। সে তাহাকে উঠাইল, কোনরূপ গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া ক্ষিতীশকে স্পষ্ট বলিল, "যদি আমাকে চাও, আমার কথা তোমাকে শুনিতে হইবে। প্রতিদিন একবার করিয়া তোমাকে বাড়ী যাইতে হইবে। তোমার বড় মেয়ে বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, সে বিষয়ে তুমি আর উদাসীন থাকিতে পারিবে না। আর এই লও পঞ্চাশ টাকা; প্রয়োজনমত চাউল, ডাউল, অন্যান্য সাংসারিক সামগ্রী এখনই কিনিয়া লইয়া স্ত্রীর কাছে

পঁহুছাইয়া দাও। মানুষ হও, পুরুষত্ব ফিরাইয়া আন; ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া জীবনের কর্ত্তব্য বজায় করিবার চেষ্টা কর।”

ক্ষিতীশ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া চন্দ্রার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পাঠক বলিয়া দিতে পার, চন্দ্রার ন্যায় রমণীর চরিত্রের এ কিরূপ বৈচিত্র্য? চন্দ্রা ব্যভিচারিণী—কলঙ্কিনী, কিন্তু তথাপি তাহার প্রাণে এ কোমলতা, এ উদারতা, এ মহত্ত্ব, কোথা হইতে আসিল? কে আনিয়া দিল? এ অস্বাভাবিক আচরণ কি কেবল স্ত্রীলোকেই সম্ভব?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যামিনীভূষণের একমাত্র পুত্র, বংশের মুখোজ্জ্বলকারী সজনী-কান্ত কিরূপ ‘লায়েক’ হইয়া উঠিয়াছে, হাটে মাঠে ঘাটে পথে কিরূপ ‘কাপ্তেন’ নাম জাহির করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট আভাস আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাঠকবর্গকে দিয়াছি। বারাঙ্গনাকুল, মোসাহেববৃন্দ, হ্যাণ্ডনোটের দালালগণ, বাঙ্গাল মহাজন, সকলে আকুলনয়নে লোলুপদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। যামিনীভূষণ ভবধাম হইতে একবার মহাপ্রস্থান করিলেই তাহাদের সকলেরই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়!

কিন্তু যামিনীভূষণ গ্রহবৈগুণ্যে এখনও পৃথিবীতে বিচরণ

করিতেছেন বলিয়া কি সজনীর ইয়ারকী, কাপ্তেনী-স্ফূর্ত্তিতে কোনও বাধা পড়িতেছে? তোষামোদকারীর অভাব নাই, রক্ষিতা বারবনিতার শীর্ণদেহ স্বর্ণ অলঙ্কারে রীতিমত ভূষিত হইয়াছে, রকম বেরকমের জুড়ী ও গাড়ী হাঁকান হইতেছে, প্রতিদিন দস্তুরমত ব্র্যাণ্ডীপানও চলিতেছে। যামিনীভূষণ দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে অলক্ষ্যে এক একটী হতাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। সে নিঃশ্বাসে কেবল তাঁহারই ধন মান ও যশের পতাকা চঞ্চল হইতেছে, অপরের কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

সজনীর বাঁধা মেয়েমানুষের নাম—হীরাবাই। পৃথক একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া, চাকর দরোয়ান দাসী ইত্যাদি রাখিয়া, ঘর দ্বার উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া, সজনী তথায় রীতিমত সংসার পাতিয়াছে। নিজের বাটীর সহিত সজনীর সম্পর্ক অতি অল্প,—নাই বলিলেও চলে। প্রাতঃকালে বেলা আটটার সময় তথায় যায়। প্রথম প্রথম বেলা দ্বিপ্রহরে দশ পনর মিনিটের জন্য একবার দুটী ভাত খাইতে এবং পিতামাতাকে কৃতার্থ করিতে বাড়ী আসিত, কিন্তু আজকাল তাহাও বন্ধ হইয়াছে। সজনীর মাতা পাচক ব্রাহ্মণের দ্বারা অন্নব্যঞ্জনাদি সমস্ত একটী থালে সাজাইয়া হীরাবাইয়ের আবাসে প্রত্যহ পাঠাইয়া দেন। সমস্ত দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া সজনী কোনও কোনও দিন রাত্রি তিনটা কিংবা চারিটার সময় বাড়ী আসে; কোনও দিন একেবারেই পদার্পণ করে না। তবে,—না আসার ভাগটাই বেশী।

সজনীর সহচরবৃন্দ দিবারাত্রি মধুচক্রে ভ্রমরকুলের ন্যায় হীরাবাইয়ের মন্দিরে বিরাজমান। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত' ভদ্রঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার চাল চলন দেখিলে ভদ্রসন্তান বলিয়া মনে হয় না! বিকালে সজনী বৃহৎ ল্যাণ্ডো জুতিয়া বামে হীরাবাইকে বসাইয়া, সম্মুখে ও কোচবাক্সে মোসাহেবগণকে লইয়া চিৎপুর রোড দিয়া হাওয়া খাইতে যায়! যামিনীভূষণের খুব মুখ উজ্জ্বল হয়!

নিরুপমার সহিত নলিনীর আলাপ পরিচয় হইবার পূর্ব্বে, সজনী মধ্যে মধ্যে রঙ্গালয়ে গিয়া নিরুপমার অভিনয় দেখিয়া আসিত। সেই সময় হইতে তাহার সহিত পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা সজনীর মনে বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তখন সজনীর বয়সও তত পরিপক্ক হয় নাই, এবং নিরুপমাও নলিনীর সহিত অন্য পথে গিয়া পড়িল, সেরূপ অবস্থায় সজনীর মনের সাধ মনে উঠিয়াই অতৃপ্ত রহিয়া গিয়াছিল। যতদিন নিরুপমা নলিনীর সহিত বাগানে বাস করিত, সজনী প্রতিদিন তাহার সংবাদের জন্য চর প্রেরণ করিত। কেবল তাহাই নহে, প্রতি মুহূর্ত্তে সুযোগ অন্বেষণ করিয়া অপেক্ষা করিত, কবে নিষ্ঠুর খুল্লতাতের কবল হইতে নিরুপমা সুন্দরী অব্যাহতি পায়!

যথাসময়ে নিরুপমার সহিত নলিনীর সম্বন্ধ বিচ্যুত হইবার কথা সজনীর কানে উঠিল। সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যার-পরনাই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তার আর এক দায়

উপস্থিত। বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া, নানারূপ পরীক্ষার মধ্যে গিয়া, বড় সাধ করিয়া হীরাবাইকে লইয়া সে সম্প্রতি সংসার পাতিয়াছে। কেমন করিয়া তাহাকে বরখাস্ত করিয়া তাহার স্থানে নিরুপমাকে আনিয়া বাহাল করে! নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিল।

মাসে মাসে সজনীকান্ত হীরার বাড়ীতে এক একটা বড় রকমের ভোজের আয়োজন করিত! বিস্তর গাইয়ে বাজিয়ে আসিত, চুনিয়া চুনিয়া সোনাগাছি, রূপাগাছি, মেছুয়াবাজার হইতে গায়িকাগণের আমদানী হইত, মদের ফোয়ারা উঠিত। মাতালের চীৎকারে, বারাঙ্গনাগণের অশ্লীল সঙ্গীতে, পাড়ার ভদ্রলোকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত! তাকিয়া ছিঁড়িত, বিছানা পুড়িত, চিম্‌নী ভাঙ্গিত, হাত পা কাটিত, মাথা ফাটিত, দু'শ রগড় হইত!

একদিন এইরূপ বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়া সজনীকান্ত নিরুপমার নিকট লোক পাঠাইল; বলিয়া দিল, "যত টাকা চায় দিব; এক রাত্রি এখানে আসিয়া গান বাজনা করিতে হইবে।" অর্থের লোভ বড় লোভ! বিশেষ নিরুপমা এখন বেকার বসিয়া আছে, রোজগারপাতি কিছুই নাই! আরও, এ নিরুপমা আর সে নিরুপমা নাই, সে এখন অর্থ চিনিয়াছে। মা ও মেয়ে দু জনেই ভাবিল, 'মন্দ কি? ফাঁকতালে একরাত্রে কিছু আদায় হয়, তা হোক না কেন!' নিরুপমা হীরাবাইয়ের বাড়ীতে—সেই রাত্রে মজলিসে আসিয়া যোগদান করিল।

নাচ, গান, বাজনা সন্ধ্যা হইতেই আরম্ভ হইয়াছে, সকলেই মধুপানে উন্মত্ত, শশার চাট্‌নি, গরম গরম কাটলেট ও চপ দেদার কাবার হইতেছে, মধ্যে মধ্যে বহুকণ্ঠমিশ্রিত পৈশাচিক অট্টহাসে গৃহভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। সজনীকান্ত নিরুপমাকে লইয়া মহা ব্যস্ত। মোসাহেবগণ অপর সকলকে সুরা বিতরণ করিতেছে, সজনী অতিযত্নপূর্ব্বক নিরুপমা ও হীরাবাইকে নিজে গ্লাসে ঢালিয়া পান করাইতেছিল। সহচর-বৃন্দের মধ্যে রামলাল নামে সজনীকান্তের এক জন অত্যন্ত অনুগত পার্শ্বচর ছিল। সে দিবারাত্রি সজনীর পাশে পাশে থাকিত। রামলাল কখন বাড়ী যায়, কোথায় থাকে, কি করে, তাহা কাহারও গোচর ছিল না। সে সর্ব্বদাই ফিট্ বাবুটি সাজিয়া থাকিত। তাহার সাজ গোজও কেমন এক অদ্ভুত রকমের! পরিধানে দেশী চারি আঙ্গুল চওড়া কোঁচান ধুতি, তাহার উপর সেক্সপিয়ার-কলারওলা শার্ট, নেকটাই; তদুপরি নীল রংএর এক আলপাকার কোর্ট;—চোখে গিল্টি করা সোনার চশমা! রামলালের গুণের মধ্যে খুব রগড়ের কথা কহিতে পারিত, লোককে মজার কথা হাসির গল্প বলিয়া বেশ হাসাইতে পারিত। একা এক বোতল হুইস্কী অথবা ব্র্যাণ্ডী পান করিয়াও কখনও মাতাল হইত না। মজলিসে সকলকে সুরা বিতরণ করা তাহার প্রধান কাজ। গান বাজনা নিজে কিছুই জানিত না; তবে সুশ্রাব্যই হউক, অথবা অশ্রাব্যই হউক—রমণীর কণ্ঠস্বর শুনিলেই সে একেবারে পাগল হইয়া যাইত।

রামলাল যে শুধু সজনীকান্তের মনস্তুষ্টি করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ তাহার নিকট অবস্থান করে, তাহা নহে। সে হীরা-বাইয়ের রূপে মুগ্ধ, হীরাবাইকে একদণ্ড না দেখিলে সে সংসার অন্ধকার দেখে, হীরাবাইকে পাইবার জন্য সে ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে সঙ্কুচিত নহে। কিন্তু সময়, সুযোগ ও স্থান অভাবে সে 'কাদায় গুন' পাতিয়া বসিয়া আছে। হীরাবাই এ কথা জানিত, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিত না, অথবা রামলালকে কোন প্রকার বিরক্তির ভাব দেখাইত না। বরং বঁড়শীতে মাছ গাঁথিয়া লোকে যেমন তাহাকে লইয়া খেলায়, হীরাবাই রাম-লালকে লইয়া সেইরূপ খেলাইত। রামলাল বুঝিয়াছিল, হীরাবাই তাহাকে একটু পেয়ার করে। বারবনিতাগণের স্বভাবই এই; ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই।

সে রাত্রে সজনীকান্তের মজলিসে খুব আমোদ প্রমোদ চলিল। রাত্রি দুইটার পর সজনী অন্যান্য স্ত্রীলোক ও নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবদিগকে আহারাদি করাইয়া যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়া বিদায় করিল। নিরুপমাও যাইবার জন্য জেদ ধরিল। সজনী বলিল, "তুমি এর মধ্যে যাইবে কি বল? গোলমালে আমরা তোমার কিছুই খাতির করিতে পারিলাম না! এইবার এস,—কয় জনে মিলিয়া একটু আনন্দ করা যাক্।" হীরাবাইও নিরুপমাকে ধরিয়া বসিল, কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল না। অগত্যা নিরুপমাকে আরও কিছুক্ষণ থাকিতে হইল।

নিরুপমা ও হীরাবাইকে লইয়া মোসাহেব-পরিবেষ্টিত সজনী বোতল খুলিয়া আবার আমোদ করিতে বসিল।

মনে মনে কি একটা মতলব আঁটিয়া সে নিরুপমা ও হীরাবাইকে উপর্য্যুপরি সুরা পান করাইতে লাগিল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কাহারও নেশা ধরিতেছে না, দু'জনের মধ্যে কেহই অচেতন হইয়া শুইয়া পড়িতেছে না! মেয়েমানুষে এত মদ হজম করিতেছে কি করিয়া! এইবার সজনী দুইটী গ্লাসে মদ ঢালিয়া অলক্ষ্যে সিগারেটের ছাই মিশাইয়া, নিরুপমা ও হীরাবাইকে সেবন করাইল। এই প্রকার সুরা দুই একবার পান করিয়াই নেশায় বিভোর হইয়া উভয়েই ঢালা বিছানায় ঢলিয়া পড়িল। এইবার সজনীকান্তের মহা সুযোগ! সে চুপি চুপি মোসাহেবগণকে পাশের ঘরে গিয়া বসিতে বলিল। প্রভুর আদেশ শুনিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়াই তাহারা সকলে অন্য ঘরে গিয়া বোতল খুলিয়া স্ফূর্ত্তি করিতে বসিল।

বিলুপ্তচেতনা, বিমুক্তকুন্তলা, বিস্রস্তবসনা নিরুপমার মদনোন্মাদি মনোমোহন মুখখানি সুরাপানোন্মত্ত সজনী বার বার দেখিতে লাগিল! দেখিয়া, দেখিয়া, দেখিয়া, দেখিবার আশা কিছুতেই আর মিটিতেছে না! আত্মবিস্মৃত ও আত্মজ্ঞানশূন্য কামোন্মত্ত সজনী নিরুপমার নিরুপম মুখমণ্ডলে বার বার চুম্বন করিতে লাগিল।

পাঠক! আর অগ্রসর হইয়া কাজ নাই, এ পাপ দৃশ্যের যবনিকা এই স্থানেই পতিত হউক!

যখন ঊষার আলো জানালার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, তখন ধীরে ধীরে নিরুপমার চৈতন্যের সঞ্চার হইল; ধীরে ধীরে মদিরামোহ অপসারিত হইল; ধীরে ধীরে মহাঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

নিরুপমা চক্ষু মেলিয়া দেখিল, গৃহ অন্ধকার! কেবলমাত্র গবাক্ষের ছিদ্র ভেদ করিয়া ঊষার রক্তিম আভা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। ধীরে ধীরে উঠিবার চেষ্টা করিল, মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল; তবু উঠিল। এ দিক ও দিক হাত দিয়া বুঝিল, পার্শ্বে হীরাবাই অঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন!

নিরুপমার কেমন—কিসের একটা গোলমাল ঠেকিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, তাহার যেন কি হইয়াছে, সে যেন কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, কে যেন চুপি চুপি কোথা হইতে আসিয়া তাহার কি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে! পার্শ্বের ঘরে সজনী ও তাহার সহচরগণের উচ্চহাস্যস্রোত তখনও সমভাবে প্রবাহিত হইতেছিল! সে আস্তে আস্তে দরজাটী খুলিয়া কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল, উহারা কি কথা কহিতেছে! নিরুপমা যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার আর বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। নিদ্রাভঙ্গে আপনার দেহের অবস্থা অনুভব করিয়া, নিজের মনের সহিত কথা কহিয়া, তাহার যাহা সন্দেহ হইয়াছিল, এখন বুঝিল, সে সংশয়, অমূলক নহে। নিরুপমার মনে হইল, সজনী খুব এক চাল

চালিয়াছে বটে! ঘৃণায় ও লজ্জায় সে মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গেল! কিন্তু এখন আক্ষেপ করা বৃথা! যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে না। এ সম্বন্ধে আপাততঃ আর কোনও কথা উত্থাপন না করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিল। মনে মনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল, "বেশ্যার প্রতিহিংসা! যেমন করিয়াই হোক, সজনীর সর্ব্বনাশ করিবই করিব!"

এইবার নিরুপমা হীরাবাইকে জাগাইল, বাড়ী যাইবার জন্য একখানা গাড়ী আনাইয়া দিতে অনুরোধ করিল। হীরাবাই জাগরিত হইয়া চাকরের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সজনী ও তাহার সঙ্গিগণ সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরুপমার দিকে চাহিয়া সজনী মনে মনে হাসিতে লাগিল, আত্মীয়তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড় কষ্ট হয়েছে কি?" নিরুপমা ঘাড় হেঁট করিয়া উত্তর দিল,—"বিশেষ নয়। আমাকে শীঘ্র একখানা গাড়ী আনাইয়া দেওয়া হোক, মা আমার জন্য চিন্তিত হইয়া রহিয়াছেন।" সজনী মহাব্যস্ত হইয়া গাড়ী আনাইয়া অতি সমাদরে নিরুপমাকে বিদায় দিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পুলিস কর্ত্তৃক নলিনীর গ্রেপ্তারের কথা যথাসময়ে দুর্গার কাণে গিয়া পঁহুছিল। সে ভয়বিহ্বলিত ব্যথিতচিত্তে শাশুড়ীর কাছে ছুটিয়া আসিয়া সকল কথা বিবৃত করিল। নলিনীর মাতা কাঁদিয়া কাটিয়া আকুল হইয়া মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিতে লাগিলেন, "যাহারা মরণ চায় না, মরণ তাহাদের কাছে আগে যায়; আর আমি দিবারাত্রি মৃত্যুকামনা করিতেছি, নিষ্ঠুর যম আমাকে লইতে চায় না।" দুর্গা বলিল, "মা! কাঁদিয়া এখন ফল কি? একটা উপায় ত' কিছু করিতে হইবে। স্বামী আমার পুলিসের হস্তে নির্য্যাতন ভোগ করিতেছেন, আর আমি স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে অট্টালিকায় বসিয়া আছি! আমার এ মহাপাতক কি বিধাতা সহ্য করিবেন? আমার প্রাণের জ্বালা বুঝিবার, আমার দুঃখে দুঃখিত হইবার, তুমি ছাড়া আর এ সংসারে কে আছে? মা! তোমার পায়ে ধরিতেছি, এ বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার কর।" বলিতে বলিতে দুর্গার বেদনাক্লিষ্ট, জ্বালা-জর্জ্জরিত ক্ষুদ্র বুকখানি শতধারে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নলিনীর মাতা সযত্নে দুর্গার মুখখানি মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "পাগল মেয়ে! নলিনী কি আমার কেউ নয়? সে যে আমার বুকের রক্ত, অন্ধের নড়ি,—নয়নের তারা!

আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। পাষাণী আমি, মরণ আমার কাছে আসিতে ভয় পায়, তাই এখনও বাঁচিয়া আছি। যামিনীর কাছে সব কথা খুলিয়া বলা ভিন্ন আমি ত' আর অন্য উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু নলিনীর উপর তাহার যেরূপ মনের ভাব, তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইব, বলিতে পারি না। চল, দুর্গানাম স্মরণ করিয়া যামিনীর ঘরে যাই, তুমি দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিবে।"

হৃদয়ের গুরুভার কোনও মতে চাপিয়া নলিনীর মাতা ধীরে ধীরে যামিনীভূষণের শয়নকক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিষাদের ম্লান ছায়াখানির মত দুর্গা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। যামিনীভূষণ আপনার শয়নকক্ষে একখানি ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় নাকে সোনার চশমা লাগাইয়া 'আরব্য উপন্যাস' পাঠ করিতেছিলেন। জননীর মুখে নলিনীঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তিনি উত্তর করিলেন, "ইতিপূর্ব্বেই আমি সে খবর পাইয়াছি; কিন্তু আমি কি করিতে পারি? বার বার ঘা খাইয়া যাহার চৈতন্য হইল না, তাহার পরিণাম এইরূপই হইবার কথা।"

নলিনীর মাতা করুণকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! সবই বুঝিতেছি, কিন্তু এরূপ খবর পাইয়া মার প্রাণ কি স্থির থাকিতে পারে? আমি তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি, এ যাত্রা নলিনীকে রক্ষা কর। ভবিষ্যতে তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ অনুরোধ করিব না। নলিনীকে যদি আমি আজ রাত্রের মধ্যে না দেখিতে পাই, তবে

কাল সকালে আর আমায় জীবিত দেখিতে পাইবে না।” কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া যামিনীভূষণ কহিলেন, “তুমিই আদর দিয়া তাহার মাথাটী খাইলে; সে যাহা হউক, যে জহুরীর সহিত জুয়াচুরী করিয়া নলিনী পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে, সে তাহার প্রাপ্য টাকা না পাইলে ছাড়িবে কেন? সে টাকাও অল্প নয়, প্রায় ছয় হাজার! এত টাকার যোগাড়—এই রাত্রে কেমন করিয়া হইতে পারে? আমি এখন উকীলের বাড়ী চলিলাম, দেখি—যদি কোনরূপ উপায় করিতে পারি।”

নলিনীর মাতার দুই চোখে দশধারা,—তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিলেন, “বাবা! কোনমতে নলিনীকে এইবার উদ্ধার কর। আর তোমায় কখনও কিছু বলিব না।” যামিনীভূষণ আর কোনও কথা না কহিয়া, নীচে নামিয়া আসিয়া গাড়ী প্রস্তুত করিবার হুকুম দিলেন।

এইবার দুর্গা যামিনীভূষণের স্ত্রীর পদতলে মলিন মালার মতন লুণ্ঠিত হইয়া সকাতরে বলিতে লাগিল, “দিদি! তুমি ত’ আমার হইয়া একটা কথাও বলিলে না? তবে কি কোনও উপায় হইবে না? সত্য সত্যই কি আমার কপাল পুড়িল?” যামিনীভূষণের স্ত্রী অবিচলিতচিত্তে অকুণ্ঠিতভাবে উত্তর করিলেন, “আমরা মেয়েমানুষ, ও সকল কথায় কি আমাদের থাকা উচিত? বিশেষতঃ, যে যেমন কর্ম্ম করিবে, তাহাকে তেমনই ফলভোগ করিতে হইবে।” দুর্গার প্রাণে বড় ঘা লাগিল; সে বুঝিল, এ স্বার্থের সংসারে মায়া, মমতা, সহানুভূতি, সহৃদয়তা—কিছুমাত্র

নাই, কেবল আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। যে পরিমাণ দিবে, সেই পরিমাণ পাইবে। আমাদের বোধ হয়, কথাটা বড়ই সত্য!

এ দিকে যামিনীভূষণ সাজসজ্জা করিয়া জুড়া জুতাইয়া তাঁহার আত্মীয় হাইকোর্টের এটর্ণী নিতাই বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। রুদ্ধদ্বারে উভয়ের প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল নানারূপ পরামর্শ চলিল। তৎপরে দ্বার খুলিয়া নিতাইবাবু যামিনীভূষণকে লইয়া আপনার ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিলেন। প্রায় চার পৃষ্ঠা ব্যাপী একটা লেখাপড়ার খসড়া তৈয়ারী হইল। কালবিলম্ব না করিয়া যামিনীভূষণ ও নিতাই বাবু থানায় উপস্থিত হইলেন। করমচাঁদ একখানি চেয়ারে বসিয়া ইন্‌স্‌পেক্টার বাবুকে আপনার "কেস্" বুঝাইতেছিলেন, আর একখানি ছোট টুলের উপর অদৃষ্ট-পীড়িত, বিধিনিগৃহীত, হতভাগ্য নলিনীভূষণ মাথাটি নীচু করিয়া বসিয়া আত্মহত্যার কল্পনা করিতেছিল। জ্যেষ্ঠ যামিনীভূষণ ও নিতাইবাবুকে দেখিয়া সে প্রাণে একটু বল পাইল। ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু নিতাই বাবুকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, খাতির করিয়া পার্শ্বে বসাইলেন। যামিনীভূষণের জন্য একখানি স্বতন্ত্র চেয়ার আনীত হইল, তিনিও উপবিষ্ট হইলেন। নিতাই বাবু ইন্‌স্‌পেক্টার বাবুকে বলিলেন, "আমি আসামীর সহিত গোপনে কয়েকটি কথা কহিতে চাই, তাহাতে আপনার আপত্তি আছে কি?" ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু উত্তর করিলেন, "কিছুমাত্র নয়। আপনি আসামীকে পাশের ঘরে লইয়া যাইতে পারেন।" নলিনীকে ডাকিয়া লইয়া নিতাইবাবু যথাস্থানে গিয়া কহিলেন, "তোমার

বিপদের কথা শুনিয়া, তোমার জ্যেষ্ঠ আমাকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়াছেন। তোমাকে বুঝাইবার বা উপদেশ দিবার আর কিছুই নাই; কারণ, তোমার মাথা একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তোমায় জেলের হাত হইতে উদ্ধার করিতে হইলে ছয় হাজার টাকার প্রয়োজন। কিন্তু তুমি ত' সব ফুঁকিয়া দিয়াছ, তোমার একটি পয়সাও নাই। এখন একমাত্র উপায় আছে। টাকার যোগাড় করিতে হইলে, তোমায় এই মর্ম্মে লেখাপড়া করিয়া দিতে হইবে, তোমার মাতার মৃত্যুর পর তুমি যে সম্পত্তির অধিকারী হইবে, তাহারই স্বত্ব তুমি যামিনীভূষণকে বিক্রয় কওলা লিখিয়া দিতেছ। ইহাতে জহুরী করমচাঁদের দেনা শোধ হইয়া তুমি আরও চারি হাজার টাকা হাতে পাইবে। এ প্রস্তাবে সম্মত আছ কি ?"

যে নলিনী আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহার পক্ষে এ প্রস্তাব ঈশ্বরপ্রেরিত শুভ আশীর্ব্বাদের ন্যায় আনন্দপ্রদ বলিয়া বোধ হইল। সে সাগ্রহে উত্তর দিল, "এ প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

নিতাইবাবু। উত্তম, কিন্তু একটা কথা আছে। এ রাত্রে ষ্ট্যাম্পের উপর লেখাপড়া হইতে পারে না। আমার দায়িত্বে খস্‌ড়ার উপর সই করাইয়া আমি এ টাকা দিতে পারি, চেক-বইও সঙ্গে আনিয়াছি। কিন্তু ষ্ট্যাম্প চড়াইয়া, রীতিমত লেখা-পড়া হইলে, যদি তুমি সহি না কর, তবে আবার পুলিস-কেসে পড়িবে। এইটুকু স্মরণ রাখিও।

নলিনী। এ জীবনে আর কখনও প্রতারণা করিব না, এটা স্থির জানিবেন। এ যাত্রা আমায় রক্ষা করুন, অতঃপর দেখুন, জীবনস্রোত নূতন পথে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি কি না ?

এইবার নিতাই বাবু খসড়া বাহির করিলেন; আপনার ফাউন্‌টেন্-পেন্‌টি নলিনীর হাতে দিয়া বলিলেন, "সহি কর।" নলিনী স্বাক্ষর করিল। পরে নিতাই বাবু ইন্‌স্‌পেক্টার বাবুকে বাহিরে লইয়া গিয়া প্রায় ১৫ মিনিট ধরিয়া কি কথাবার্ত্তা কহিলেন। হাসিতে হাসিতে দুই জনে যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু করমচাঁদকে কহিলেন, "তুমি তোমার প্রাপ্য টাকা পাইলে মোকদ্দমা তুলিয়া লইতে প্রস্তুত আছ ?"

করমচাঁদ সেলাম বাজাইয়া উত্তর দিল, "হুজুর ! আমরা গরীব ব্যবসায়ী লোক, টাকা পাইলে মোকদ্দমার প্রয়োজন কি ?"

নিতাই বাবু চেক সহি করিয়া দিলেন। করমচাঁদ রসিদ দিল, এবং ইন্‌স্‌পেক্টার বাবুকে লিখিয়া দিল যে, তাহার সাক্ষী সাবুদ নাই, সেই হেতু সে মামলা চালাইতে অক্ষম।

এ দৃশ্যের এই স্থানেই উপসংহার হইল। নলিনী পুলিসের হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। বাহিরে আসিয়া নিতাই বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় যে চারি হাজার টাকা দিবেন বলিয়াছেন, তাহা কখন পাইব ?" নিতাই বাবু উত্তর করিলেন, "কাল আমার আফিসে বেলা দশটার পর তুমি আসিও, পাকা লেখাপড়ায় সহি করিয়া চারি হাজার টাকা গ্রহণ করিও।"

সংসার-নাটকের অভিনেতাগণ স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন। নলিনী বাড়ীতে আসিয়া বাহিরের ঘরে শুইয়া পড়িল, উপরে গেল না। সে উপরে আসুক না আসুক, বিপদমুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়াছে, এইটুকুই যথেষ্ট;* এই ভাবিয়া নলিনীর মাতা ও অভাগিনী দুর্গা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইল।

নলিনীর নিদ্রা হইল না, সে একখানি পত্র লিখিতে বসিল। পরদিন বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে সে সেই পত্রখানি ভৃত্যের দ্বারা দুর্গার নিকট পাঠাইয়া দিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বরাবর নিতাই বাবুর আফিসে উপস্থিত হইল। তথায় দুই ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া, পাকা লেখাপড়ায় সহি দিয়া, চারি হাজার টাকার নোট লইয়া, কি জানি কোথায় চলিয়া গেল।

এ দিকে নলিনীর পত্র একবার, দুইবার, তিনবার, বারবার আকুল আগ্রহের সহিত দুর্গা পাঠ করিল। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল :—

"দুর্গা!

তোমাকে বলিবার কিছুই নাই।—কেবল এইটুকু বলিবার আছে,—তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না সহধর্ম্মিণী লাভ বহুপুণ্যের ফল। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে সে শুভযোগ আমার ঘটিয়াছিল। কিন্তু চণ্ডালের কণ্ঠে মণিময় হার শোভা পাইবে কেন? ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে রত্ন পাইয়াও যত্ন করিতে পারিলাম না। বন্যপশুর পক্ষে দেবীপূজা কি করিয়া সম্ভব হয়! যতদিন না চরিত্রসংশোধন

করিতে পারি, যতদিন না তোমার যোগ্য হইতে পারি, যতদিন না স্নেহময়ী জননীর চোখের জল ঘুচাইতে পারি, ততদিন কলঙ্কিত মুখ আর তোমাদিগকে দেখাইব না। আমি ভগবান রামকৃষ্ণ-দেবের চরণ স্মরণ করিয়া, তাঁহারই স্মৃতিমন্দির আল্‌মোরা-পর্ব্বতস্থ মঠে যাত্রা করিতেছি। চিন্তা করিও না,—অগ্নির সংযোগে অঙ্গারমালিন্য নষ্ট হয়, পবিত্র সহবাসে আমারও প্রাণের ময়লা ছুটিয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মানুষের দ্বারা কাহারও কিছু হয় না; এইবার দেবতার পদে গিয়া আশ্রয় লইব। যদি জীবন-স্রোত পরিবর্ত্তিত করিতে পারি, তবেই আবার তোমাদের সম্মুখীন হইব। নচেৎ জানিও, তোমার পাপাত্মা স্বামীর অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব ধরা-বক্ষ হইতে মুছিয়া গিয়াছে! মাকে আমার প্রণাম জানাইয়া সব কথা খুলিয়া বলিও। অধিক লিখিতে পারিলাম না, হাত কাঁপিতেছে, প্রাণ কাঁপিতেছে, বুকের ভিতর ঝড় বহিয়া যাইতেছে!

হতভাগ্য—নলিনী।”

পত্র পাঠ করিয়া দুর্গা বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান এক যোট হইয়া তাহার ভগ্নহৃদয়ে হর্ষবিষাদের, আশা-নিরাশার, হাসি-কান্নার নানা তরঙ্গ তুলিতে লাগিল। প্রথমে কাঁদিয়া, শেষে দুর্গা বেশ করিয়া বুক বাঁধিল; ভগবান রামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম করিয়া সে কাতরে বলিল, “ঠাকুর! স্বামী আমার তোমার স্মৃতিমন্দিরে, তোমার পদাশ্রয় পাইবার আশায়, আমাদের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া,

বড় আশায় যাত্রা করিয়াছেন! দেখিও ঠাকুর! তোমার পতিতপাবন নামে যেন দাগ না পড়ে!”

কি আশ্চর্য্য! ও কি ও! কক্ষস্থিত ভগবান রামকৃষ্ণের পট দুলিতে লাগিল, ঠাকুরের স্থির-গম্ভীর-উজ্জ্বল বদনে বালকের হাসি ফুটিয়া উঠিল! যে হাসির ফাঁসি পরিয়া মহাপাপী জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়াছিল, এ কি সেই হাসি? দুর্গা স্পষ্ট শুনিল, ঠাকুর বলিতেছেন,—‘ভয় নাই মা! তোমার স্বামীকে আমি পায়ে ঠাঁই দিয়াছি।’

দুর্গা উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার ক্ষীণ দেহযষ্টি থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, মাথার ভিতরে যেন আগুণ জ্বলিতে লাগিল; তাহার মনে হইল, এ কি সত্য? অথবা প্রহেলিকা?

আমরা বলি, শোন’ দুর্গা! পাষণ্ডের পক্ষে প্রহেলিকা হইতে পারে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে সত্য, সত্য, অতি সত্য!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন প্রভাতে হীরাবাইয়ের বাড়ী হইতে আসিয়া নিরুপমা শয্যায় শুইয়া পড়িল। সে ঘুমাইবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পোড়া চোখে ঘুম কিছুতেই আসিল না। তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার বুকখানা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! কে যেন তাহাকে

রাবণের চিতায় ফেলিয়া দিয়াছে! কোথা দিয়া কি হইয়া গেল, কেন হইল, কেমন করিয়া হইল? এমন প্রতারিত সে কখনও হয় নাই! এমন চোট সে আর কখনও খায় নাই! প্রথমে মনকে চোখ ঠারিবার চেষ্টা করিল; বুঝাইল, 'আমি বেশ্যা; আমার এ অনুশোচনায় প্রয়োজন কি? বারনারীর প্রাণে পুণ্যের তরঙ্গ উঠে কেন?' কিন্তু না—মন তাহার বুঝিল না,—জলের রেখার ন্যায় এ ভাব তাহার প্রাণের মধ্যে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা! দারুণ প্রতিশোধ-স্পৃহায় তাহার সর্ব্বশরীর ভরিয়া উঠিল। সে উঠিয়া বসিল; সারারাত্রির অত্যাচারে তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, মুক্তকেশরাশি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ব্যভিচারক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে প্রতিহিংসার ছায়া পতিত হইয়া, বিকটা ডাকিনীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। সে বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া, মনে মনে কি একটা মতলব আঁটিল। দোয়াত কলম ও চিঠির কাগজ লইয়া সে একখানা পত্র লিখিতে বসিল। পত্র লেখা শেষ হইলে, চাকরকে ডাকিয়া চুপি চুপি কি বলিয়া দিল। অতঃপর জলভরা চৌবাচ্চায় নামিয়া সে দুই ঘণ্টাকাল জলে পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সজনীকান্ত ফিটফাট্ বাবু সাজিয়া, চেরিব্লসমের সৌগন্ধে চারি দিক মাত করিয়া, আইভরির ছড়িটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাড়ী হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় নিরুপমার চাকর আসিয়া তাহাকে

একখানি পত্র দিল। সজনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পত্র পড়িতে লাগিল।

"স্বপ্নের ভালবাসা!

তোমায় কি বলিয়া সম্বোধন করিব, আমি অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। কোথায়, কোন্ স্বপ্নের জগতে, কি সুখের স্বপ্নের ঘোরে তোমায় দেখিয়াছিলাম, তোমার কথা শুনিয়াছিলাম, তোমাতে একান্তে মজিয়াছিলাম। সে স্বপ্নের ঘোর একরূপ কাটিয়া গিয়াছিল, আবার কেন নূতন স্বপ্ন দেখাইলে? আবার কেন আমাকে পাগল করিলে? আবার কেন আমাকে চরণের দাসী হইবার জন্য লালায়িত করিলে? আমি বেশ জানি, এ জীবনে তুমি আমার হইবে না; তোমায় কখনও 'সর্ব্বস্ব' বলিয়া হৃদয়ে ধরিতে পাইব না। আমার স্বপ্নের ভালবাসা স্বপ্নেই শেষ হইবে। মনকে অনেক করিয়া বুঝাইয়াছি, কিন্তু সে বুঝ মানে কই? সে আমার কথা শোনে কই? সে যে তোমাকে আর একবার দেখিবার জন্য আমার চুলের মুঠি ধরিয়া টানাটানি করিতেছে! এস আমার ইষ্ট-দেবতা, এস আমার ইহকাল পরকাল, এস আমার স্বপ্নের ভালবাসা! একটি বারের জন্য আমায় দেখা দাও; জীবনে কখনও কাঁদি নাই, কান্নার তার জানিতাম না। তোমার বাহাদুরী আছে, তুমি আমায় কাঁদাইয়াছ। কান্নায় কি সুখ আছে, তাহা শিখাইয়াছ। আমি আজ সন্ধ্যা হইতে সারারাত্রি তোমার আশায় জাগিয়া বসিয়া থাকিব। যদি না এস, যদি না

দেখা দাও, কাল সকালেই শুনিবে, নিরুপমা এ জগতে আর নাই!

পাগলিনী—নিরুপমা।"

দুইটি টাকা বখ্‌শিশ দিয়া সজনী চাকরকে বিদায় করিল। বলিয়া দিল, "বিবিকে বলিও, রাত্রি দশটার পর আমি যাইব।"

সজনী ভাবিতে লাগিল, "কেমন জব্দ করিয়াছি! যখন আমি সাধিয়াছিলাম, তখন আমার প্রস্তাব তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এখন এক দিনের দেখাতেই যাদুকে ফাঁদে ফেলিয়াছি! মেয়েমানুষকে কি করিয়া হস্তগত করিতে হয়, সে বিদ্যা বড় বেমালুম দখল করা গিয়াছে। এইবার নিরুপমা ছুঁড়ীকে লাট্টুর মতন ঘুরাইতে হইবে। বেটী আমার জন্য পথে পথে ছুটিয়া বেড়াইবে—তবে আমার মনের ক্ষোভ মিটিবে।"

বিধাতার বিচিত্র রাজ্যের বিচিত্র ব্যাপার! রাক্ষসী বলিতেছে, আমি মানুষের রক্ত খাইব। মানুষ বলিতেছে, আমি রাক্ষসীকে বধ করিব। দেখা যাউক, এ যুদ্ধে কে জিতে, কে হারে!

তার পর সজনী গাড়ীতে উঠিয়া প্রিয় সহচর রামলালের বাটী অভিমুখে চলিল। মধ্যপথে রামলালের সহিত দেখা, আর তত দূর কষ্ট করিয়া যাইতে হইল না। সজনী রামলালকে গাড়ীতে তুলিয়া লইল।

সজনী হাসিতে হাসিতে নিরুপমার পত্রখানা রামলালকে পড়িতে দিল। চিঠি পড়িয়া রামলাল এরূপ বিকট হাস্যরবে

রাজপথ মুখরিত করিয়া তুলিল যে, রাস্তার অনেক লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সজনীর গাড়ীর ভিতর উঁকি পাড়িতে লাগিল। পরে উভয় বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া এই স্থির হইল যে, হীরাবাইকে বলা যাইবে, অদ্য রাত্রে কোনও আত্মীয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যাইতে হইবে,—তথা হইতে ফিরিতে রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিবে। রামলাল বলিল, "হীরাবাইকে আমি ঠিক ম্যানেজ্ করিয়া লইব, তাহার জন্য তোমাকে চিন্তিত হইতে হইবে না; তুমি বেটীর গুমোরটা আরও ভাল করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া আইস, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

অতঃপর উভয়ে হীরাবাইয়ের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণের শুভ পদার্পণে হীরাবাইয়ের বাড়ী পবিত্র হয় নাই। রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত মদ্যপান, নৃত্যগীত, হাস্যকৌতুকে অতিবাহিত করিয়া, আত্মীয়ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইবে বলিয়া, রামলালকে বসাইয়া রাখিয়া, সজনী গুপ্ত প্রেমাভিসারে প্রস্থান করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হীরাবাইয়ের উপর রামলালের একটু নেক্‌নজর ছিল, এবং হীরাও তাহা জানিত। সজনী চলিয়া যাইবার পর রামলাল একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া অল্পপরিমাণ সোডা মিশাইয়া ব্র্যাণ্ডী পান করিল। পূর্ব্ব হইতেই তাহার নেশার সুর একটু চড়িয়াছিল, এইবার সুর পঞ্চমে উঠিল। সে গদগদকণ্ঠে হীরাবাইকে বলিল—"দেখ হীরা! যদি কিছু মনে না কর ত' একটা কথা বলি! তোমাদের জাতের

স্বধর্ম্ম দেখিতেছি, যে তোমাদের চায় না, তাহাকেই তোমরা চাও।”

ঈষৎ মৃদু হাস্যের সহিত হীরা উত্তর দিল, “এ কথা কেন বলিতেছ, রামলাল বাবু ?”

রামলাল। বলিতেছি সাধে ? তুমি যদি আমার হইতে, এ সংসার কি সুখের হইত! কপোত-কপোতীর মত মুখোমুখী করিয়া দু জনে এ জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিতাম। আর তুমি কি মনে কর, আমি একেবারে নিঃসম্বল ? তোমায় খাওয়াইতে পরাইতে পারি, আমার কি এমন সংস্থান নাই ? আমার মুখে লাগাম লাগাইয়া চিরজন্ম যে ঘোড়ার ন্যায় হাঁকাইয়া বেড়াইতে পারিতে! তা ভাই! তোমরা ত' তা চাও না! যাহারা পাঁচ ফুলের মধু খুঁজিয়া বেড়ায়, একটাকে লইয়া যাহাদের প্রাণ পূর্ণ হয় না, তোমাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা যাহারা ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাদেরই তোমরা চরণের দাসী।

হীরা। এ কথার অর্থ কিছু বুঝিলাম না, রামলাল বাবু!

রামলাল। অর্থ আর কি বুঝিবে মাথামুণ্ড! সজনীটিকে কি ঠাওরাও তুমি ? সে তোমায় একটুও ভালবাসে না। বড়লোকের পাঁচটা আসবাব থাকে, তুমিও সেই পাঁচটা আসবাবের ভিতর একটা। আমি জানি, তুমি সত্যনারায়ণকে মান, তাঁহার শপথ করিয়া বল, আমি যাহা প্রকাশ করিব, তাহা তুমি মনের ভিতর কুলুপ আঁটিয়া রাখিয়া দিবে ?

হীরা। কি বলিবে—কাহার কথা ?

রামলাল। সজনীর কথা। নিরুপমাকে লইয়া কি ব্যাপার হইয়াছে, এবং হইতেছে, সমস্তই আমি তোমাকে খুলিয়া বলিব।

হীরা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "রামলালবাবু! আমাকে একটু মদ দাও।"

রামলাল হীরাকে সুরাপান করাইল।

এইবার হীরা বলিল, "আমি সত্যনারায়ণের দিব্য করিয়া বলিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, এ জীবনে কখনও কাহারও কাছে প্রকাশ করিব না।"

রামলাল বলিল, "তবে শোন,—কালরাত্রে কি মতলবে নিরুপমাকে এখানে আনা হইয়াছিল, তাহা জান? তোমাকে বেশী মদ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলা হইয়াছিল কেন জান? থাক্, সে কথায় আর দরকার নাই। আজ নিমন্ত্রণের ভাণ করিয়া সজনী কোথায় গিয়াছে, জান?"

হীরা। কোথায়?

রামলাল। নিরুপমার বাড়ী?

হীরা। মিথ্যা কথা!

রামলাল। মিথ্যা সত্য প্রমাণ লইতে চাও?

হীরা। চাই।

রামলাল। যদি সত্য বলিয়া প্রমাণ দিতে পারি, তাহা হইলে কি হইবে?

হীরা। তাহা হইলে, আমি তোমার হইব।

রামলাল। ধর্ম্মতঃ বলিতেছ?

হীরা। ধর্ম্মতঃ বলিতেছি।

রামলাল। তবে একখানা গাড়ী ডাকাও, আমার সঙ্গে চল। নিরুপমার বাড়ীর কাছেই এমন ভাবে গাড়ী রাখিব, যাহাতে সজনী তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইলেই, তুমি দেখিতে পাও।

হীরাবাই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার বুকের ভিতর কে যেন বিষ ঢালিয়া দিল! সে দ্রুত উঠিয়া গৃহমধ্যে ঘন ঘন পদচারণা করিতে লাগিল।

পাঠক! ইহাকে কি বল? প্রেম—না স্বার্থপরতা? পিপাসা—না প্রতিহিংসা? ভালবাসা—না মোহের বিকার?

হীরা উচ্চৈঃস্বরে চাকরকে ডাকিয়া গাড়ী আনিতে বলিল। অতি নিকটেই গাড়ীর আড্ডা, দশ মিনিটের মধ্যেই—গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। রামলাল ও হীরাবাই গাড়ীতে উঠিল। ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছেন?" হীরাবাই উত্তর দিল, "তোর সে কৈফিয়তে প্রয়োজন কি?"

তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। মহানগরী কলিকাতা একেবারে নিস্তব্ধ না হইলেও, রাজপথে লোক চলাচল বড় বেশী ছিল না। কোনও কোনও পানওয়ালার দোকানে গীত-বাদ্য ও মধ্যে মধ্যে পাহারাওয়ালার "খবর আচ্ছা হ্যায় হুজুর" ব্যতীত আর বিশেষ কিছু শোনা যাইতেছিল না। গাড়ী আসিয়া নিরুপমার বাটীর সন্নিকটস্থ হইল। উপযুক্ত স্থানে রামলাল গাড়ী থামাইল। গাড়োয়ানকে বলিল, "বাতি নিবাইয়া দাও।" তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপালিত হইল।

গাড়ীর ভিতর বসিয়া বসিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। হীরাবাই অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। রামলালের প্রেমপূর্ণ স্তুতিবাদ তাহার ভাল লাগিতেছিল না। আট দশটি সিগারেটের আদ্য-শ্রাদ্ধ করিয়া হীরাবাই বলিয়া উঠিল, "রামলাল বাবু! তুমি মিথ্যাবাদী।"

হীরার কথা শেষ হইতে না হইতে নিরুপমার বাটীর প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত হইল। রামলাল হীরাকে দেখাইল, একটি হ্যারিকেন্ ল্যাম্প হস্তে লইয়া নিরুপমা দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা,—সজনী ধীরে ধীরে নিরুপমার বাটীর প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিয়া রাজপথে পা দিতেছে!

হীরা চীৎকার করিবার উদ্যোগ করিল;—রামলাল জোর করিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। হীরা রামলালের বুকে মাথা রাখিয়া ঘন ঘন হতাশের দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল,—"রামলাল বাবু! আজ হইতে আমি তোমার। আমায় কোথায় লইয়া যাইবে, চল! আমি আর সে বাড়ীতে এ জন্মে প্রবেশ করিব না।"

রামলাল বলিল, "তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছে! তোমার গহনাপত্র টাকা কড়ি সব সেখানে পড়িয়া রহিল, আর তুমি সজনীর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া—পথের ভিখারিণী হইতে চলিলে! সেই বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি নিরুপমার দেহের শোভাবৃদ্ধি করিবে, তুমি কি এই চাও? সজনী তোমার বাড়ীতে আজ আর ফিরিবে না, এ কথা নিশ্চয়। এই সুযোগে

তোমার যাহা কিছু আছে, সমস্ত লইয়া ভোরের গাড়ীতেই পশ্চিম রওনা হই।”

হীরাবাই একবার ভবিষ্যৎ ভাবিল; বুঝিল, এ যুক্তি মন্দ নয়। উত্তর দিল, “ভাল—তাই চল।”

গাড়োয়ান বাতি জ্বালাইয়া গন্তব্য স্থান অভিমুখে ঘোড়া ছুটাইল।

এ দিকে নিরুপমার বাটী হইতে বাহির হইয়া সজনীর প্রাণে নানা তরঙ্গের উদয় হইতে লাগিল। সে বিশেষরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, “এক বার হীরাবাইকে দর্শন দিয়া গেলে, সে আর কোনও সন্দেহ করিবে না।”

হীরাবাই ও রামলাল পঁহুছিবার পূর্ব্বেই সে হীরার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, সদর দরজা খোলা! আশ্চর্য্য হইয়া চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল, “বিবি কোথায়?”

ভৃত্য উত্তর দিল, “রামলাল বাবুর সহিত ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।”

সজনী ক্রোধে অন্ধ হইয়া আত্মজ্ঞানশূন্য হইল। কাঁচের আল্‌মারীর ভিতর মদের বোতল রক্ষিত ছিল, চাবির অভাবে হাত দিয়া কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বোতল বাহির করিল; কাঁচে হাত কাটিয়া রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। উপর্য্যুপরি দুই গ্লাস সুরা পান করিয়া সজনী উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল! ভৃত্যকে ডাকিয়া বজ্র-গম্ভীরস্বরে আদেশ করিল—“ছাদের উপর গিয়া বসিয়া থাক্, কেহ ডাকিলে উত্তর দিস্ না।” ভৃত্য ভয়ে ও

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ছাদের উপর গিয়া চুপটি করিয়া শুইয়া রহিল।

ঠিক এই সময় একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সুরাপানোন্মত্ত রামলাল এবং মদিরা ও প্রতিহিংসায় আচ্ছন্ন হীরাবাই গাড়ী হইতে নামিয়া উভয়েই উভয়ের গলা জড়াজড়ি করিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই কালান্তক যম! এ রাত্রে সজনী আবার কেমন করিয়া আসিল? এ কি সত্য সজনী—না তাহার প্রেতমূর্ত্তি? ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সজনী লম্ফ দিয়া হীরার কণ্ঠ ধারণ করিল। রামলাল সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে কোনও রূপে প্রাণ বাঁচাইয়া সদর রাস্তায় গিয়া পড়িল। সজনী কোনও কথা কহিল না, কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না, কোনও কথা শুনিবার অপেক্ষা করিল না। হীরাবাইয়ের গলা টিপিয়া ধরিয়া, জোর করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিয়া, বুকে ও মুখে বার বার পদাঘাত করিতে লাগিল! হীরা বাইয়ের কাতর করুণ কণ্ঠস্বর ও চীৎকার সেই দ্বিপ্রহর রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পরতে-পরতে উঠিয়া-উঠিয়া নক্ষত্র খচিত আকাশের কোলে মিশাইয়া যাইতে লাগিল। হীরাবাইয়ের মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিল,—তথাপি বিরাম নাই,—তখনও পদাঘাত সমভাবে চলিতেছে। এইবার হীরাবাই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল।

ইতিপূর্ব্বেই রামলাল গিয়া পুলিসে খবর দিয়াছিল,—অমুক বাড়ীতে খুন হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর,

জমাদার ও পাহারাওয়ালা আসিয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিল। হীরাবাইয়ের সংজ্ঞাহীন অর্দ্ধ-মৃতদেহ হাঁসপাতালে চালান দিল। হাতে হাতকড়ি দিয়া সারিবদ্ধ হইয়া সজনীকে থানায় লইয়া চলিল!

পাঠক! এইবার বলুন,—জিতিল কে? সজনী—না নিরুপমা?

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাঠক! আমরা বহুদিন ক্ষিতীশচন্দ্রের সংবাদ লই নাই,—আজ একবার তাঁহার খবরাখবর লওয়া যাক, চলুন।

ক্ষিতীশচন্দ্রের বাটীতে আজ মহাধূম,—তাহার কন্যার বিবাহ; অন্নপূর্ণার প্রাণে আজ আনন্দ ধরে না, তাহার উপযুক্ত অবিবাহিতা দুহিতা যে সৎপাত্রে সমর্পিত হইবে, এ আশা তাহার আদৌ ছিল না। তাহার গুণধর স্বামীর উচ্চপ্রকৃতি ও প্রবৃত্তির গুণে অন্নপূর্ণার এরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল, সুতরাং এ বিষয়ে আমরা তাহাকে বিশেষ দোষ দিতে পারি না!

ভাড়াটিয়া বাড়ীটি যথাসম্ভব সুসজ্জিত করা হইয়াছে,—যে অপরিষ্কার প্রাঙ্গণে কখনও একটা আলো পড়ে নাই, সেই উঠান আজ উজ্জ্বল আলোকমালায় সুশোভিত হইয়া, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-

বর্গের চিত্তবিনোদন করিতেছিল। মধ্যস্থলে কারুকার্য্যমণ্ডিত মখমলের আসনে বর উপবিষ্ট, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী বালকগণের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলিতেছে; ছাদের উপর এক পংক্তি লোক ভোজনে বসিয়াছে; "লুচি আন," "আলুর দম আন," "ক্ষীর চাই," "দই চাই," "দরবেশ চাই"—ইত্যাদি রবে দ্বিতল মুখরিত হইতেছে; ক্ষিতীশচন্দ্র আজ বড়ই ব্যস্ত।

বর কে, বরের পিতা কে, কোথায় বাড়ী, কি কাজ কর্ম্ম করে, এ সকলের বিস্তৃত পরিচয়-প্রদান অনাবশ্যক। কারণ, উহাদের সহিত আমাদের আখ্যায়িকার কোনও সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বরের পিতা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি নহেন, সুতরাং পয়সার বড়ই খাঁই! পাঁচ শত টাকা নগদ, আটভরির চুড়ি, ছয় ভরির বালা, ও ছয় ভরির গলার হেঁসোহার কন্যার জন্য ক্ষিতীশকে দিতে হইবে, এই সর্ত্তে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল।

এখন কথা হইতেছে, ক্ষিতীশ এ সকল অর্থের সঙ্কুলান করিল কোথা হইতে? বলা বাহুল্য, চন্দ্রা এই বিবাহের ব্যয়ের সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। সে আপনার অমায়িক ব্যবহার ও সরলতার গুণে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার বিদ্যার প্রভাবে, অনেক ভদ্রমহিলার প্রিয়পাত্রী হইয়াছিল। সে দ্বারে দ্বারে গিয়া, আপনার নিকট-আত্মীয়ের কন্যাদায় জানাইয়া, প্রয়োজনমত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল। চন্দ্রার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া, সকলেই মুক্তহস্তে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিছু টাকার অপ্রতুল হওয়ায়, সে তাহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে সে অভাব পূর্ণ করিয়াছিল। অন্নপূর্ণা সকল কথাই জানিত; সে যখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্য তরকারি কুটিতে-ছিল, ময়দা মাখিতেছিল, তখন এক একবার লজ্জা ও ঘৃণায় তাহার বুকখানা ফাটিয়া যাইতেছিল; সে ভাবিতেছিল, "একটা বেশ্যার সাহায্য লইয়া তবে আমার কন্যার বিবাহ হইতেছে; ভগবান! ইচ্ছাময় তুমি, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াইবে? কিঙ্করীর এইমাত্র প্রার্থনা, যেন আমার অভাগিনী কন্যা সুখী হয়!"

এইবার কন্যাসম্প্রদানের সময় উপস্থিত হইল। ক্ষিতীশ সমাদরে বরকে দালানের উপর লইয়া গেল। চন্দনে ও চেলীর জোড়ে ভূষিতা টুক্‌টুকে শিষ্ট মিষ্ট নোলক নাকে মেয়েটী সম্প্রদানের স্থলে নীতা হইল। এমন সময় বরকর্ত্তা ক্ষিতীশকে বলিলেন, "বেই মশায়, টাকাটা এই সময়"—ক্ষিতীশ বুঝিল; বলিল, "সে জন্য চিন্তা কি বেই মশায়! টাকা এইখানে মজুত আছে, গণিয়া লউন।" সত্য সত্যই সম্প্রদানের দানসামগ্রীর পার্শ্বেই একটি থালায় পাঁচ শত টাকা ঢালা ছিল। হরি, হরি, সে টাকা কোথায় গেল? কে লইল? চুরি হইল না কি?

থালা শুদ্ধ সে টাকা অদৃশ্য হইয়াছে। দুর্ভাগ্য ক্ষিতীশ!

বরকর্ত্তা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জুয়াচুরি! জুয়াচুরি! জুয়াচোরের মেয়ের সহিত আমার ছেলের বিবাহ কখনই দিব না।" চারি দিকে কোলাহল উত্থিত হইল, সাধে

বিষাদ ঘটিল, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ, কৌতূহলপরবশ হইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া একত্রিত হইলেন। ক্ষিতীশ নির্ব্বাক-নিঃস্পন্দ, হতাশের করাল ছায়ায় মুখমণ্ডল আবৃত। কেহ বলিলেন, "চোর ধরিতেই হইবে।" কেহ বলিলেন, "পুলিসে খবর দেওয়া হোউক্!" আবার অস্ফুটস্বরে কে যেন বলিল, "ও সব চালাকি। চোখের উপর থেকে টাকাটা উড়ে যায়—এ কি একটা কথা! তবে যদি এখানে হোসেন খাঁ উপস্থিত থাকে ত' বলিতে পারি না!"

ভালমন্দ পাঁচরকম লোকে পাঁচরকম মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্ষিতীশ বধির,—তাহার কাণে সে সকল কথা স্থান পাইতেছিল না; সে মনে মনে বলিতেছিল, "পৃথিবী দ্বিধা হও, আমি তোমার কোলে আশ্রয় লই।" এই ভাবে এক ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। এইবার বরকর্ত্তা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না, বর লইয়া চলিলাম।" অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনের মৃদুরোল শোনা যাইতে লাগিল।

এমন সময় একজন প্রিয়দর্শন মাড়োয়ারী যুবক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহার মাথার টুপিটী, গায়ের বেলদার পাঞ্জাবিটি, বুকে বাঁধা বেণারসী চাদরখানি, পায়ের লপেটা জুতা-জোড়াটি, বেশ সুন্দর মানাইয়াছিল। সুন্দর দেখিলে কে না তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়? নবাগত মাড়োয়ারী যুবকের মুখের পানে সকলেই চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সে কাহারও সহিত কথা না কহিয়া, ক্ষিতীশকে ডাকিয়া লইয়া একটু নির্জ্জনে গিয়া

বলিল, "ক্ষিতীশ! আমার ছদ্মবেশ বোধ হয় তোমার চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারে নাই। তোমার কন্যার শুভ বিবাহ কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইতেছে কি না, এ সংবাদ লইবার জন্য আমি লোক নিযুক্ত রাখিয়াছিলাম। তাহারই মুখে শুনিলাম, দানের পাঁচ শত টাকা চুরি গিয়াছে, বরকর্ত্তা বর লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত। এ খবর পাইয়া আমি ছুটিয়া আসিয়াছি। এই লও পাঁচ শত টাকা। চিন্তা করিও না, শীঘ্র গিয়া কন্যাদায় হইতে মুক্ত হও।"

বলা বাহুল্য, ছদ্মবেশী মাড়োয়ারী যুবক আমাদের চন্দ্রা!

ক্ষিতীশ আনন্দে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠিল, "চন্দ্রা! তুমি কি দেবী?"

চন্দ্রা হাসিয়া উত্তর দিল, "ক্ষিতীশ! আমি দেবী নই, আমি পিশাচী। আমি আমার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

ক্ষিতীশ এ কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। চন্দ্রার চন্দ্রানন ক্ষণকাল ধরিয়া তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। চন্দ্রা কহিল, "আমার কথা বুঝিতে পারিতেছ না? এতদিন তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা আজ ঘুচিয়া গেল। তুমি সংসারী, তোমার স্ত্রী সতী সাধ্বী, পূর্ব্বজন্মে বহু পুণ্যফলে অমন সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়াছ। যদি মঙ্গল চাও, যদি আপনার ইষ্ট কামনা কর, তাহা হইলে তাহার প্রাণে আর ব্যথা দিও না। আমি আর তোমার পথের কণ্টক হইব না।"

বিনা মেঘে মাথায় বজ্রাঘাত পড়িলে মানুষ যেরূপ হইয়া যায়, ক্ষিতীশের অবস্থা ঠিক তাহাই হইল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে চন্দ্রার পদতলে পতিত হইল। চন্দ্রা তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া দাঁড় করাইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়! আকাশে-সপ্তমীর চাঁদ ক্ষীণ জ্যোতিঃ ছড়াইতেছিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডমেঘ ভাসিয়া ভাসিয়া অনন্তের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছিল। মিটী মিটী নক্ষত্র জ্বলিতে-ছিল। বসন্তের বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছিল। প্রকৃতি নীরব, ক্ষিতীশ নীরব, চন্দ্রা নীরব। পেচক বিকটস্বরে সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, মূর্ত্তিমান পাপী ও পাপিনীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়া পাক্‌সাট্ মারিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষিতীশ বলিল, "আমার একটী কথার উত্তর দাও; তুমি এখন কি করিবে?"

চন্দ্রা অবিচলিতভাবে উত্তর দিল, "আমার জন্য ভাবিও না; যে স্ত্রীলোক স্বামীর পদচ্যুত হইয়া একদিনের জন্যও অপর পুরুষের আশ্রয় লয়, তাহার আকাঙ্ক্ষা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অতৃপ্ত থাকে। নিত্য নূতনে আকিঞ্চন তাহার জাতীয় ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। মৃণালের সুতা যেমন যত টানা যায়, ততই বাড়িয়া যায়, সেইরূপ চরিত্রহীনা রমণীর কুপ্রবৃত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমি পাপের পথে পা দিয়াছি, শেষ কোথায়—একবার দেখিব। আমার সহিত আর তুমি সাক্ষাৎ করিও না।" দ্রুত-পদবিক্ষেপে চন্দ্রা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্ষিতীশ একবার আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল,—সপ্তমীর চন্দ্র মেঘে আবৃত; তার পর আপনার মেঘভরা বুকের ভিতর উঁকি পাড়িল,—দেখিল বড় অন্ধকার! অমাবস্যার অন্ধকার তত মসীময় নহে; প্রলয়ের অন্ধকার তত ভয়াবহ নহে!

সে অন্নপূর্ণার মুখখানি একবার কল্পনার চক্ষে দেখিল; নিরাশ্রয় সন্তান সন্ততির তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল; আত্মজীবনের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিল। কাতরপ্রাণে শূন্য পানে চাহিয়া করুণকণ্ঠে ডাকিল, "জগদীশ্বর! যে আমার নয়, যে আমাকে চাহে না, আমাকে লইয়া যাহার প্রাণ পূর্ণ হয় না, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিব কেন? বন্ধুরূপী মহাশত্রু ডাক্তার অনঙ্গমোহনই চন্দ্রাকে হস্তগত করিয়াছে। তোমার মনে যাহা আছে, তাহাই হউক। আমি আজ হইতে স্রোতের তৃণ হইলাম। বল দাও প্রভু! যেন মন স্থির করিতে পারি।" সমস্ত ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়া, ক্ষিতীশ চন্দ্রাপ্রদত্ত পঞ্চাশখানি দশ টাকার নোট ভাল করিয়া গণিয়া লইয়া সম্প্রদানস্থানে উপস্থিত হইল।

অতঃপর উদ্বাহক্রিয়া একরূপ নিরাপদে সম্পন্ন হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। ক্ষিতীশ আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু টাকাটা কে লইল, বা কি প্রকারে অদৃশ্য হইল, তাহার কোনও কিনারা হইল না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

যামিনীভূষণের বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে! বাড়ীর কর্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য দাসী বাঁদীটি পর্য্যন্ত চীৎকার করিয়া কান্না সুরু করিয়াছে। পুরুষ-মহলেও তাই,—যামিনীভূষণের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, দেখাদেখি চাকরবাকর-গুলাও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া নেত্রদ্বয় আরক্ত করিয়াছে। প্রভাত-সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সজনীর গ্রেপ্তারের খবর চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। যামিনীভূষণ নিতাই বাবুকে সঙ্গে লইয়া জামীনের জন্য থানায় গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই! ইন্‌স্‌পেক্টার স্পষ্টই বলিয়াছেন, হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি নিজের দায়িত্বে জামীনে খালাস দিতে পারেন না; বিশেষতঃ, তদন্ত তখনও শেষ হয় নাই।

সজনীর মাতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছিলে কেন? ছেলেটাকে জামীনে খালাস করিয়া আনিবারও তোমার মুরোদ নাই? সংসারে টাকায় কি না হয়! বোধ হয় কিছু টাকা খরচ হইবে বলিয়া গর্ভের সন্তানকে হাজতে পচাইয়া মারিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না।" যামিনীভূষণ কোনও উত্তর করিলেন না; সহধর্ম্মিণীর ক্রোধ-প্রজ্বলিত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সজনীর মাতা আরও জ্বলিয়া

উঠিলেন, স্বর সপ্তমে চড়াইয়া কহিলেন, "অমন ঢং করিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়া—আমরা সব বুঝি। ছেলের উপর তোমার যেরূপ দরদ্, তাহা আর আমার জানিতে বাকী নাই। আমার শেষ কথা,—যদ্যপি সজনীকে আজ বিকালের মধ্যে বাড়ীতে লইয়া আসিতে না পার, তবে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব, মরিব, মরিব।" যামিনীভূষণ আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার ধৈর্য্যের মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া উঠিল; তিনি ধীর গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "এ দুঃখের সময় আর তোমার বাক্যবাণ সহ্য হয় না, ছেলেটীকে আদর দিয়া, তাহার আস্কারা বাড়াইয়া, তাহাকে উৎসন্ন দিলে, এখন তার ফলভোগ করিতে হইবে না?" সজনীর মাতা এইবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ভীষণ ঝঙ্কারে গৃহভিত্তি প্রতিধ্বনিত করিয়া উত্তর দিলেন, "বয়সকালে কে কবে সাধু সন্ন্যাসী হইয়া থাকে, তাহা জানি না! নিজের বিষয়টা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, ও বয়সে তুমি কি ছিলে? হায়! হায়! আমার মুখ চাহিবার কেহই নাই, পোড়া যম কি আমায় ভুলিয়া আছে? এইদণ্ডে আমার মরণ হইল না কেন?" অতঃপর সজনীর মাতা ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া তাঁহার স্বর্গগত পিতার উদ্দেশে দুঃখ জানাইলেন। যামিনীভূষণ আর কোনও কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে বহির্ব্বাটীতে নামিয়া আসিলেন। তখন দশটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী ছিল। তাড়াতাড়ি গাড়ী জুতাইয়া পুলিস আদালতে উপস্থিত হইলেন। নিতাই বাবুকে ইতিপূর্ব্বেই পাঁচ হাজার টাকার চেক কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তিনি পুলিসকোর্টের সমস্ত নামজাদা উকীল ও হাইকোর্টের দুই জন খ্যাতনামা কৌন্সুলি, সজনীর পক্ষসমর্থনের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পুলিস আদালত আজ সরগরম! যথাসময়ে মোকদ্দমা উঠিল। ইন্‌স্‌পেক্টার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে জানাইলেন, "অদ্য প্রাতে হাঁসপাতাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সে স্ত্রীলোকটীর মৃত্যু হইয়াছে। 'চার্জ্জসিট্' পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; সুতরাং অদ্যকার মত মোকদ্দমা মুলতুবী হউক"। আসামী পক্ষের উকীল কৌন্সুলিগণ ইহাতে আপত্তি করিলেন না, তবে জামীনের প্রার্থনা করা হইল। অনেক তর্ক বিতর্ক, অনেক বাদানুবাদের পর পঞ্চাশ হাজার টাকার জামীনে সজনীকে আপাততঃ মুক্তি দিবার আদেশ প্রদত্ত হইল।

গাড়ীতে উঠিয়াই সজনী নিতাইবাবু ও যামিনীভূষণের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমায় রক্ষা করুন। আর আমি বাড়ী হইতে এক-পা বাহির হইব না।" যামিনীভূষণ নীরব। নিতাইবাবু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "তুমি অত কাতর হইতেছ কেন হে? তোমার বাপ কলিকাতা-সহরের এক জন গণ্যমান্য ধনাঢ্য ব্যক্তি,—তুমি তাঁহার একমাত্র সন্তান। একটা দোষ করিয়া ফেলিয়াছ বলিয়া তাহার কি মার্জ্জনা নাই?"

হায় রে অর্থ! ধন্য তোমার মোহিনীশক্তি! তুমি যাহার লোহার সিন্দুকের ভিতর থাক, সে অন্য কাহাকেও তোমার

অস্তিত্বের গুণে তাহার প্রিয়জনবর্গের সহস্র অমার্জ্জনীয় অপরাধ সমাজের চক্ষে গুণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতঃপর নিতাইবাবু যামিনীভূষণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আজ তিন হাজার টাকার উপর খরচ হইয়া গিয়াছে। যেরূপ বুঝিলাম, মোকদ্দমা এখন অনেক দিন চলিবে। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পুলিস আদালতে হইতে পারে না। ম্যাজিষ্ট্রেট্ এ মোকদ্দমা সেসনে 'কমিট্' করিতে বাধ্য। তুমি চিন্তা করিও না, আমাদের যত দূর সাধ্য, আমরা করিব। তবে কিছু খরচ করিতে হইবে।"

যামিনীভূষণ বলিলেন, "মোটের উপর কত টাকা খরচ হইবে বোধ হয় ?"

নিতাই বাবু। পুলিসকোর্টে মোকদ্দমা আট দশ দিন চলিবে। প্রত্যেকদিন অন্ততঃ তিন হাজার টাকা করিয়া ব্যয় হইবে, তার পর সেসন্ কোর্টে পাঁচ ছয় দিনের কম যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়, আমার এরূপ মনে হয় না। যদি সজনীকে বাঁচাইতে হয়, তবে হাইকোর্টের অধিকাংশ নামজাদা ব্যারিষ্টারগুলিকে 'এন্‌গেজ' করিতে হইবে। তথাকার দৈনিক খরচা দশ হাজার টাকার ন্যূন হইবে না। ইহার জন্য তোমায় প্রস্তুত হইতে হইবে।

যামিনীভূষণ হিসাব করিয়া খতাইয়া দেখিলেন, সজনীকে বাঁচাইতে হইলে তাঁহাকে একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। কিন্তু উপায় নাই! যদি সমাজ মানিয়া চলিতে হয়, তবে অর্থের মায়া ত্যাগ করিয়া সজনীকে রক্ষা করিতে হইবে। আবার যদি সংসারে থাকিতে হয়, গৃহের সুখ ও শান্তি বজায় রাখিবার

জন্য—সজনীর উদ্ধারকল্পে শেষ কাণাকড়িটী পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে হইবে।

যামিনীভূষণের মনে হইল, এরূপ হতভাগ্য সন্তানের সূতিকা-গৃহে মৃত্যু হয় নাই কেন ?

এইবার নিতাই বাবুর আফিসের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিল। তিনি যাইবার সময় যামিনীভূষণকে বলিয়া গেলেন, "আজকের মধ্যে বিশহাজার টাকার একখানা চেক আমাকে পাঠাইয়া দিও। আর কাল বেলা দশটার মধ্যে সজনীকে লইয়া পুলিসকোর্টে উপস্থিত হইও।"

যামিনীভূষণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, "পাঁচ হাজার কোঁটা দেহের রক্ত আজ প্রাতে দিয়াছি ; রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই আবার বিশ হাজার কোঁটা দিতে হইবে। আরও কত দিতে হইবে, কে জানে ? এ ভগ্ন শরীরে কত শোণিত আছে—কত যোগাইতে পারিব ?"

অতঃপর দশ বারো দিন ধরিয়া পুলিসকোর্টে মোকদ্দমা চলিল। শেষ দিন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব সজনীকে সেসনে সোপর্দ্দ করিলেন। কৌন্সুলি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, বিলম্ব না করিয়া উচ্চ আদালত হইতে সজনীর জামীনের হুকুম লইয়া আসিল।

এইবার সেসন্ কোর্টে মামলা আরম্ভ হইল। প্রায় সমস্ত বড় বড় কৌন্সুলি সজনীর পক্ষে। প্রকৃত অর্থের শ্রাদ্ধ যাহাকে বলে, তাহাই হইল। এক একটা সাক্ষীর একদিন দুইদিন ধরিয়া

জেরা চলিতে লাগিল। প্রধান প্রধান দু' এক জন সাক্ষীর জবান-বন্দি একটু এদিক ওদিক হইয়া গেল। পরিশেষে জুরীরা সজনীকে "Benefit of the doubt" দিবার জন্য জজ সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। জজ সাহেব জুরীগণের সহিত একমত হইয়া সজনীকে অব্যাহতি দিলেন।

সজনীকে লইয়া যামিনীভূষণ বাটীতে উপস্থিত হইয়া এক প্রকার বিকৃত হাস্যের সহিত বলিলেন, "যাও, তোমার মার সহিত দেখা কর। তাঁহাকে বলিও, আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি, কিন্তু আমি সর্ব্বস্বান্ত; বসৎবাড়ী, ভাড়াটিয়া বাড়ী, সখের বাগান, সমস্তই বাঁধা পড়িয়াছে। রোজগার করিবার সামর্থ্য আর আমার নাই; সুতরাং ঋণ-পরিশোধের উপায়ও আর নাই। খোলার ঘরে বাস করিবার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে বল।"

সজনী মাসাবধি প্রতিমুহূর্ত্তে চোখের উপর ফাঁসিকাঠের বীভৎস দৃশ্য দর্শন করিতেছিল, ভাল করিয়া খায় নাই, হাসে নাই, ঘুমায় নাই। সে যে আবার স্বাধীন বায়ু সেবন করিবে, মুক্ত আকাশতলে অবাধে বিচরণ করিবে, এ আশা তাহার ছিল না। সে যে মুক্তি পাইয়াছে, এই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। যামিনী-ভূষণের কি হইল না হইল, ভবিষ্যতে তাঁহাকে খোলার ঘরে বাস করিতে হইবে কি না, এ সকল চিন্তা করিবার সময় এখনও তাহার উপস্থিত হয় নাই। সে তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল।

যামিনীভূষণ আপনার বৈঠকখানায় গিয়া অবসাদগ্রস্ত দেহভার লইয়া চিন্তার তরঙ্গে আলোড়িত হইতে হইতে শুইয়া পড়িলেন।

তাঁহার মাথার ভিতর কে যেন লোহার হাতুড়ী জোরে জোরে আঘাত করিতে লাগিল। মস্তিষ্কের সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত হইয়া টগ্ বগ্ করিয়া ঘৃতের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। যায়—যায়—মাথার খুলিটা বুঝি ফাটিয়া যায়! যামিনীভূষণ উঠিয়া বসিলেন। অনন্ত নিদ্রায় তাঁহার দুই চক্ষু যেন আবৃত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার কই! তাঁহার চোখের উপর দিয়া চিত্রপটের ন্যায় এক এক করিয়া অনেকগুলি জীবন্ত মূর্ত্তি চলিয়া যাইতে লাগিল। কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ ভ্রূকুটী ভ্রূভঙ্গ দেখাইতেছে, কেহ বা বিদ্রূপ করিতেছে। উদ্ভ্রান্তচিত্ত যামিনীভূষণ স্পষ্ট দেখিলেন, তাঁহার দুর্দ্দশাগ্রস্ত চিরহতভাগ্য বিধিবিড়ম্বিত কনিষ্ঠ সহোদর নলিনী হাসিতে হাসিতে একখানি গভীর কৃষ্ণবর্ণের যবনিকা ধীরে ধীরে তুলিয়া ধরিল! সবিস্ময়ে যামিনীভূষণ প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার অভ্যন্তরে কেবল অন্ধকার! ভীষণ অন্ধকার! স্বচ্ছ, তরল, অন্ধকার! নিবিড় তমোরাশির উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ সফেন সমুদ্র যেন তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য বিকট মুখব্যাদান করিয়া অগ্রসর হইতেছে!

যামিনীভূষণ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। এইবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন! কক্ষমধ্যে ঘন ঘন পদচারণা করিতে লাগিলেন।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "জলখাবার প্রস্তুত হইয়াছে, মা-ঠাকরুণ আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" যামিনীভূষণ

উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "চুপ চুপ—জল-খাবারের কথা মুখে আনিস্ না! আমায় দুটী মুড়ি মুড়কী এনে দে।"

ভৃত্য কিছু বুঝিতে না পারিয়া যারপরনাই আশ্চর্য্য হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া খবর দিল, "বাবু বলিলেন—জলখাবার তিনি খাইবেন না, তাঁহাকে দুটী মুড়ি মুড়কী আনাইয়া দেওয়া হউক।"

সজনীর মাতা যে সমস্ত জলখাবার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ভৃত্যের দ্বারা সে সকল বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন। যামিনীভূষণ সে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী দেখিয়াই চমকিত হইয়া ভৃত্যকে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে তুই ক'রেছিস্ কি? এই সব জিনিস নষ্ট করতে এনেছিস্? দাঁড়া,—দাঁড়া, যত্ন করে রেখে দি! দুদিন পরে যখন খিদের চোটে প্রাণ যাবে, তখন এই সব সামগ্রী একটু একটু করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে খাব!" এই বলিয়া দাম্ভিক যামিনীভূষণ আপনার কোঁচার খুঁটে সমস্ত ফলমূল মিষ্টান্ন ঢালিয়া ভাল করিয়া বাঁধিতে লাগিলেন!

বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে? যামিনীভূষণের মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার সূচনা হইল।

ইহলোকের দণ্ড যদি ইহলোকেই পাইবার প্রথা থাকে, তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। আরও ভয়াবহ লোমহর্ষণ চিত্র দেখিবার জন্য পাঠকগণকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

"এই ত' সেই পুণ্য তপোবন! পতিতের জুড়াইবার স্থান কি এখানে মিলিবে না? পতিতপাবন! সে তোমারই ইচ্ছা!"

মর্ম্মচ্ছেদকর একটী তপ্তশ্বাসের সহিত এই কথা বলিয়া অনুতপ্ত নলিনী একবিন্দু অশ্রু মুছিল।

অনুতাপীর উষ্ণ অশ্রু;—অলক্ষ্যে এক জন সে অশ্রু দেখিল।

নির্জ্জন গম্ভীর পার্ব্বত্যপ্রদেশ; হিমালয়েরই একটী অংশ—আল্‌মোরা পাহাড়! প্রকৃতির পবিত্রতা ও নীরবতার পূর্ণ সম্মিলন। শান্তি, সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তায় স্থানটী আপনা হইতেই যেন একটী আশ্রমে পরিণত! উপরে অনন্ত নীলাকাশ—উন্মুক্ত উদার নির্ম্মল; নিম্নে লতা-গুল্ম-উপলখণ্ড-পরিবৃত, সংসার-কোলাহলপরিশূন্য, সুবিস্তৃত পার্ব্বত্যপ্রদেশ! সাধনার উপযুক্ত স্থান! ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের পবিত্র নামে তাঁহার সেবকগণ কর্ত্তৃক এই শৈলবক্ষে একটী মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

ত্রিতাপজ্বালায় প্রপীড়িত, ইন্দ্রিয়-তাড়নায় লক্ষ্যভ্রষ্ট নলিনী শূন্যমনে আজ এখানে উপস্থিত। কে যেন তাহাকে কুহকমন্ত্রে এখানে টানিয়া আনিয়াছে; প্রেমহীন অন্তর, ভারবহ হৃদয়, লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত নিরাশপ্রাণ যুবক প্রতিক্ষণে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতেছে।

পথশ্রান্ত নলিনী একটী প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িল।

তখন বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। সূর্য্য-রশ্মি ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতেছিল। চারি দিক হইতে খণ্ড খণ্ড মেঘ—পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিয়া একত্র জমাট বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল। বুঝি এক পশ্‌লা ঢালিবার প্রয়াস!

বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রতরঙ্গ যেমন প্রবলবেগে গর্জ্জন করিতে করিতে একটীর গায়ে আর একটী আসিয়া পড়ে, সেইরূপ নলিনীর মনোরাজ্যে বিশৃঙ্খল চিন্তা-তরঙ্গ উপর্য্যুপরি আসিয়া ঘাতপ্রতিঘাত করিতে লাগিল।

একে—একে—একে—সকল কথা, সকল ব্যথা, সকল সুখ, সকল দুঃখ, সকল স্মৃতি কঠোর বৃশ্চিকদংশনের ন্যায়—তাহাকে কাতর করিয়া তুলিল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না, আপন মনে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আর কেন? মরিলেই ত' সকল যন্ত্রণার অবসান হয়! এ দুর্ব্বহ জীবনে কি প্রয়োজন?"

নলিনীর অবসাদগ্রস্ত প্রাণ হইতে প্রতিধ্বনি উঠিয়াই হউক, অথবা সেই বিরাট, বিশাল, মৌন, স্থির, গম্ভীর, পবিত্র পার্ব্বত্যরাজ্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা নলিনীর ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্যই হউক,—নলিনী স্পষ্ট শুনিল,—কে যেন তাহার কাণে কাণে মধুর বীণাবিনিন্দিত স্বরে বলিয়া গেল,—"আছে—এ জীবনেরও প্রয়োজন আছে! কিছুই মিথ্যা নয়! তোর দ্বারাও পৃথিবীর অনেক কাজ হইবে!"

নলিনী স্তব্ধ হইয়া লুব্ধ ও বিমুগ্ধ প্রাণে আকাশের পানে

চাহিয়া রহিল। আবার এক ফোঁটা জল;—আবার অনুতাপীর হৃদয়মথিত রক্ত রূপান্তরিত হইয়া চোখ দিয়া ফাটিয়া বাহির হইল। স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গেল।—অন্তর্য্যামী অন্তর আলোকিত করিলেন। একটী ক্ষুদ্র ঘটনা উপলক্ষ করিয়া পতিতপাবন পতিতের সহায় হইলেন।

টিপ্‌-টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নলিনী ভাবিল, "আর এখানে অপেক্ষা করিয়া ফল কি? রামকৃষ্ণাশ্রম কোথায় অবস্থিত, খুঁজিয়া লইয়া তথায় উপস্থিত হই।"

অনতিদূরে পাহাড়ের উপর হইতে একটি পাহাড়িয়া বৃদ্ধা রমণী কাঠের বোঝা লইয়া ধীরে ধীরে নামিতেছিল। হঠাৎ বৃদ্ধার পদস্খলন হইল, সে পড়িয়া গিয়া গড়াইতে আরম্ভ করিল, তাহার যত্নে-সংগৃহীত কাঠগুলি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। চমকিত নলিনী চকিতভাবে—এ দৃশ্য দেখিতে-না-দেখিতে—দেখিতে পাইল, সহসা কোথা হইতে তীরবেগে একটি লোক সেখানে ছুটিয়া আসিয়া অতিক্ষিপ্রগতিতে বৃদ্ধাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহার অচৈতন্য দেহ স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া গমনোন্মুখ হইল। নবাগত ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ, পরিধানে গৈরিক বসন, দেহ বলিষ্ঠ, মুখ উৎসাহে ভরা। নলিনীকে দেখিবামাত্র তিনি নিঃসঙ্কোচে বলিয়া উঠিলেন, "বাহবা ছোকরা! তুমি কোন্ দেশী লোক হে? তমন যোয়ান বয়স, জাঁকাল চেহারা,—তোমার চোখের সামনে এই বুড়ীটা মরিতে বসিয়াছিল, তুমি তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা না করিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলে কি

করিয়া ? এখন এস, আমাকে সাহায্য কর।” অনুগত ভৃত্য যেমন প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া আদেশ পালন করে, নলিনী ঠিক সেই মতই করিল; বৃদ্ধাকে তুলিয়া ধরিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সন্ন্যাসীর অনুগমন করিল। মনে মনে বলিল, “এই ত কাজ পাইয়াছি! বুঝিলাম, এ জীবনেরও প্রয়োজন আছে।”

পাহাড়ের উপর একটী আশ্রম পরিদৃষ্ট হইল। বলা বাহুল্য, ইহাই ‘রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম’। মুমূর্ষু বৃদ্ধার বাহকদ্বয় সেই সেবাশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইতে না হইতে, আরও দুই তিন জন সন্ন্যাসী অতি আগ্রহের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হে নিরঞ্জন, ব্যাপার কি ?”

সকলেই সন্তর্পণে ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধাকে নামাইলেন। জিজ্ঞাসিত সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, “মহারাজ! এই বৃদ্ধা জীবিতা আছে কি না, অগ্রে তাহা দেখুন। কাঠের বোঝা লইয়া পাহাড় হইতে নামিতেছিল, পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া গিয়াছে।”

“হাঁ, এখনও প্রাণ আছে। বলো, ‘জয় গুরু মহারাজকী জয়!’ সমস্বরে সকলে জয়ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের অলক্ষ্যেও সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠিল, “জয় গুরুমহারাজকী জয়।” পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে সে ধ্বনি ঝঙ্কৃত হইল—“মহারাজ!” বিমানে তাহার রেশ্‌ উঠিল—“রাজ!” এখন এই ‘মহারাজ’—‘রাজ’—‘গুরু’—এই তিন ধ্বনির সমষ্টিতে নলিনীর মনের ভিতরও কেমন যেন একটা ওলট-পালট হইয়া গেল।

তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, চোখে জল আসিল। ভাবিল, "এইবার ঠিক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। যাঁহার পদচ্ছায়া কল্পনা করিয়াও পঙ্কিল মন নির্ম্মল হয়, যাঁহার পবিত্র নাম-স্মরণে ঘোর অন্ধকারেও দিব্যজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে, সংসার-সাগরে যাঁহার পদতরীই একমাত্র ভরসা, সেই ভগবান রামকৃষ্ণের সেবাশ্রমে আসিয়াছি। হায়! ত্রিতাপজ্বালায় তপ্ত হতভাগ্যের স্থান হেথায় মিলিবে না কি?"

মঠাধিকারীর নাম স্বামী বিমলানন্দ। তাঁহার আদেশমত অন্যান্য সন্ন্যাসীরা বৃদ্ধার মূর্চ্ছিত দেহ লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। নলিনীর পরিচয় গ্রহণ করিয়া স্বামীজি বলিলেন, "তোমার বিষয় আমি সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি; তুমি মস্ত ঘরোয়ানা লোকের ছেলে; তোমার মতিগতি অমন হইল কেন? শুনিতে পাই, আমাদের বেলুড় মঠের উৎসবে এবং অন্যান্য সৎকার্য্যেও তুমি মুক্তহস্ত, কিন্তু কুসঙ্গে পড়িয়া তোমার প্রবৃত্তি কুপথগামী হইয়াছে।—যাক্, সে সকল কথা পরে হইবে; এখন জিজ্ঞাসা করি তুমি কি করিতে চাও? এখানে কি তোমার মন টিকিবে?"

নলিনী উত্তর করিল, "সে—সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।"

স্বামী।—তাঁহার বিধানে তুমি বিশ্বাস কর?

নলিনী।—না করিয়াই বা করি কি? একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে করিবেন না। আপনারা কি পীড়িতের শুশ্রূষা, অনাথকে আশ্রয়দান, অনুতপ্তকে সান্ত্বনা-

প্রদান, এই সব উচ্চকার্য্য জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছেন? ইহাতেই কি ভগবানের দর্শনলাভ হয়?

স্বামি।—(সহাস্যে) সে অনেক দূরের কথা;—কিন্তু তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, ঐ যে অসহায়া মুমূর্ষু বৃদ্ধার প্রাণরক্ষা হইল, উহাতে কি তুমি কিছুমাত্র আত্মপ্রসাদ পাও নাই?

নলিনী।—প্রচুরপরিমাণে পাইয়াছি। এই নিঃস্বার্থ সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়া আপনারা দেবপদবাচ্য হইতেছেন।

স্বামী।—দেবপদবাচ্য হইবার আকাঙ্ক্ষাও নাই, সাধও নাই; তবে বিক্ষিপ্ত মনকে সংসারের কোলাহল হইতে কুড়াইয়া আনিয়া একটা উচ্চকার্য্যে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা পাইতেছি বটে। এই ভাব পরিপক্ক হইলে, মন ভগবানের ধ্যানচিন্তার উপযোগী হইবে;—একেবারে ত সে উচ্চভাব আসিবে না।

"কিন্তু হায়! আমি যে পতিত!" এই কথা বলিতে বলিতে নলিনীর সেই সুন্দর সুকোমল গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্বামিজী সাগ্রহে ও সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি? এমন দিব্যবস্তু তোমার রহিয়াছে,—কাঁদিতে তুমি শিখিয়াছ, অমৃতের অধিকারী যে তুমি? 'পতিত' বলিয়া যখন আপনাকে বুঝিয়াছ,—তখন অবশ্যই তুমি সেই পতিতপাবনের কৃপালাভ করিবে। এখন চল, তোমাকে ঠাকুরের মন্দিরে লইয়া যাই।"

নলিনী বলিল, "ক্ষমা করিবেন, আরও দুই একটি কথা

আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে। আপনিই কি এই আশ্রমের কর্ত্তা ?”

স্বামীজী প্রথমে একটু হাসিলেন ; পরে স্বভাবতঃই তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া আসিল ; তিনি উত্তর দিলেন, “কর্ত্তা ? কর্ত্তা কে ? কর্ত্তা সেই জগৎকর্ত্তা—স্বয়ং শ্রীহরি। আমরা তাঁহার আজ্ঞাবাহক ভৃত্যমাত্র। যে মূর্খ, যে হতভাগ্য কর্ত্তা হইবার অভিমান রাখে, তাহার কোনও কর্ম্মে অধিকার নাই।”

নলিনী।—আশ্রমের সকলেই তবে আপনাকে ‘মহারাজ’ সম্বোধন করিলেন কেন ?

স্বামী।—সন্ন্যাসীর এই সম্মান ভারতে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। ত্যাগের জন্যই এই সম্মান ; তবে আমরা আজও সেই ত্যাগের সম্পূর্ণ আদর্শ দেখাইবার যোগ্য হইতে পারি নাই।

নলিনী।—অধমকে এমন উত্তরদানে লজ্জিত করিবেন না ; আমি কেবলমাত্র জিজ্ঞাসুর ভাবে এমন প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলাম। নচেৎ আপনারা যে ত্যাগের ছবি জগতে দেখাইয়া আসিতেছেন, নরলোকে তাহা দুর্লভ।

স্বামী।—ঠাকুর বলিতেন,—‘কামিনীকাঞ্চন’ ত্যাগই ত্যাগ ; সন্ন্যাসীর এই দুই দ্রব্য স্পর্শ করা দূরে থাক,—স্ত্রীলোকের চিত্রপট দেখাও নিষিদ্ধ ; কিন্তু যুগধর্ম্মে তাহা পারিতেছি কই ? কলিতে অন্নগতপ্রাণ, গৃহীর অর্থসাহায্যও লইতে হয়, আবার মাতৃরূপিণী মহিলার মানও বাঁচাইতে হয়।

নলিনী।—পরমহংসদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ত' আপনার গুরু ?

স্বামী।—তিনি জগতের গুরু—নররূপী নারায়ণ।

নলিনী।—এই চর্ম্মচক্ষে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় ?

স্বামী।—তাঁহার কৃপায় না হয় কি ? তাঁহার কটাক্ষে অসম্ভব সম্ভব হয়।

নলিনী।—কিন্তু তিনি ত' দেহরক্ষা করিয়াছেন,—তবে——

নলিনীর কথা শেষ হইতে না হইতে স্বামিজীর উজ্জ্বল মুখ-মণ্ডল সহসা কেমন এক অপূর্ব্ব ও অলৌকিক ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইল, কণ্ঠস্বর উচ্চ গ্রামে উঠিতে লাগিল, জ্বলন্ত বিশ্বাসের জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি বলিতে লাগিলেন,—"কি বলিলে ?—ঠাকুর দেহরক্ষা করিয়াছেন ? কোন্ মূর্খ তোমাকে এমন কথা বলিয়াছে ? তাঁহার আবার দেহরক্ষা—জনম-মরণ ? ওই—ওই দেখ, সেই দীনহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বেশী নররূপী নারায়ণ—কাঙ্গালের ঠাকুর—ভক্তের ভগবান্—সর্ব্বত্র বিহার করিতেছেন ! জীবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া—কৃপাকণা বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছেন ! এই গৃহের কোণে—ঐ প্রাচীরের অন্তরালে কাণ পাতিয়া আমাদের কথা শুনিতেছেন, আর আপনার মনে হাসিতেছেন ! তিনি নাই,—এমন ভাব কে তোমার মাথায় প্রবেশ করাইয়াছে ? বিশ্বাসীর কাছে তিনি নিত্য—সত্য—ধ্রুব—চির-বিদ্যমান,—অবিশ্বাসীর পক্ষে কিছুই নয় বটে ! তর্কে প্রয়োজন নাই, তুমি তোমার বিশ্বাসবলে—সুকৃতীবলে—আপন প্রাক্তনবলে—সেই সত্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দের

শ্রীপাদপদ্ম আঁকড়াইয়া ধরিয়া মনুষ্য-জন্ম সফল কর। বল—জয় শ্রীরামকৃষ্ণ !”

ইন্দ্রিয়-সেবারত—মলিনাত্মা—কুঞ্চিতপ্রাণ নলিনী সহসা যেন নববলে বলীয়ান হইয়া সুপ্ত সিংহের ন্যায় জাগিয়া উঠিল ; স্বামিজীর সহিত সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—“জয় শ্রীরামকৃষ্ণ ! জয় শ্রীরামকৃষ্ণ !! জয় শ্রীরামকৃষ্ণ !!!”

আবেগে—অনুরাগে—আত্মবিহ্বলতায়—নলিনী সন্ন্যাসীর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিল, তাহার নবজীবন লাভ হইল। বলিতে পারি না,—বুঝি তাহার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিল ! সে ঊর্দ্ধবাহু ও ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি হইয়া বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “পতিত-পাবন ! এই যে তুমি আমার সম্মুখেই উপবিষ্ট ! গুরু-মহারাজ ! ভক্তের ভগবান ! কাঙ্গালের ঠাকুর ! এই যে তুমি স্বয়ং এই মহাপুরুষের মধ্যেই পূর্ণরূপে বিকাশ পাইতেছ ! এই আমি তোমায় স্পর্শ করিলাম, আমার বুকের সমস্ত উত্তাপ নিবিয়া গেল !”

অতঃপর স্বামিজী নলিনীকে ঠাকুরের মন্দিরে লইয়া গেলেন। সিংহাসনোপরি মাল্যচন্দনবিভূষিত ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আপনার দেবমূর্ত্তি—পটে অঙ্কিত রাখিয়া সহস্র রাজ্যেশ্বরের সৌন্দর্য্যেও লজ্জা দিয়া শোভা পাইতেছিলেন। সবে-মাত্র ঠাকুরের আরতি হইয়া গিয়াছে। ধূপের ধূম তখনও নিঃশেষ হয় নাই—তাহার মধুর সুবাস তখনও আকাশে বিলীন হয় নাই, রাশি রাশি নানা বর্ণের পুষ্পরাজি—চন্দনে মাখামাখি হইয়া ঠাকুরের পায়ে লুটাপুটি

খাইতেছিল। অজানিত—অপ্রত্যাশিত—অননুভূত—মধুর—গম্ভীর—পবিত্র সঙ্গীতের ধ্বনি মন্দিরের প্রত্যেক ভিত্তিগাত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ভক্তি-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে নলিনী সিংহাসনতলে লুটাইয়া পড়িয়া বারবার প্রণাম করিল।

সংসারের তাড়না—ভ্রাতার ছলনা—কপট বন্ধুত্বের হলাহল—অভিনেত্রীর রূপ—ঝুটা মানের কোলাহল—সে শুভমুহূর্ত্তে তাহার মন হইতে একেবারে মিলাইয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষিতীশের সহিত চন্দ্রার এখন আর কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই। সে দিবসে ধাত্রীর কার্য্য করে, রাত্রে ডাক্তার অনঙ্গ-মোহনের শয্যাসঙ্গিনী হয়। যত দিন যাইতেছে, চন্দ্রা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছে, যে—কিছুদিন পূর্ব্বে অনঙ্গমোহন তাহাকে যে চক্ষে দেখিত, যেরূপ আদর ও যত্ন করিত, যেরূপ ভালবাসার ভান দেখাইত, এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নেহাৎ না আসিলে নয়, তাই রাত্রে এক একবার আসে;—নেহাৎ দুটো কথা না বলিলে ভাল দেখায় না, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বে কথা তৈয়ারী করিয়া কয়। নিত্য কলহ, নিত্য কথাকাটাকাটি, নিত্য তীব্র ভৎর্সনা, এখন চন্দ্রার অঙ্গের আভরণ হইয়াছে। এক একদিন যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে, ক্ষিতীশের কথা স্মরণ করিয়া তাহার বুক

শতধারে ভাসিয়া যায়। অনুতাপের প্রবল বহ্নি তাহার ক্ষতবিক্ষত ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু হু হু করিয়া জ্বালাইয়া দেয়। তাহার মনে হয়,—"কেন ক্ষিতীশকে ত্যাগ করিলাম? সে ত' আমার নিকট কোনও অপরাধ করে নাই! বাস্তবিক, এই বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজনহীন সংসার-অরণ্যে সে যদি কণ্টকবৃক্ষ সকল উৎপাটিত করিয়া না দিত, তবে আমার সাধ্য কি যে—এক পদ অগ্রসর হইতাম! কিন্তু আমি তাহার কি প্রতিদান দিলাম? একটা প্রতারকের প্রতারণায় ভুলিয়া, যে আমার যথার্থ আপনার ছিল, তাহাকে পর করিলাম। বিনিময়ে পাইলাম কি?—একজন লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থপর, চরিত্রহীন বর্ব্বর আসিয়া, আমার ইহজন্মের সকল সুখ—সকল সাধ ঘুচাইয়া দিতে বসিয়াছে।"

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে—কাঁদিতে কাঁদিতে—চন্দ্রার এক একবার ভগবান্‌কে মনে পড়িত! তাঁহার চরণে দুঃখ জানাইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হইত! কিন্তু তদ্দণ্ডেই প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত,—পাপিনীর পাপ মন অতদূর অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, চন্দ্রা একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। তাহার মনটা অত্যন্ত খারাপ। আজ দুই তিন দিন অনঙ্গমোহন চন্দ্রার বাটী মাড়ায় নাই। চন্দ্রার এক মুহূর্ত্ত অদর্শন যে অনঙ্গমোহনের পক্ষে অসহ্যবোধ হইত, যাহার মুখের একটু হাসি দেখিতে পাইলে যে অনঙ্গমোহন কৃতার্থ হইয়া যাইত, যাহার একবিন্দু সোহাগ, অনঙ্গমোহনের নিকট

সুধার সমুদ্র বলিয়া পরিমিত হইত, সেই অনঙ্গমোহন আজ তিন দিন চন্দ্রার কাছে আসে নাই! চিন্তার তরঙ্গে আজ চন্দ্রার প্রাণ উদ্বেলিত!—"অনঙ্গমোহন কি আর কোনও রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছে? আমার রূপ-তৃষ্ণা কি তাহার একবারে মিটিয়া গিয়াছে? সে লম্পট কি আবার কোনও নূতন পথের পথিক হইল?"—নানারূপ ভাবপ্রবাহে চন্দ্রা ভাসিয়া চলিয়াছে। এমন সময়ে একখানি গাড়ী আসিয়া চন্দ্রার বাটীর দরজায় থামিল। চন্দ্রা মনে করিল, বুঝি কাহাকেও প্রসব করাইবার জন্য কেহ তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে। আজ কিন্তু লক্ষ টাকা দিলেও চন্দ্রা বাটীর বাহির হইবে না, এই তাহার প্রতিজ্ঞা! কারণ তাহার প্রাণে প্রাণ নাই, হৃদয়ে হৃদয় নাই, মনটুকু কোথায় উড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কি লইয়া সে প্রসবকার্য্য সম্পাদন করিবে?

সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল, ডাক্তার অনঙ্গমোহন গৃহে প্রবেশ করিল। চন্দ্রা একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—"আজ আমার কি সৌভাগ্য! আজ যাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, নিত্য তাহার মুখ দেখিব! আজ যাহার হাতের জল খাইয়াছিলাম, নিত্য তাহার হাতের জল খাইব!—তারপর ডাক্তারবাবু, এতদিন ছিলেন কোথায়?"

অনঙ্গমোহনের মূর্ত্তি আজ বড় গম্ভীর! সেই ভাব বজায় রাখিয়া সে উত্তর দিল,—"তোমাদের জাতকে জানিতে ত' আমার আর বাকি নাই! স্বার্থপরতার ভাণ্ডার লুট করিয়া তোমরা

জন্মগ্রহণ করিয়াছ! সময়ে হাজির না দিলে—মুখভার, প্রয়োজন পূর্ণ না করিলে—মুখভার, বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটিলে—মুখভার, চাটুকার সাজিয়া কথা না কহিলে—মুখভার! আমরা গৃহস্থ লোক, পেটের ভাতের জন্য দশ দোর ঘুরিয়া বেড়াইয়া সংসার প্রতি-পালন করিতে হয়! দিবারাত্র ইয়ারকীর ফোয়ারা ছুটাইলে আমাদের চলে কি করিয়া ভাই? তোমার অনেক প্রকার উপার্জ্জনের পথ আছে, আমার ত' তাহা নাই!" কথা কয়টী চন্দ্রার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিল, সে চুপ করিয়া রহিল। অনঙ্গমোহন আর কোনও কথা না কহিয়া, আলমারি খুলিয়া ব্র্যাণ্ডীর বোতল বাহির করিল। অল্প সময়ের মধ্যে উপর্য্যুপরি কয়েক গ্লাস পান করিল। বেশ একটু নেশার চমক আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

চন্দ্রাকে নীরব দেখিয়া অনঙ্গমোহন বিদ্রূপস্বরে কহিল, "কি বিবিসাহেব! মেজাজ আজ এমন বেয়াড়া রকম দেখিতেছি কেন? আজ কাল আমাকে আর ভাল লাগে না,—এ কথা আমি বেশ বুঝিয়াছি! আবার কি কোনও নূতন নাগরের গমনাগমন হইতেছে নাকি? ভাল—ভাল—আমরা দেখিয়াই সুখী!—নারী-চরিত্র নিত্য নূতন-প্রয়াসী—এ কথা কে না জানে? ঘর ভাল লাগিল না, ঘরের বাহির হইলে,—যাহাকে ধরিয়া বাহির হইলে—দিন কতক পরে তাহাকে ছাড়িয়া আমাকে ধরিলে;—এইবার আমি পুরাতন হইয়াছি, আবার আর একটী নূতন চাই ত'?" কথা শেষ করিয়াই সে আর এক পাত্র গলাধঃকরণ করিল।

চন্দ্রা আর সহ্য করিতে পারিল না, তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। ক্রোধ, ঘৃণা, অভিমান ও অনুতাপের প্রবল যন্ত্রণা—দুই কুল ভাসাইয়া, তাহাকে আছাড় মারিতে মারিতে—অপর পারে লইয়া গিয়া তুলিয়া দিল। আত্মবিস্মৃত হইয়া চন্দ্রা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"লম্পট! শঠ! বিশ্বাসঘাতক! প্রতারক! আমাকে বিদ্রূপ করিতে তোমার লজ্জা করে না? কে আমায় প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়াছিল? অসার আশ্বাসে ভুলাইয়া কে আমাকে মজাইয়াছিল? আকাশের চাঁদ হাতে দিয়া—কে আমাকে সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া আনিয়াছিল? তোমায় যদি না দেখিতাম, তোমায় যদি না চিনিতাম, তোমার সহিত যদি কথা না কহিতাম, তবে এই দুঃখের সংসারে একরূপ মাথা গুঁজিয়া দিন কাটাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু তোমার হাতে পড়িয়া আমার লাঞ্ছনার একশেষ হইতেছে! কাজ কর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই, আহারে রুচি নাই, ঘুমাইয়া তৃপ্তি নাই, জাগিয়া সুখ নাই, আত্মহত্যা করিব—সে ভরসাও কুলাইয়া উঠে না! আমার জীবনে শতধিক! তোমার মত পিশাচকে আমি ভালবাসিয়াছি। না,—না,—আমারই ভুল—আমারই ভুল,—আমি যে পিশাচী, তাই পিশাচকে ভালবাসিয়াছি। যথেষ্ট হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা কর; আমার বাটীতে তুমি আর অনুগ্রহ করিয়া পদার্পণ করিও না।" সুরাপানোন্মত্ত অনঙ্গমোহন উঠিয়া দাঁড়াইল! চন্দ্রার তীব্র ভৎর্সনার আর কোনও প্রকার উত্তর না করিয়া, সে তাহার চুলের মুটি ধরিয়া বুটশুদ্ধ সজোরে

এক পদাঘাত করিল। সে আঘাতের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, চন্দ্রা ভূতলে পড়িয়া গেল। ক্রোধ-বিকম্পিত-কলেবর অনঙ্গমোহন মূর্ত্তিমান পাষণ্ডের ন্যায় একটীবার পশ্চাৎ না চাহিয়াই, চন্দ্রার বাটী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

মুক্ত বাতায়ন দিয়া চন্দ্রালোক প্রবেশ করিতেছিল,—চন্দ্রার ধূল্যবলুণ্ঠিত অঙ্গ জ্যোৎস্নায় আপ্লুত করিয়া, সপ্তমীর চাঁদ আপনার আসনে বসিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিল। চন্দ্রা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। স্থির-ধীর-নেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল,—মৌন-মুগ্ধ-গম্ভীর প্রকৃতির অবহেলা ও তাচ্ছিল্য সে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল।

চন্দ্রা ঘরের দেওয়ালে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল। তাহার সে সময়ের সে মূর্ত্তি যদি কেহ দেখিত, তবে সে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া—সেই মুখপানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিত। চক্ষে জল নাই, হৃদয়ে প্রতিহিংসা নাই, জীবনে উদ্দেশ্য নাই, সে একবার হাসিতেছে, একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেছে, একবার আপনার পানে চাহিয়া দেখিতেছে;—এই ভাবে অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইল। টং টং করিয়া ঘড়িতে আট্‌টা বাজিয়া গেল। চন্দ্রা তাড়াতাড়ি একটী ব্যাগের ভিতর কয়েকখানি কাপড় ও কয়েকটী জামা গুছাইয়া লইল। আলমারী খুলিয়া কিছু টাকা বাহির করিয়া—আঁচলে ভাল করিয়া গাঁট দিয়া বাঁধিল। চাকরকে দিয়া একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকাইয়া, সে বরাবর হাবড়া ষ্টেশনের দিকে চলিল। যাইবার সময় ঝিকে ডাকিয়া

বলিল—"ফিরিতে আমার ৮।১০ দিন বিলম্ব হইবে, বাড়ী-ঘর-দোরের দিকে দৃষ্টি রাখিও।"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

'পাঞ্জাব মেল্' হাবড়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া—পশ্চিমাভিমুখে তীরবেগে ছুটিয়াছে। একখানি দ্বিতীয়-শ্রেণীর গাড়ীর মহিলাদিগের কামরায়, মাত্র দুইজন স্ত্রীলোক উপবিষ্ট। একজন ইংরাজ-মহিলা ও অপর একজন বঙ্গদেশীয়া। ইংরাজ-মহিলার বেশভূষা কিছু অসাধারণ; গৈরিক বসনে তাঁহার অঙ্গ সুশোভিত! ঠিক গাউনের ভাবও নহে—বাঙ্গালীর সাড়ীর ভাবও নহে; এমন একটু অভিনবত্ব তাহাতে ছিল,—যে দেখিবামাত্র কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিতে হয়। গলায় তুলসীর মালা, পায়ে হরিণের চামড়ার জুতা,—মুখমণ্ডলে বাল্যসরলতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত, আর দিবারাত্রি তাহাতে একটু পবিত্র হাসি লাগিয়াই আছে। বঙ্গদেশীয়া রমণীটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা চন্দ্রা! সুতরাং তাহার বিশেষ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

ইংরাজ-মহিলা একমনে কি একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। আর চন্দ্রা—অনন্তব্যাপী আকাশের দিকে চাহিয়া—আপনার অনন্ত মসীময় ভবিষ্যতের বিষয়চিন্তা করিতেছিল। সে শৈশবে পিতৃহারা;—পিতার কথা তাহার বড় মনে পড়ে না;

কিন্তু তাহার বৃদ্ধা মাতার জন্য আজ তাহার জীর্ণ প্রাণে তুমুল তুফান উঠিয়াছে। চন্দ্রা ভাবিতেছিল,—"আজ যদি মা থাকিতেন, তবে এত বড় পৃথিবী আমার নিকট জনশূন্য বলিয়া বোধ হইত না। সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইয়াও; যদি একবার 'মা' বলিয়া ডাকিয়া—তাঁহার পদে লুটাইয়া পড়িতাম, তিনি পরম আদরে—পরম যত্নে বুকে তুলিয়া লইতেন। এই সংসার-মরুভূমে যে একটু সামান্য জলাশয়, আত্মতৃপ্তির জন্য খনন করিয়াছিলাম, তাহাও ত' নিজে ইচ্ছা করিয়া মাটি চাপা দিয়া বুজাইয়াছি! এখন উপায় কি? যাহার কাছে আশ্রয় চাহিব, কলঙ্কিনী বলিয়া পদাঘাত করিয়া সে দূরে ফেলিয়া দিবে! পথে পথে ফিরিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে উদরপূরণ করিব—তাহাতেও ঘোরতর অসুবিধা। পোড়ারমুখীকে পোড়াইবার জন্য ভগবান্ রূপের ছিটে-ফোঁটা দিয়াছেন,—একেবারে নিতান্ত কুৎসিতা নই! তবে কি শেষে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া—টিপ্ কাটিয়া—ভ্রূ আঁকিয়া—লোক ডাকিতে হইবে? হয় ত' কোন্ দিন—কে একজন অপরিচিত পুরুষ আসিয়া—সামান্য দুই একখানা অলঙ্কারের লোভে গলায় ছুরি দিয়া মারিয়া রাখিয়া যাইবে!" ভবিষ্যতের ভীষণ কল্পনার পথে চন্দ্রা আর অগ্রসর হইতে পারিল না,—ঘোরতর আশঙ্কায় তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল; আত্মসম্বরণে অসমর্থা হইয়া—জানালার উপর মুখ ঢাকিয়া—সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে হৃদয়-ভেদী ক্রন্দনের মৃদুশব্দ, ইংরাজ-মহিলার কাণে গিয়া পঁহুছাইল।

তিনি পুস্তকখানি বেঞ্চের উপর রাখিয়া, তাড়াতাড়ি চন্দ্রার নিকট আসিয়া, তাহার মাথাটি নিজের বুকের মধ্যে লইয়া সকরুণ স্নেহদৃষ্টিতে চন্দ্রার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সে কি মহিমাবিভাসিত দৃষ্টি!—তাহাতে স্বার্থপরতার ছায়া নাই—প্রতিদানের লেশমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই,—সে দৃষ্টি এ পৃথিবীর নহে—এ সংসারের নহে,—বুঝি মূর্ত্তিমতী জগদীশ্বরী চন্দ্রার জ্বালার উপশমের জন্য ত্রিদিব হইতে নামিয়া আসিয়াছেন!

চন্দ্রা মুখ তুলিয়া চাহিল; দেখিল—অজানিতা—অপরিচিতা বিদেশিনী রমণীর দুই চক্ষে দুই ফোঁটা জল! তাহার মনে হইল, যেন দুটি ব্যথিত ব্রহ্মাণ্ড অশ্রুরূপে পরিণত হইয়া—সেই কমল-লোচনার নয়ন-যুগলে ঝুলিতেছিল! সে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি মেমসাহেব! তোমার চ'খে জল কেন?"

ইংরাজ-মহিলা উত্তর করিলেন,—"কাঁদিবার জন্যই আমি জন্মিয়াছি, কান্নায় বড় সুখ; পৃথিবীতে আসিয়া যে কাঁদিতে শিখিয়াছে, সে ত' বাজী জিতিয়া গিয়াছে;—ভবিষ্যতের ভয় ও ভাবনা তাহার নাই।"

ইংরাজ-মহিলার মুখে পরিষ্কার বাঙ্গলা কথা শুনিয়া—চন্দ্রার মন বিস্ময়ে ভরিয়া গেল; সে কৌতূহল-পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার নাম কি? আপনি এমন পরিষ্কার বাঙ্গালা কথা কহিতে শিখিলেন কি করিয়া?"

ইংরাজ-মহিলা উত্তর করিলেন,—"পূর্ব্বে আমার যে নামই থাকুক, তাহা তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ

লোকে আমাকে সিস্‌টার অপরাজিতা বলিয়া ডাকে। আমি তোমাদের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বই অনেক পড়িয়াছি। তুমি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম শুনিয়াছ কি ?”

চন্দ্রা। খুব শুনিয়াছি ; ‘রামকৃষ্ণ-কথামৃতও’ বারবার পাঠ করিয়াছি। অনেকে বলেন—তিনি ভগবান্, দেহ ধারণ করিয়া ভূতলে আসিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন—তিনি সামান্য একজন সাধক ছিলেন, তাঁহাকে ভগবান্ উপাধিতে ভূষিত করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

সিস্‌টার অপরাজিতা মৃদুহাস্যের সহিত কহিলেন,—“তোমার কি ধারণা ?”

চন্দ্রা। তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, তবে তাঁহার ‘কথামৃত’ পাঠ করিয়া আমার মনে হয়, তিনি যেরূপ সরল, প্রাঞ্জল ও সহজ ভাষায়, গভীর ও কঠিন তত্ত্ব মূর্খ নরনারীগণকে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বয়ং ভগবান্ ছিলেন কি না জানি না, তবে অন্ততঃ তিনি ভগবানের পার্শ্বের আসনে বসিতেন, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি।

সিস্‌টার অপরাজিতা বিস্মিত—বিমোহিত ও চমকিত হইয়া চন্দ্রার উক্ত কথাগুলি শুনিলেন। কি আশ্চর্য্য ! এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে রমণী বালিকার ন্যায় কাঁদিতেছিল, যাহাকে বাঙ্গালীর ঘরের নিরক্ষর কুলবধু বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহার মুখে এ সব কি কথা ? সাগ্রহে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি কি ইংরাজী পড়িয়াছ ?”

চন্দ্রা। কিছু কিছু পড়িয়াছি। বাঙ্গালায় আমি ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়াছি। বাঙ্গালা বইও অনেক পড়িয়াছি। কিন্তু আমি বড় মন্দভাগিনী। আমার জীবনের যবনিকা যত শীঘ্র পতিত হয়, ততই আমার পক্ষে মঙ্গল।

সিস্‌টার অপরাজিতা। তোমার হৃদয়ে যে একটা গভীর বেদনা রহিয়াছে, তাহা আমি বুঝিয়াছি। নিঃসঙ্কোচে তোমার পরিচয় আমার নিকট প্রদান কর।

মাতার নিকট কন্যা যেমন আত্মকাহিনী প্রকাশ করিতে লজ্জিতা বা কুণ্ঠিতা হয় না, চন্দ্রাও সেইরূপ দ্বিধা ও দ্বিরুক্তি না করিয়া অকপটে নিজ জীবনী সিস্‌টার অপরাজিতার নিকট বিবৃত করিল। বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে অপরাজিতার পদতলে লুটাইয়া পড়িল, অশ্রুধারে ভাসিতে ভাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "এ পতিতার কোনও উপায় আছে কি ?"

মমতায় মথিতা হইয়া সিস্‌টার অপরাজিতা উত্তর করিলেন,— "পতিতাকে আমি বড় ভালবাসি। পৃথিবীতে পতিতা যদি না থাকিত, তবে পতিতপাবন দেহধারণ করিয়া আসিতেন কি ? পতিতার উদ্ধারের জন্যই পতিতপাবনের আগমন। তুমি কোথায় যাইবে মনস্থ করিয়াছ ?"

চন্দ্রা। অভাগিনীর আর স্থান কোথায় ? সংসারে আপনার বলিবার কেহ নাই, মুখ চাহিবার কেহ নাই, রোগ-শয্যায় মুখে এক ফোঁটা জল দিবার কেহ নাই। একবার মনে হইয়াছিল—

আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান করি, কিন্তু পারিলাম না; মৃত্যুর ভীষণ বিভীষিকা বুক কাঁপাইয়া তুলিল; শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি,—বারাণসীর পবিত্র তীর্থে গিয়া, বিশ্বেশ্বরের চরণে শরণ লইয়া, অবশিষ্ট জীবন তথায় অতিবাহিত করিব।

সিস্‌টার অপরাজিতা। আমিও কাশীধামে যাইতেছি। 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' তথায় স্থাপিত হইয়াছে, শুনিয়াছ কি?

চন্দ্রা। সংবাদপত্রে 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের' কথা পাঠ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ কিছুই জানি না। সেবাশ্রমের কার্য্য কি?

সিস্‌টার অপরাজিতা। সেবাশ্রমের কার্য্যের বিবরণ শুনিবে? শুনিলে তুমি চমৎকৃত হইবে, স্বার্থের সংসারে এরূপ ত্যাগহীন কার্য্য হইতে পারে—হয় ত' তুমি বিশ্বাস করিবে না! অনেকগুলি শিক্ষিত সদ্বংশজাত ভদ্রসন্তান গৃহ ছাড়িয়া—আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া—পদগৌরবের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, ভগবান্ রামকৃষ্ণ-দেবের চরণসেবী হইয়া, গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, সেবাশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। বারাণসীর—কোথায়—কোন্ পথে—কোন্ সংকীর্ণ গলিতে—কিম্বা গঙ্গাতীরে—যদি কোনও নিরাশ্রয় সম্বলহীন মুমূর্ষুকে দেখিতে পাওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বহন করিয়া আনিয়া সযত্নে সেবাশ্রমে রক্ষা করা হয়। উপযুক্ত চিকিৎসক চিকিৎসা করেন, বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান ও পথ্যের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। যাহারা কাশীবাস করিতে আসিয়াছে,

তাহাদের মধ্যে যদি কোনও বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার আহারের অভাব হয়, আশ্রম হইতে প্রতিদিন তাহাদের চাউল ও প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা হয়। কোনও দেশে যদি কখনও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়—সেবাশ্রম হইতে প্রভূত অর্থ দুঃস্থ ব্যক্তিগণের জন্য প্রেরিত হয়;—বন্যাপ্রপীড়িত প্রদেশে—সেবাশ্রমের সেবকগণ—আবাল-বৃদ্ধবনিতার সাহায্যার্থ নিজজীবন তুচ্ছ করিয়া থাকেন; কোথাও মড়ক উপস্থিত হইলে—সেবকগণ অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষা আরম্ভ করেন। তোমায় আর কত বলিব? পৃথিবীতে যত কিছু সৎকার্য্য আছে,—রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম তাহার আদর্শস্থল। তোমায় সেবাশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত করিব। ঠাকুরের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া, তোমার অপহৃত শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য যত্নবতী হও। নিষ্ফল জীবন লইয়া পৃথিবীতে কেহ বাঁচে না—বাঁচিতে পারেও না। কার্য্যে আত্ম-সমর্পন কর, পরোপকার জীবনের সার ব্রত কর, ভগবান্ রামকৃষ্ণের পাদপদ্ম হৃদয়ে রাখিয়া—ফলাফলের অভিলাষী না হইয়া—আত্মকার্য্য করিয়া যাও; অন্ধকারময় জীবনে আলোকের উন্মেষ দেখিবে, সুখী হইবে, তৃপ্তি পাইবে।”

চন্দ্রার প্রাণ পুলকে ভরিয়া গেল,—সে যেন অকূলে কূল পাইল! কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে কহিল,—“আপনি কি আমায় সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া যাইবেন?”

অপরাজিতা। আমি সেইরূপই মনস্থ করিয়াছি।

চন্দ্রা সাগ্রহে অপরাজিতার পদধূলি লইয়া আপনার মাথায়

দিল। পরে বলিল,—"সেবাশ্রমের কার্য্যবিবরণ যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে ত' প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এত অর্থ আসে কোথা হইতে ?"

অপরাজিতা হাসিমুখে উত্তর করিলেন,—"যাঁহার কার্য্য—তিনিই যোগাড় করিয়া দেন। নানা দেশের মনিষীগণ প্রতি-মাসেই অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। এরূপ মহৎকার্য্যে কোন্ পাষণ্ডের বদ্ধমুষ্টি উন্মুক্ত হইয়া না যায় ?"

চন্দ্রা। ক্ষমা করিবেন,—একটা কথা জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছে। আপনারা ত' যীশুখৃষ্টের ভজনা করিয়া থাকেন, তবে রামকৃষ্ণদেবকে গুরু বলিয়া মানিয়া—স্বদেশ ছাড়িয়া এদেশে থাকিবার হেতু কি ?

অপরাজিতা। আমি যীশুখৃষ্টেরও ভজনা করি, রামকৃষ্ণেরও ভজনা করি ; শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে—রামকৃষ্ণেই আমার ইষ্ট-দর্শন হয়,—যিশুরূপেই তিনি আমায় দেখা দেন। আজ পর্য্যন্ত আমি অবিবাহিতা। আমার পিতা আমেরিকার একজন বিদিত ধনাঢ্য ব্যক্তি। স্বদেশে বসিয়া প্রথম রামকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করি। যখন শুনিলাম—তাঁহার ভক্তির রাজ্যে জাতিবিচার নাই, ভেদাভেদের অভিমান নাই, যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াও চণ্ডালের সহিত ভোজন করিতে তাঁহার কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না,—তিনি বালকের ন্যায় সরল—অথচ অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায় জ্ঞানী,—তখন জানি না—কেন আপনা হইতেই তাহার চরণোদ্দেশে মস্তক লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সেইদিন হইতে আমি তাহার দাসী—তিনি

আমার উপাস্য দেবতা ; তিনি আমার গুরু, আমি তাঁহার শিষ্যা ; তিনি আমার পিতা—আমি তাঁহার কন্যা। দিবারাত্র শয়নে স্বপনে জাগরণে তাঁহার মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত ; আমি যখন যে কার্য্য করি, ফলাফল তাঁহারই চরণে অর্পণ করিয়া থাকি। শুনিলে তুমি বিশ্বাস করিবে কি না জানি না, আমি যখন তাঁহাকে দেখিতে চাই, তিনি দয়া করিয়া আমায় দেখা দেন ; বরাভয়-করে আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করেন। এমন দেশ পৃথিবীর কোন্ স্থানে আছে, যথায় রামকৃষ্ণের নামে সমগ্র নরনারীর মস্তক সসম্ভ্রমে অবনত না হয়! আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—এমন দিন আসিবে, যে দিন রামকৃষ্ণ-প্রেমে বিশ্বসংসার মাতিয়া উঠিবে।” বলিতে বলিতে অপরাজিতার নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া আসিল, দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল ; তিনি উত্তেজিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “এস' ভগিনি, উভয়ে একত্র হইয়া সমস্বরে 'গুরু-মহারাজে'র জয়ধ্বনি করি!”

নৈশ গগন ভেদ করিয়া, দ্রুতগামী পঞ্জাব-মেলের শব্দ প্রশমিত করিয়া, পার্শ্বস্থ আরোহিবর্গের প্রাণ চমকিত করিয়া উচ্চরব উঠিল,—“জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণের জয়! জয় ভগবান্ রামকৃষ্ণের জয়!!”

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিরুপমার অবস্থা এখন ভাল নয়। সে আপনার বুদ্ধির দোষে আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ডাকিয়া আনিয়াছে! এক একবার মনে করে, "প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া কেন অমন কাজ করিলাম! নলিনীর প্রাণে আঘাত দিলাম, নিজের মাথা নিজে খাইলাম, এখন এ কূল ও কূল দু কূল হারাইয়া মাঝ-দরিয়ায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। বেশ্যার জীবন কি দুঃখকর! যখন মুঠো মুঠো টাকা উপার্জ্জন করিয়া মায়ের হাতে দিতাম, তখন আমারও যত্নের সীমা ছিল না, মাটীতে পা পড়িলে পায়ে ব্যথা লাগিবে ভাবিয়া তিনি আকুল হইতেন; এখন বেকার বসিয়া আছি, তাই প্রতিদিন লাঞ্ছনা; এখন করি কি? কোন্ পথে যাই? ভবিষ্যতের দিকে যত চাহিতেছি, ততই অতল অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছি।" এমন সময় নিরুপমার মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো, ভাত বাড়িব—খাইবি?"

নিরুপমা বলিল,—"আমার ক্ষুধা নাই।"

নিরুপমার মাতা একটু রাগত স্বরে কহিল, "কে বাছা তোমার জন্য তিন প্রহর বেলা পর্য্যন্ত ভাত আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকিবে? আজকাল ত কেবলই শুনি 'ক্ষুধা নাই—ক্ষুধা নাই!' আর বড় বেশী দিন নয়,—যা দুই একখানা ছিল, একে একে ত' বাঁধা পড়িতেছে; এইবার খাইবে কি? ঘরে যখন চালের অভাব

হইবে, ক্ষুধার প্রভাবও তখন বিশেষ বাড়িবে; পৃথিবীর নিয়মই এই।" কথা কয়টা নিরুপমার বুকে তীরের মত বিঁধিল। একদিন যে শত শত টাকা প্রতিমাসে উপার্জ্জন করিয়াছে, নানা প্রকার স্বর্ণ ও জহরতের অলঙ্কারে যাহার দেহ ও লোহার সিন্ধুক পূর্ণ ছিল, যে একদিনের জন্যও বাটীর দরজা হইতে ভিখারী ফিরায় নাই, আজ তাহাকে শুনিতে হইল, 'এইবার খাইবে কি ?' অতঃপর সে বলিল, "তা' মা—তুমি আমাকে কি করিতে বল ?"

নিরুপমার মাতা।—"রোজগার করিতে বলি, আর কি বলিব ? থিয়েটারে কেমন নাম হইতেছিল, পীরিতে পড়িয়া সেখানকার চাকুরী-টুকু ঘুচাইলি; তার পর রিষের জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে পোড়ার মুখ লইয়া আবার বাড়ী ঢুকিলি; তার পর যে কাণ্ড করিলি—আমরা বেশ্যা—আমাদেরও গা কাঁপিয়া উঠে! এইবার তার ফলভোগ কর্। তুই কি মনে করিস্, আমরা বেশ্যা বলিয়া যথেচ্ছাচার করিতে পারি ? আমাদেরও ধর্ম্ম আছে, আমাদেরও আইন-কানুন আছে। সেই আইনকানুনের গণ্ডীর বাহিরে যিনিই পা দিবেন, তাঁহাকে শেষ পস্তাইতে হইবেই হইবে।"

নিরুপমা বুঝিল, তাহার মাতা যথার্থই বলিয়াছে। নলিনীর অভিশাপেই তাহার আজ এ দুর্দ্দশা! সে বাড়ী ছাড়িয়া, সংসার ছাড়িয়া, স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকেই সর্ব্বস্ব করিয়া রাখিয়াছিল, কুচক্রীর কুচক্রে পড়িয়া—একটা বিষম ভুল বুঝিয়া নলিনীর সহিত সম্বন্ধ উঠাইয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার পর

সে যে খেলা খেলিল, তাহাতে জিত হওয়া ত' দূরের কথা, নিজের পুঁজিটুকু পর্য্যন্ত খোয়াইয়া ফেলিল! ভাবিতে ভাবিতে নিরুপমার চোখে জল আসিল। মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া সে কহিল,—"মা, আমি আবার থিয়েটারে ভর্ত্তি হইব।"

নিরুপমার মাতা যারপরনাই আনন্দিতা হইয়া উত্তর দিল,—"এত দিনে বাছা তোমার সুবুদ্ধি হইয়াছে; শুভ কাজে বিলম্ব করিতে নাই, আজই আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া থিয়েটারের বাবুর কাছে লইয়া যাইব।"

সন্ধ্যার পর থিয়েটারে যখন মহলা চলিতেছিল, নিরুপমার মাতা তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। বহুকাল পরে নিরুপমাকে রঙ্গমঞ্চে দেখিয়া সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী বিশেষ আশ্চর্য্য হইল। থিয়েটারের অধ্যক্ষ নিরুপমাকে আপনার কক্ষে লইয়া গিয়া, কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া, তাহাকে নিয়োগ-পত্র প্রদান করিলেন। নিরুপমার আবার নবজীবন আরম্ভ হইল।

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই অধ্যক্ষ মহাশয় বুঝিলেন যে, নিরুপমার সে পূর্ব্বের প্রতিভা আর নাই; স্বরের বিকৃতি ঘটিয়াছে, অভিনয়ে পারদর্শিতা প্রায় চলিয়া গিয়াছে। থিয়েটারে নটবর নামে এক শিক্ষানবীশ ছোকরা ছিল; সে চব্বিশ ঘণ্টা ফিট্‌ফাট্ বাবুটি সাজিয়া থাকিত; মাথায় চারি স্তবক সিঁথে কাটিত,—মধ্যস্থলে, দুই পার্শ্বে ও পশ্চাতে! ঘুমাইবার সময় পর্য্যন্ত দুই কাণে দুই ফায়া আতর বিরাজ করিত। পায়ে পম্প-সু, গায়ে আদ্ধির পাঞ্জাবী; বুকে পাক দিয়া চাদরখানি

বাঁধিয়া, সরু ছড়ি গাছটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে যখন সে শীষ দিত, তখন নটবরকে যথার্থই নটবর বলিয়া বোধ হইত! নিরুপমা আড়ে আড়ে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিত; চুপি-সাড়ে দুই একটা পানও দিত, এবং মাঝে মাঝে ফিক্ করিয়া একটু হাসিত। নটবরও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে সুবিধা বুঝিয়া দুই একটা চোকা চোকা নয়ন-বাণ হানিত; অন্তরালে লইয়া গিয়া সিগারেট ধরাইয়া নিরুপমার মুখে তুলিয়া দিত। নিরুপমা নারিকেল দেওয়া পান খাইতে ভালবাসিত শুনিয়া, সে প্রত্যহ তাহা যোগাড় করিয়া আনিয়া দিত। বিনা আয়াসে ওরূপ চতুর মৎস্য যে এত শীঘ্র টোপটি গিলিবে, নটবর তাহা মনেও করে নাই!

দিন দিন নিরুপমার পদস্খলন হইতে লাগিল। অধঃপতনের শেষ প্রান্তে পা দিবার সময়, নিরুপমার বিবেক এক একবার জাগিয়া উঠিত, তাহার মনে হইত, "এ আমি কি করিতেছি? কাহার প্রেমে মজিতে বসিয়াছি? চাল নাই, চুলো নাই, কেহ জানে না, কেহ চিনে না, এমন একটা হতভাগ্যের প্রণয়ে পড়িয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিতেছি? এ কথা অপ্রকাশ থাকিবে না, ইহার পর আর কি কেহ আমার মুখ দেখিবে? আর কি কেহ আমার কাছে আসিবে? সমস্ত খোয়াইয়া প্রায় ত' পথের ভিখারী হইয়াছি! এইবার উদরান্নের জন্য বোধ হয় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে।"

মন সকলই বোঝে, সময়ে সকলই জানিতে পারে, কিন্তু স্রোতের মুখে পড়িলে তৃণের মত খান-খান হইয়া ভাসিয়া যায়;

পশ্চাৎ ফিরিবার ইচ্ছা থাকিলেও ফিরিতে পারে না, স্ববশে আসিবার সম্পূর্ণ সাধ থাকিলেও আসিতে পারে না, ভবিষ্যতের তমোময় ছবি প্রত্যক্ষ করিয়াও আত্ম-সংবরণে অসমর্থ হয়।

নিরুপমার তাহাই ঘটিল। সে সব বুঝিয়া সুঝিয়া, জানিয়া শুনিয়া, পঙ্কিল পথে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল।

নটবর ক্রমশঃ তাহার ধ্যান, জ্ঞান, জীবনসর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল। গর্ব্বিতা নিরুপমা নটবরের হস্তে ক্রীড়ার পুত্তলী হইয়া পড়িল। প্রেমিক প্রেমিকার কেলেঙ্কারী থিয়েটারে বিশেষ-রূপে গড়াইল। অধ্যক্ষ মহাশয় বিরক্ত হইয়া নিরুপমাকে কার্য্যে ইস্তফা দিতে বাধ্য করিলেন; নটবরেরও থিয়েটারে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।

সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিরুপমার মাতা কন্যার সহিত তুমুল কলহ আরম্ভ করিল। প্রথমে কঠোর ভৎর্সনা; পরে চ'খের জলে ভাসিতে ভাসিতে নিরুপমার হাত দুটী ধরিয়া মিষ্ট কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, যে কাজ সে করিয়াছে, তাহাতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহাকে টুক্‌নি হাতে করিয়া পথে বাহির হইতে হইবে। কিন্তু সে কথা শুনে কে? সে কথা বুঝে কে? নিরুপমা তখন নটবরের প্রেমে আত্মহারা,—একরূপ উন্মত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শেষে একদিন কলহের ঝোঁকে নিরুপমার হস্তে দুই এক ঘা উত্তম মধ্যম খাইয়া, নিরুপমার মাতা, যাহা কিছু গুপ্ত-সঞ্চয় ছিল, তাহা লইয়া কাশীধামে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া

বলিয়া গেল যে, "বেশ্যার মাতা অনেকেই হয়! জন্ম মৃত্যু জগদীশ্বরের ইচ্ছাধীন! কিন্তু আমার অদৃষ্টগুণে আমার বড় মেয়েও পর হইয়াছে, ছোট মেয়েরও অবস্থা এইরূপ; এখন আমি ভালয় ভালয় মরিতে পারিলে বাঁচি।"

আমাদের বোধ হয়, এই সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমার মাতার ইহা বুঝা উচিত ছিল যে, দুনিয়ার মালিক নিক্তির ওজনে তাঁহার বৃহৎ সৃষ্টি-রাজ্য পরিচালিত করিতেছেন। যে যেমন দিবে, সে তেমনই পাইবে। যে যেমন ঠকাইবে, সে নিজেও তেমনই ঠকিবে। যে আপনাকে যত চতুর বিবেচনা করিবে, সংসারে সে ততই বোকা বনিয়া যাইবে। সে যাহা হউক, মাতাকে বিদায় দিয়া, নটবরকে জীবনের আরাধ্য দেবতা করিয়া, নিরুপমার ছয় মাস কাল কাটিয়া গেল। এই সময়ে তাহার সমস্ত গায়ে, পায়ে, মুখে চাকা-চাকা দাগ বাহির হইতে লাগিল। কুৎসিত পীড়ায় তাহার সমস্ত শরীর ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। দুশ্চারিণীর তথাপি চৈতন্য নাই। গহনা বন্ধক দিয়া নটবরের রাজভোগ ও ধান্যেশ্বরী যোগাইতে হইতেছে। নিজের শারীরিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। জীবন-প্রবাহের প্রবল তরঙ্গ প্রতি মুহূর্ত্তে ধীর ও মন্থর হইতেছে। তথাপি নটবরকে চাই। নটবরের মুহূর্ত্তমাত্র অদর্শন তাহার প্রাণ ব্যাকুল করিয়া তুলে। নটবর একদিন না আসিলে সে কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা খুঁড়িতে আরম্ভ করে। তাহারই প্রদত্ত অর্থে কাপ্তেন সাজিয়া সে অন্য বারবনিতার গৃহে গমন করে, অভাগিনী নিরুপমা গাড়ী

ভাড়া করিয়া তাহার বাড়ী গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া নটবরকে আপন আবাসে লইয়া আসে। লজ্জা নাই, সম্ভ্রমজ্ঞান নাই, তাহার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, নটবরের পদাঘাত তাহার এখন পুষ্প-বৃষ্টি বলিয়া মনে হয়, নটবরের অনুচিত ভৎর্সনা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে, নটবরের তিলমাত্র সোহাগ তাহার স্বর্গসুখ অপেক্ষা মধুর ও মনোরম বলিয়া বোধ হয়।

কুৎসিত রোগ আর কত দিন চাপিয়া রাখা যায়? অল্প দিনের মধ্যেই নিরুপমা শয্যাশায়িনী হইল।

ডাক্তারের ভিজিট, পথ্যের ব্যবস্থা, ঔষধের খরচ নিরুপমাকে নিজেই যোগাইতে হইত; কিন্তু সে এখন উত্থানশক্তিরহিত। আলমারীর, বাক্সের ও লোহার সিন্ধুকের চাবি অগত্যা নটবরের হাতে পড়িল। এইবার সে ষোল আনার মালিক হইয়া সিংহাসন আলো করিয়া বসিল। অতঃপর নিরুপমার ভবিষ্যৎ কি হইল, তাহা জানিবার জন্য পাঠকবর্গকে আর অল্প কাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

কাশী-সেবাশ্রমের সভ্যগণ চন্দ্রার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। সে আহার নিদ্রা ভুলিয়া দিবারাত্রি পীড়িতাদিগের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া যথাসময়ে ঔষধ-প্রদান, পথ্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিত। অল্প দিনের মধ্যেই সে সেবাশ্রমের রোগিগণের জননীস্বরূপা হইয়া উঠিল। সেরূপ যথার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে পরহিত-ব্রতে জীবন-অর্পণ, সেবাশ্রমের-সভ্যগণের মধ্যে পূর্ব্বে আর কেহ করিয়াছেন কি না সন্দেহ! সিস্‌টার অপরাজিতার' উপদেশে ও সহবাসে চন্দ্রার হৃদয় ও প্রবৃত্তি দিন দিন কষিত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল হইতে লাগিল।

এইরূপই হয়। সংসারে আসিয়া যাহারা বেশ একটু পোড়্ খাইয়া লয়, তাহাদের সময়, সুযোগ ও স্থান মিলিলে, কর্ত্তব্যপথ চিনিয়া লইতে বড় বেশী বেগ পাইতে হয় না। আর যাহারা সোনার চাম্‌চে মুখে করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, এবং জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের উপর গড়াগড়ি দিয়া জীবনের সার অংশ কেবল চাটুকারগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া অতিবাহিত করে, কালচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া যখন সেই সকল ধনকুবেরদিগের হাত হইতে পোড়া মাছ পলাইতে আরম্ভ করে, সে দিন, সে মুহূর্ত্ত, সে আঘাত—তাহাদের সাধ্য কি যে সহ্য করে?

তাহাদের পরিণাম বড় শোচনীয়। আমি বরং চিরজন্ম দুঃখ সহিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু শৈশবাবধি সুখের মুখ দেখিয়া অকস্মাৎ দুঃখের কঠোর আলিঙ্গন সহ্য করিতে সম্মত নহি।

কিছুদিন এই ভাবে কাটিয়া গেল। একদিন সংবাদ আসিল, কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হইয়াছে। বিসূচিকা ও বসন্তরোগে প্রতিদিন শত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। সেবা ও পথ্যের অভাবে মহামারীর প্রকোপ দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এমন কি, কাহারও কাহারও বাড়ীতে মুখে এক ফোঁটা জল দিবার লোকও পাওয়া যাইতেছে না।

কালবিলম্ব না করিয়া ব্রহ্মচারিণী সিস্‌টার অপরাজিতা চন্দ্রাকে লইয়া সেবাশ্রমের সভ্যগণের সহিত কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। বিসূচিকা ও বসন্ত ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি। পুত্র পিতার নিকট আসিতে ভয় পায়, পতি পত্নীর নিকট যাইতে সঙ্কুচিতা হয়; কিন্তু ভগবান্ রামকৃষ্ণের চরণাশ্রিত সেবকগণ আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণে নিরাশ্রয় রোগিগণের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অর্থাভাবে যাহারা ডাক্তার দেখাইতে পারিতেছে না, তাহাদিগের জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করা, যাহাদের ঔষধ জুটিতেছে না, তাহাদিগের জন্য ঔষধ সংগ্রহ করিয়া আনা, যাহাদিগের পথ্য যোগাইবার ক্ষমতা নাই, তাহাদিগের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সে অভাব মোচন করা—সেবা-শ্রমের সভ্যগণের একমাত্র প্রিয় কার্য্য হইল। বাড়ী বাড়ী

ঘুরিয়া কোথায় কোন্ অনাথা ব্যাধির তাড়নায় যন্ত্রণা পাইতেছে, চন্দ্রা সেই সকল রমণী সেবার ভার গ্রহণ করিল। হয় ত' কোনও দিন বারিবিন্দু পান না করিয়া কাটিয়া যায়, কোনও রাত্রি সম্পূর্ণ অনিদ্রায় অতিবাহিত হয়, কিন্তু তাহাতে চন্দ্রার ক্লেশ বোধ হয় না, যন্ত্রণা অনুভব হয় না, বরং অনির্ব্বচনীয় আনন্দের গর্ব্বে তাহার হৃদয় স্ফীত হয়। সে যে এখন নূতন মানুষ হইয়াছে। পরহিতব্রতে আত্মসমর্পণ করিতে শিখিয়াছে। সেই দয়াল ঠাকুরের পদাশ্রয় লাভ করিয়াছে। আর কি সে আপনার দিকে ফিরিয়া চায়? আর কি সে 'আমার' 'আমার' করিয়া আমিত্বের অভিমান লইয়া ঘুরিয়া মরে? এখন তাহার সুখও যা', দুঃখও তা'; জীবনও যা', মরণও তা'; সংসারও যা', অরণ্যও তা'।

হায়, ঠাকুর! আমি কবে চন্দ্রার ন্যায় সব সমান দেখিতে শিখিব! এক জন পথভ্রষ্টা পতিতাকে তুমি পথ দেখাইয়া দিলে, সে তোমার চরণ-কমলের মধু পান করিল; আমিও একজন পতিত, চিত্রের পদ্ম দেখাইয়া আমার মন-ভ্রমরকে কি চিরদিন ভুলাইয়া রাখিবে, প্রভু?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত ভক্তমণ্ডলীর ঐরূপ অলৌকিক কার্য্যের পরিচয় পাইয়া, অভূতপূর্ব্ব আত্মত্যাগ দেখিয়া সমগ্র কলিকাতাবাসী চমৎকৃত হইলেন। ইংরেজী বাঙ্গালা সমস্ত সংবাদপত্রে তাঁহাদিগের যশোগান গীত হইতে লাগিল; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে 'জয় রামকৃষ্ণের জয়' ধ্বনি মুখরিত হইল।

একদিন মধ্যাহ্নে চন্দ্রা কোনও এক রোগগ্রস্ত গৃহস্থের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। স্বামী স্ত্রী উভয়েই ভীষণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী। বাটীতে আর কাহাকেও দেখিল না। স্বামী সংজ্ঞাহীন, পতিব্রতা স্ত্রী ব্যাধির তাড়নায় অধীরা হইয়াও শায়িতা অবস্থায় পতির যথাসাধ্য সেবা করিতেছেন। চন্দ্রা যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, রমণী তাহা জানিতে পারে নাই। চন্দ্রা দূরে দাঁড়াইয়া নীরবে সেই স্বর্গীয় দৃশ্য অবলোকন করিল। দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া আসিল। মনে মনে ভাবিল, "পাপের ভরা মাথায় করিয়া বাসুকি যে এখনও স্থির হইয়া আছেন, এখনও যে দিনের পর রাত্রি আসিতেছে, রাত্রির পর দিন হইতেছে, সূর্য্যের পর চন্দ্র উঠিতেছে, আবার চন্দ্রের পর সূর্য্য উঠিতেছে, স্রষ্টার সৃষ্টি যে এখনও কোনরূপে গোঁজামিল দিয়া চলিতেছে, তাহার প্রধান কারণ, আজি পর্য্যন্ত সতী সাধ্বী পতিব্রতা রমণীর অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে লুপ্ত হয় নাই। যে দিন, যে মুহূর্ত্তে এই জাতির সমূলে ধ্বংস হইবে, দেখিব বিধাতা! কেমন করিয়া তুমি তোমার বিশ্বরথ পরিচালিত করিতে পার! তোমার মতন লক্ষ বিধাতা একত্র হইলেও পারিবে না, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

বসন্ত-রোগ-ক্লিষ্ট স্ত্রী পুরুষকে দেখিয়াই চন্দ্রা চিনিল। এক জন আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ক্ষিতীশচন্দ্র ও অপরটী সেই হিন্দু মহিলার আদর্শ অন্নপূর্ণা। এইবার চন্দ্রা একেবারে শয্যার উপর আসিয়া বসিল। অন্নপূর্ণাকে সম্বোধন

করিয়া বলিল, বোন, আমি তোমাদের সেবা করিতে আসিয়াছি।”

অন্নপূর্ণা বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নেত্রে চন্দ্রার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মূর্ত্তিমতী দয়া ও করুণা এক অঙ্গে মিশিয়া যেন তাহার এই ঘোর দুঃসময়ে হাত বাড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইতে আসিয়াছে! মরণের দ্বার হইতে সে যেন ফিরিয়া আসিল; তাহার পীড়ার অর্দ্ধেক উপশম হইল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না। হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া বালিশের উপর লুটাইয়া পড়িল।

চন্দ্রা আর গৃহে ফিরিল না। সাত দিন সাত রাত্রি উপর্য্যুপরি ক্ষিতীশ ও অন্নপূর্ণার শুশ্রূষা করিয়া যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করাইয়া তাহাদের উভয়কেই—রোগ হইতে মুক্ত করিয়া তুলিল; ক্ষিতীশ বা অন্নপূর্ণা কেহই চন্দ্রাকে চিনিতে পারিল না। পরে সে যে দিন বিদায় লইয়া গাড়ী আনাইয়া স্বস্থানে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন ক্ষিতীশ ও অন্নপূর্ণা দুই জনে মিলিয়া কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র হইয়া চন্দ্রার হাত দুটী ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কে?” চন্দ্রা উত্তর করিল, “আমি ভগবান রামকৃষ্ণের চরণাশ্রিতা অভাগিনী রমণী, আমার অন্য পরিচয় নাই।” ক্ষিতীশের মনে হইল, সে যেন বহুকাল পূর্ব্বে,—সে যে কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে, তাহার মনে হয় না,—কোথায়, কোন্ স্বপ্ন-রাজ্যে, কোন্ মধুময় মুহূর্ত্তে ঐরূপ দেবী-প্রতিমা দেখিয়াছিল। তাহার পর আর কিছু মনে পড়িল না। অন্নপূর্ণা কহিল, “ভগিনি, তুমি আমার স্বামীর প্রাণ দান করিয়াছ, তোমায়

কোনরূপ প্রতিদান দিব, সে আশাও আমি রাখি না, সে সাধ্যও আমার নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, পতির প্রাণ ফিরিয়া পাইলে পত্নীর হৃদয় কিরূপ কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়, তা তোমার অবিদিত নাই; সে কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে আমি তোমায় চিরদিন মনের আসনে বসাইয়া পূজা করিব। চিরদিন তোমার কৃত উপকার আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। লোকে উপকারীর উপকার যেমন দুই দিন পরে ভুলিয়া যায়, তাহা ভুলিব না।”

চন্দ্রা। ভগিনি! আমি অভাগিনী; কখনও পতিপদসেবা করিতে পাই নাই; স্বামি-ভক্তিও কখনও শিখি নাই। তুমি আদর্শ রমণী,—আমি তোমায় প্রণাম করি।

অলক্ষ্যে দুই বিন্দু অশ্রু চন্দ্রার নয়নপ্রান্তে দেখা দিল। ক্ষিতীশ তাহা দেখিল। অন্নপূর্ণা কিন্তু দেখিতে পাইল না।

চন্দ্রা গাড়ীতে উঠিল। ক্ষিতীশ ও অন্নপূর্ণা তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আসিল। শুষ্ক মুখে সরল হাসি হাসিয়া অন্নপূর্ণা কহিল, “বড় দুঃখ রহিল, ভগিনী, কে তুমি, তাহা জানিতে পারিলাম না। যদি তোমার পরিচয় পাইতাম, এক একবার সহোদরার গৃহে গিয়া আদর ও স্নেহ ভিক্ষা করিয়া লইয়া আসিতাম।”

এইবার চন্দ্রার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে উত্তর করিল, “শুনিবে ভগিনি, আমি কে? আমার নাম চন্দ্রা। আমিই তোমার সুখের পথে কণ্টক ছিলাম। আমিই তোমাকে মজাইতে বসিয়াছিলাম। আমারই বাটীতে তুমি একদিন

সামান্য ভিক্ষুকের ন্যায় আসিয়া আমার নিকট স্বামী ভিক্ষা চাহিয়াছিলে !”

গাড়ী চলিয়া গেল। নিদ্রিত গৃহস্থ জাগরিত হইয়া নিজ বক্ষে কালসর্প দেখিয়া যেরূপ স্তম্ভিত হয়, ক্ষিতীশ ও অন্নপূর্ণার অবস্থা ঠিক সেইরূপ হইল। বহুক্ষণ কাহারও মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

এই দিন হইতে ক্ষিতীশের জীবন-স্রোত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে একবারে নূতন মানুষ হইয়া পড়িল। ভবিষ্যতে তাহার সম্বন্ধে অনুযোগ করিবার আর কিছু রহিল না।

* * * * *

বিধাতার বিচিত্র মহিমা ! সেইদিন সন্ধ্যা হইতে চন্দ্রার জ্বর দেখা দিল। যত রাত্রি হইতে লাগিল, জ্বরের প্রকোপ ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে নানারূপ প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। রাত্রিপ্রভাতেই, কেবলমাত্র যখন সূর্য্যের স্বর্ণাভ রশ্মি গবাক্ষ ভেদ করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, সেই আলোকে চন্দ্রা স্পষ্ট দেখিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ বসন্তে ছাইয়া গিয়াছে ! সে বুঝিল, সংক্রামক ব্যাধি তাহার মুখের গ্রাস হারাইয়া, তাহাকেই গ্রাস করিতে আসিয়াছে। সে তজ্জন্য প্রস্তুত হইল। সিস্‌টার অপরাজিতা আজ দুই দিন হইল কাশী চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট জরুরী ‘তার’ প্রেরিত হইল। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সভ্যগণ আসিয়া চন্দ্রাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। ভাল ডাক্তার, ভাল ঔষধ,

কিছুরই ত্রুটি হইল না। পরিশেষে তাঁহারা বুঝিলেন, কালের ঔষধ নাই।

তৃতীয় দিন রাত্রে চন্দ্রার অবস্থা যারপরনাই মন্দ হইয়া দাঁড়াইল। রাত কাটিবে, এমন ত' বোধ হয় না। সিস্‌টার অপরাজিতাকে দেখিবার জন্য চন্দ্রার প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, মৃত্যুকালে সেই অপূর্ব্বত্যাগশালিনী বিশ্বরূপিণী শিক্ষাদাত্রীর চরণযুগল না দেখিলে তাহার ইহজন্মের একটা মহা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া যাইবে। দেখিতে দেখিতে তাহার চৈতন্য লুপ্ত হইল। নিশাবসানে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল; সে যেন অন্ধকূপের ন্যায় একটা অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ রহিয়াছে; সে ঘরে সূর্য্যালোক কখনও প্রবেশ করিতে পায় না, বাতাস মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া কাছে গিয়া—আবার কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসে। নানারূপ দুর্গন্ধময় বিষাক্ত কীট পতঙ্গ তথায় অবাধে বিচরণ করিতেছে। সেই সমস্ত জীব এক একবার আসিয়া তাহার অঙ্গের উপর পড়িয়া মনের সাধে দংশন করিতেছিল। রক্ত-মোক্ষণে দুর্ব্বল হইয়া সে এক একবার ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল। সেই তমসাচ্ছন্ন ভীষণ কক্ষমধ্যে তাহার সেই কাতর আর্ত্তনাদ প্রতিধ্বনিত হইয়া সেই মুহূর্ত্তে সেইখানেই মিলাইয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তীব্র আলোকে সে গৃহ আলোকিত হইয়া উঠিল। সেই আলোকমধ্যে ও কাহার মূর্ত্তি প্রকটিত হইল?

কি সর্ব্বনাশ! চন্দ্রা শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার সর্ব্ব-

শরীর কাঁপিতে লাগিল। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া সে অনিমেষে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। এ যে তাহার মৃত স্বামীর মূর্ত্তি! সে মুখ চন্দ্রা ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ স্পষ্ট দেখিল। স্পষ্ট মনে পড়িল। কৃতাঞ্জলীপুটে কাঁদিতে কাঁদিতে অনুতাপের তীব্র জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "স্বামী! প্রভু! প্রাণেশ্বর! আমায় রক্ষা কর। আমি বড় ক্লেশ পাইতেছি।" চন্দ্রার স্বামী হাসিয়া উঠিল। সে হাসি বিদ্রূপের, ঘৃণার, উপেক্ষার! হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "তোর লজ্জা নাই, আমার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতেছিস্? অনন্তকাল এই অনন্ত নরক-সদৃশ গৃহে তোকে বাস করিতে হইবে। তোদের মতন রমণী সংসারের আবর্জ্জনা, বিধাতার অভিশাপ, পৃথিবীর দুরদৃষ্ট।" চন্দ্রা আবার কাঁদিতে কাঁদিতে, কাঁপিতে কাঁপিতে, পতিপদতলে পতিত হইয়া করযোড়ে কহিল, "বলিয়া দাও প্রভু! কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে আমার উদ্ধার হইবে?" চন্দ্রার স্বামী এইবার সংযত-কণ্ঠে উত্তর করিল, "প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের কর্ত্তা আমি নই। ওই দেখ্—তোর সম্মুখে কে!—তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা কর্। বোধ হয় তোর গতি হইতে পারে।" অকস্মাৎ সহস্র সহস্র আলোকমালায় সে গৃহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ধূপ, ধূনা ও পদ্মগন্ধে সে স্থান আমোদিত হইল। চন্দ্রা দেখিল, যাঁহার নামে আজ পৃথিবীর সহস্র সহস্র নর-নারী সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিতেছে, ঘোরতর পাতকী ও পতিতাকে

যিনি অসঙ্কোচে অঙ্কে টানিয়া লন, যাঁহার পট-পূজা করিয়া সে অভাগিনী হইয়াও আপনাকে সৌভাগ্যশালিনী বলিয়া মনে করে, যাঁহার নামের দোহাই দিয়া সে পরহিত-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া জনসমাজে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, এ যে সেই কাঙ্গালের ঠাকুর, দীনহীনের সর্ব্বস্ব, পাপী ও পুণ্যাত্মার অপক্ষ-পাতী আশ্রয়দাতা শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ দেব! পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় হাসির রাশি ছড়াইয়া ঠাকুর কহিলেন,—"মা, চিন্তা করিও না; বৃহৎ সংসার পড়িয়া রহিয়াছে; কার্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত; সামগ্রী বাছিয়া লও। যে তোমাকে পথ দেখাইবে, তোমার কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিবে, তোমাকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইবে, শীঘ্রই তাহাকে পাঠাইয়া দিতেছি।"

এমন সময়ে চন্দ্রার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পীড়ার যন্ত্রণার অপেক্ষা প্রাণের যন্ত্রণায় সে এত ব্যাকুল হইয়া পড়িল যে, বুঝি আর এক মুহূর্ত্তও কাটে না। বুঝি সিস্‌টার অপরাজিতার সহিত তাহার আর দেখা হইল না। বুঝি হতভাগিনীর অন্তিমের সাধ পূর্ণ হইল না।

ঠাকুরের পদাশ্রয় যে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সাধ কি অপূর্ণ থাকে? ঠিক এই সময়ে সিস্‌টার অপরাজিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারি চক্ষে মিলন হইল। চন্দ্রার চ'খে জল, অপরাজিতার চ'খে জল! ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী আজ মহাসাগরে মিশিতে চলিয়াছে। বিন্দু আজ সিন্ধুবক্ষে বিলীন হইতেছে। অমাবস্যার ঘনান্ধকার আজ পূর্ণিমার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

বুঝি অপরাজিতাকে দেখিবার জন্য চন্দ্রা কোনওরূপে প্রাণ-টুকুকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। সে চলিয়া যাইবার জন্য জোর করিতেছিল, চন্দ্রা তাহাকে ছাড়িবে না! অপরাজিতা চন্দ্রার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন, তাহার মাথায় হাত দিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন, বুঝিলেন সময় সন্নিকট। চন্দ্রা কথা কহিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। তাহার চক্ষু ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া আসিতে লাগিল। অপরাজিতা চন্দ্রার কাণের কাছে মুখ আনিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন—"জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ!" চন্দ্রা অতি অস্ফুটস্বরে কহিল—"জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ!" তাহার পর সব শেষ হইয়া গেল।

পাঠক! বলিতে পার, এইবার চন্দ্রার স্থান কোথায়? স্বর্গে না নরকে? আমাদের বোধ হয়, স্বর্গেও নয়—নরকেও নয়!—মাঝামাঝি এমন একটা স্থানে,—যথায় তুমি আমি বহু সাধ্য-সাধনায়ও যাইতে পারিব না।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিরুপমা আরোগ্য লাভ করিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সে এক প্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুই হাতে চারি গাছি করিয়া আট গাছি সোনার চুড়ী ব্যতীত তাহার আর কিছুই নাই। বেনারসী ও সিল্কের কাপড় চোপড় পর্য্যন্ত বাঁধা পড়িয়াছে। এমন কি বড় বড় পিতলের থালা ও বাটি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ছয় মাসের বাড়ী ভাড়া বাকি পড়ায় বাড়ীওয়ালা তাহার নামে ছোট আদালতে নালিস রুজু করিয়াছে!—এই ত' অবস্থা! শুধু তাহাই নহে, রোগমুক্ত হইয়াও তাহার শরীরের স্থানে স্থানে যেরূপ কুৎসিত উপসর্গ দেখা দিয়াছে, তাহাতে জনসমাজে মুখ দেখাইবার তাহার আর উপায় ছিল না। ঠোঁট দুইখানি সাদা হইয়া গিয়াছে, হস্তপদাদির স্থানে স্থানে চামড়া উঠিয়া গিয়া এমন একটা বর্ণ বাহির হইয়াছে, যাহা দেখিলে জনসাধারণে তাহাকে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ বলিয়া অভিহিত করিবেই করিবে। কিন্তু সে যথার্থ কুষ্ঠ কি না, তাহা আমরা সঠিক বলিতে পারি না। আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত ডাক্তার অনঙ্গমোহন নিরুপমার চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি তাহাকে আশু রোগমুক্ত করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে 'ক্যালোম্যাল' অর্থাৎ পারদ-মিশ্রিত ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন। বোধ হয়, তাহারই বিষময় ফলে নিরুপমার আজ এই দুর্দ্দশা!

সে শ্রী নাই, সে কান্তি নাই, সে দীপ্তি নাই, সে উন্মাদনা-শক্তি নাই,—এখন সে সমাজের হেয়! কোনও ভদ্র ব্যক্তি তাহার সহিত একত্রে বসিবে না, আহার করিবে না, পান করিবে না! এমন কি তাহার স্বজাতি ও স্বজনবর্গ তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে!

হায়রে অভিনেত্রীর রূপ! যাহার প্রভায় একদিন তুমি সংসার মাতাইয়া তুলিয়াছিলে,—যে তীব্র রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া তুমি একদিন পার্থিব রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করিয়াছিলে,—যে নয়নের সম্মোহনবানে তুমি একদিন বড় বড় শিকার নিমেষ-মাত্রে শেষ করিয়াছিলে, আজ তোমার এই দশা! অথবা ক্ষুদ্র মানব আমরা, গভীর সৃষ্টি-রহস্য কেমন করিয়া বুঝিব? বিধির অজ্ঞেয় বিধান কেমন করিয়া উপলব্ধি করিব? কাল-চক্রে কে কখন্—কেমন করিয়া—কি ভাবে নিষ্পেষিত হইতেছে, কোন্ বিদ্যাবলে তাহা জানিব? সে যাহা হইবার হউক, আমরা আমাদের কথা শেষ করি।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; শুক্ল পক্ষের রজনী হইলেও চন্দ্রদেব আজ আর উঁকী পাড়িতেছেন না,—একবার মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মুখ বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই খণ্ড খণ্ড মেঘ আসিয়া তাঁহার বদন-মণ্ডল আবৃত করিয়া দিয়াছে। পশ্চিমাকাশ অতি ধীর ও মন্থর গতিতে ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। নিরুপমা একাকিনী তাহার বাটীর ছাদে বসিয়া নৈশগগনের পানে চাহিয়া চাহিয়া নিজ হৃদয়ের অতলতলে তলাইয়া গিয়া—

আপনার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের বিষয় চিন্তা করিতেছিল। রোগ শয্যায় শারিতাবস্থায় সে মরণের জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এখন আর সে সাহস নাই। ঘোরতর মনের বিকার যখন আত্মহারা করিয়া ফেলে, সেই সময় আত্মহত্যার কল্পনা এক একবার তাহার মনে উদিত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই জলবিম্বের ন্যায় তাহা মিলাইয়া যায়; ভয়, ভাবনা, বিভীষিকা দানবী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তাহাকে বিকট ভ্রূভঙ্গী দেখায়। আতঙ্কে সে সহস্র হস্ত পিছাইয়া যায়!

কেন এমন হয়? বাঁচিলে যাহার দুঃখ বই সুখ নাই, মরিলে যে বাঁচিয়া যায়, মৃত্যুই যাহার একমাত্র প্রিয় সহচরী, সে মরিতে ভয় পায় কেন? বোধ হয় ইহলোকের প্রায়শ্চিত্ত শেষ না হইলে, বিশ্বরাজ্যের অধিপতি মৃত্যুর অধিকারও কাহাকেও দেন না!

নিরুপমা যখন গভীর চিন্তায় মগ্ন, সেই সময় ডাক্তার অনঙ্গমোহনকে সঙ্গে লইয়া নটবর তথায় উপস্থিত হইল। নিরুপমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিশিষ্ট শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া বলিল,—"আসুন, আসুন; আমার কি সৌভাগ্য—আজ বিনা আহ্বানে আপনার দর্শন পাইলাম।"

অনঙ্গমোহন এক গাল হাসি হাসিয়া বৃহৎ দন্ত দুই-পাটি বাহির করিয়া উত্তর করিল,—"তুমি ত' আর ডাকিলে না, কাজেই নিজে আসিলাম। তোমাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য আমি কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা ত' তোমার অবিদিত

নাই। আজ এইখানে একটু খাওয়া দাওয়া আমোদ আহ্লাদ করিব, এই আশায় আসিয়াছি।”

নিরুপমা বলিল,—“এ ত’ আমার সৌভাগ্য, আমি এখনই তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।”

অতঃপর নটবরকে অন্তরালে লইয়া গিয়া সে কহিল,—“এখন উপায় কি ? হাতে ত’ বারোগণ্ডা পয়সা ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাহাতে সব কুলাইবে কি ?”

নটবর কর্কশ কণ্ঠে উত্তর করিল,—“তুই কি ন্যাকা হইলি নাকি ? বারোগণ্ডা পয়সায় কি ইয়ারকি হয় ? এক বোতল ব্রাণ্ডী তিন টাকা, দুই সের মাংস আঠার আনার কম হইবে না ; তাহার উপর ঘি আছে, মশলা আছে, মিষ্টি আছে, দই আছে ; অন্ততঃ দশটা টাকা চাইই চাই।”

নিরুপমা।—আমার তো আর কিছুই নাই ; আমি কোথায় পাইব ?

নটবর।—তা আমি কি জানি ?

নিরুপমা।—তুমি কাহারও নিকট হইতে দশ টাকা ধার করিয়া আমায় আনিয়া দাও, আমি পরে দিব।

নটবর।—তোর মুখে মারি ঝাঁটার বাড়ি ! তোর জন্যে আমি পরের কাছে হাত পাতিতে যাইব ? কেন, আমার কি আর কেউ নাই নাকি ? তোর হাতের এক গাছা চুড়ি খুলিয়া দে’,—আমি তাই বন্ধক দিয়া সব যোগাড় করিয়া আনিতেছি।

নিরুপমা কাঁদিতে লাগিল ; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

"তোমার দয়া মায়া একেবারে নাই ? এ চুড়ি কয়গাছি যে আমার শেষ সম্বল ! তাহাও ঘুচাইতে তুমি পরামর্শ দিতেছ ?"

নটবরের স্বর আরও রুদ্ধ হইল। সে মুখভঙ্গীসহকারে কহিল,—"আখেরের ভাবনা ভাবিবি ত' প্রেম করিতে আসিয়াছিলি কেন ? আমি চলিলাম, আর তোর মুখদর্শন করিতে চাহি না। একজন ভদ্রলোককে বাড়ীতে আনিয়া এইরূপ অপমান ?"

নিরুপমা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া হাতের এক গাছি চুড়ি খুলিয়া দিল। নটবর অনঙ্গমোহনের সম্মতিগ্রহণ করিয়া মদ ও মাংসের যোগাড়ে বাহির হইয়া গেল।

পর-নারীর প্রেমাস্বাদনে চিরাভ্যস্থ অনঙ্গমোহন—নিরুপমাকে নির্জ্জনে পাইয়া একটু রসিকতা আরম্ভ করিল। নিরুপমার তাহা ভাল লাগিল না,—সে অন্য কথার অবতারণা আরম্ভ করিল। বলিল,—"ডাক্তার বাবু, আপনি কিরূপ ঔষধ আমাকে খাওয়াইলেন ? আমার হাতে পায়ে মুখে এরূপ সাদা সাদা দাগ হইল কেন ? সমাজে আমি বাহির হইব কি করিয়া ?"

অনঙ্গমোহন গম্ভীরভাবে উত্তর দিল,—"যত অপরাধ বুঝি আমার ঔষধেরই হইল ? কথায় বলে—'তোমার সর্ব্বাঙ্গে ঘা—ঔষধ দিই কোথায়' ? তুমি যে রোগ টানিয়া আনিয়াছিলে, তাহাতে এত দিন গলিয়া খসিয়া পচিয়া মরিয়া যাইতে। আমি চিকিৎসা করিয়াছিলাম বলিয়াই তুমি বাঁচিয়া উঠিয়াছ। শেষে—কৃতজ্ঞতার পুরস্কার বুঝি আমারই ঔষধের উপর দোষারোপ !"

নিরুপমা আর কোনও কথা কহিল না। অনঙ্গমোহনও

মহাবিরক্ত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এ নীরবতা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। একবার মনে করিল, উঠিয়া চলিয়া যাই; কিন্তু পারিল কই? পরের পয়সায় মদ ও মাংস ভক্ষণের প্রলোভন সে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নটবরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী লইয়া নটবর ফিরিয়া আসিল। ছাদের উপরেই স্পিরিট-ষ্টোভ্ জ্বালাইয়া সে রান্না আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের উপর পাত্র সুরা চলিতে লাগিল। যখন অনঙ্গমোহন ও নটবরের নেশা বেশ একটু জমিয়া আসিল, তাহারা উভয়ে মিলিয়া নিরুপমাকে এক গ্লাস খাইবার জন্য মহাজেদ আরম্ভ করিল। নিরুপমা অনেক দিন মদ ছাড়িয়া দিয়াছিল, আজও পান করিতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না; কিন্তু নটবর যখন মহারাগতঃ হইয়া—তাহার অনুরোধ রক্ষিত হইল না বলিয়া—নিরুপমার চুলের মুঠি ধরিয়া একটি চড় মারিয়া বিদায় লইবার উপক্রম করিল, তখন নিরুপমা নিরুপায় হইয়া এক পাত্র গলায় ঢালিয়া দিল! সুরার অপূর্ব্ব মহিমা! একবার একটু পেটে পড়িলেই, মগজটার ভিতর একটু নাড়াচাড়া হইলেই, সে তখন আপনার আধিপত্য সম্পূর্ণরূপ বিস্তার করে। এক পাত্রের পর আর এক পাত্র, তাহার পর আর এক পাত্র, তাহার পর আর এক পাত্র,—নিরুপমার বেশ চলিয়া গেল। ক্ষুধিত রাক্ষস যেরূপ সাগ্রহে নরমাংস ভক্ষণ করে, ডাক্তার অনঙ্গমোহন পরের পয়সায় মদ পাইয়া মহা উৎসাহে গ্লাসের উপর গ্লাস গলাধঃকরণ করিতে

লাগিল। প্রথমে দুই একবার একটু জল মিশাইয়া পান করিতে-ছিল বটে, কিন্তু নেশা একটু চড়িতেই বোতল ধরিয়া পান করিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে, সে ভয়ানক মাতাল হইয়া পড়িল, চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। বিকটস্বরে কুৎসিত গীত জুড়িয়া দিল, দুই হাতে পেণ্টুলনের দুই পার্শ্ব ধরিয়া তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করিল। নটবরের আজ তেমন নেশা হয় নাই; কিন্তু নিরুপমা নেশায় ভরপুর! সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ওরে বেটা ডাক্তার! তুই আমার সর্ব্বনাশ করিলি! আমাকে বিষাক্ত ঔষধ খাওয়াইয়া আমার ইহকাল নষ্ট করিয়া দিলি! মুঠো মুঠো টাকা লইলি, আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিলি, অথচ আমার ভবিষ্যতের পথ আগুন জ্বালিয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলি! যদি ভগবান্ থাকেন, ইহার বিচার হইবেই হইবে। নচেৎ আর চন্দ্র সূর্য্য উঠিবে না, আর দিন রাত্রি হইবে না, পাপ-পুণ্যের প্রভেদ রহিবে না।"

অভিমানোন্মত্ত অনঙ্গমোহন ক্রোধান্ধ হইয়া নিরুপমাকে পদাঘাত করিল। সুরাপানোন্মত্ত নিরুপমা কাঠের চেলা তুলিয়া লইয়া অনঙ্গমোহনের মস্তকে সজোরে আঘাত করিল; রক্তস্রোত দর দর ধারে প্রবাহিত হইল। নটবর দেখিল, শ্রাদ্ধ বিশেষরূপ গড়াইতে বসিল; সে অনঙ্গমোহনের মনস্তুটির জন্য নিরুপমাকে ধরিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার আরম্ভ করিল। নিরুপমা চেঁচাইতে লাগিল,—"ওরে তোর পায়ে পড়ি, আমাকে মারিস নি'—আমি মরিয়া যাইব।"

অনঙ্গমোহন তাহার অপমানের সম্পূর্ণ প্রতিশোধ হইয়াছে বুঝিয়া, মাঝে পড়িয়া নটবরকে সরাইয়া দিল। ছাদের উপর পড়িয়া—দুই হাতের উপর মুখ চাপিয়া নিরুপমা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। এই অবসরে অনঙ্গমোহন বোতলের তলানি টুকু একেবারে উদরস্থ করিল। মাতালের খেয়াল বড় মজার জিনিস! সে দিন দিন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে! কোনও দিন রাজা হইয়া লোক জনকে ফাঁসি দিতে যায়, কোনও দিন ভিক্ষুক হইয়া কেবল ক্রন্দন আরম্ভ করে, কোনও দিন বক্তা সাজিয়া অবিরাম বক্তৃতার স্রোত চালায়, আবার কোনও দিন পাখী সাজিয়া পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতে চায়! অনঙ্গমোহনের আজ উড়িবার সাধ হইল; সে ছাদের আলিসার উপর দাঁড়াইয়া দুই হাত পক্ষপুটের ন্যায় বিস্তার করিয়া বলিতে লাগিল,—"নটবর! আমি উড়িব—আমি উড়িব—আমি উড়িব!"

তখন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। ঘন ঘন বজ্রনিনাদ হইতেছে। আকাশ বিদ্যুতের মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া এক একবার বিকট হাসি হাসিতেছিল।

নটবর তখন পাঁঠার হাঁড়িতে হাতা নাড়িতেছিল; সে হাতা ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি অনঙ্গমোহনকে আসিয়া ধরিল। কিন্তু অসুর বিক্রম অনঙ্গমোহন তাহাকে ধাক্কা দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া—"আমি উড়্ব—আমি উড়্ব'—আমি উড়্ব" বলিতে বলিতে ছাদ হইতে ঝম্প প্রদান করিল!

বলা বাহুল্য—সেই পতনের গুরুতর আঘাতেই তাহার ইহলীলার অবসান হইল !

নটবর মহাবিপদ গনিল। বুঝিল, এইবার পুলিস আসিয়া তাহাদের হাতে হাতকড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। খুনী চার্জ্জে পড়িয়া হয় ফাঁসী, না হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কেহ খণ্ডাইতে পারিবে না। সে তাড়াতাড়ি নিরুপমাকে তুলিল; তাহাদের বিপদের কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিল। নিরুপমার বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; ভয় ও ভাবনায় সে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইল। উভয়ে পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিল—যে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া, দুই চারি খানা কাপড় চোপড় বাঁধিয়া লইয়া, আহিরিটোলার ঘাট হইতে নৌকায় চড়িয়া আপাততঃ কালিঘাটে গমন করিয়া রাত্রিযাপন করিবে। প্রাতেই চুড়ি কয়গাছি বেচিয়া রেলে চড়িয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া পলাইবে।

ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত মাথায় করিয়া—প্রকৃতির বিভীষিকাময়ী লীলার মধ্য দিয়া—তাহারা আহিরিটোলার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঁঠার হাঁড়ি ছাদের উপর পড়িয়া বৃষ্টির জলে তখন কাঁদিয়া মরিতেছিল।

সেই দুর্য্যোগে কোনও মাঝি নৌকা বাহির করিতে চাহে না। নটবর বলিল,—"যে আমাদের কালিঘাটে পহুঁছাইয়া দিবে, আমি তাহাকে পাঁচ টাকা বক্‌শিস্ করিব।"

একজন মাঝি সম্মত হইয়া নটবর ও নিরুপমাকে নৌকায়

তুলিল ; অতি কষ্টে সে নৌকা ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতি আরও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিল। এরূপ প্রবল ঝড় উঠিল যে, বিশ্ব বুঝি উড়িয়া যায়—ক্ষুদ্র নৌকা ত' কোন্ ছার ; মাঝি প্রাণপণে হাল ধরিয়া নৌকা সামলাইবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনা ! হালের দড়ি ছিঁড়িয়া গিয়া নৌকা একেবারে উল্টাইয়া গেল ! মাঝি ও দাঁড়িরা ঝুপ্‌ঝাপ্ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। সে সময় সেই পাপী ও পাপিনীর মর্ম্মভেদী চীৎকার যদি কেহ শুনিত, মৃত্যুর গ্রাস হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সে উন্মত্ত আগ্রহ যদি কেহ দেখিত, বাত্যাবিক্ষুব্ধ চপলা-চমকিত চঞ্চল জল রাশির বক্ষে ভাসমান—সেই পিশাচ ও পিশাচীর জীবন-সংগ্রামে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাণপণ আকুলি বিকুলি যদি কেহ বুঝিত,—তবে তাহার পাষাণ হৃদয় হইলেও তাহা বিগলিত হইত। কিন্তু হায় ! সেই নররূপী রাক্ষস ও রাক্ষসীর কাতর প্রার্থনা করুণাময়ের পদপ্রান্তে পহুঁছাইল না ! সেই গঙ্গাগর্ভেই তাহাদের লীলাখেলা শেষ হইয়া গেল।

কোথায় তুমি অভিনেত্রী ? কোথায় আজ তোমার সেই রূপ ? যে রূপে নলিনীকে মজাইয়াছিলে—তাহার সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত করিয়াছিলে,—যে রূপ গর্ব্বে এক দিন এত বড় পৃথিবী,—ক্ষুদ্র—নগণ্য—অতি তুচ্ছ বলিয়া তোমার চক্ষে প্রতীয়মান হইয়াছিল,—সেই তুমি—আজ কোথায় ? তোমার সেই রূপ—আজ কোথায় ?

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সাধু সহবাসে—পবিত্র সঙ্গে—ধূপ ধূনা ও পুষ্প চন্দনাদির মধ্যে বাস করিয়া,—তিনমাস কাল নলিনীর আল্‌মোরার মঠে কাটিয়া গেল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার চরিত্রে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে যেন আর একটা জগতে আসিয়া, আর একটা ধাতুতে গড়া, নূতন মানুষ হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যে নলিনীর মনে হইত,—"যাহার অর্থের স্বচ্ছলতা নাই, তাহার মরণই মঙ্গল",—এখন সেই নলিনী বুঝিতে শিখিয়াছে,—'অর্থই অনর্থের মূল'! ও বালাই পকেটে না থাকিলে, কুপ্রবৃত্তি জাগরিত হয় না, ছদ্মবেশী সুহৃদ্‌বর্গের অত্যাচার সহ্য করিতে হয় না,—তাহাদের মদ্য ও মাংস যোগাইয়া—পশ্চাৎ ফিরিলেই—সঙ্গে সঙ্গে গালাগালি খাইতে হয় না। উঁচু ও অস্বাভাবিক চাল চালিবার জন্য প্রাণ লাফাইতে থাকে না! দুঃখের সংসারে—যদি কেহ কণামাত্র সুখ অর্জ্জন করিতে চায়, তবে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়,—এই মোটা পৃথিবীতে—কেবল মাত্র মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের খবর রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা!

সে বেশী দিনের কথা নহে, যখন নলিনীর মনে হইত, দুই দিনের জন্য মাটীর খেলা ঘর গড়িয়া খেলিতে আসিয়া মনের সাধ মিটাইয়া আমোদ আহ্লাদ করা ছাড়া,—জীবনে আর কি কাজ থাকিতে পারে?

না—তা নয়! নলিনীর উড়ো মন এখন চুপ্ চাপ্ দাঁড়ে বসিয়াছে; তাহার পাখা ঝরিয়া গিয়াছে। সে শান্ত ও শিষ্ট বালকের মত নলিনীকে বুঝাইয়াছে,—'ও সব বাজে কাজ, কাজের মত কাজ ঢের আছে; আমি তোমাকে কার্য্যে ব্রতী করিব। আমাকে বালক মনে করিয়া হাসিও না। আমিই পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুবের বুকে বসিয়া, তাহাকে ব্যাঘ্র ভল্লুকের কবল হইতে বাঁচাইয়া ছিলাম,—আবার আমিই কিন্তু অতি বৃদ্ধ—হরিভক্তি পরায়ণ—ঋষিকূল চুড়ামণি নারদকে নীচ জাতীয়, নগণ্য রমণীর প্রেম-কুহকে নাচাইয়া ছিলাম! আমাকে বিশ্বাস করিও।'

মনের চোকা চোকা কথা শুনিয়া, নলিনীর চৈতন্য সম্পাদন হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, সে এখন নূতন মানুষের—নূতন স্তরে গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া সে দুর্গাকে ভুলিতে পারে নাই, একমাত্র সন্তানকে ভুলিতে পারে নাই, পূজনীয়া জননীর পাদপদ্ম বিস্মৃত হয় নাই। যখন তখন উঠিতে বসিতে—চলিতে ফিরিতে—প্রবল ঝটিকার ন্যায়—ওই তিন খানা মুখ তাহার বুকের ভিতর বড় জোরে জোরে ধাক্কা দিত! ভুলিবার যো কি! নলিনী মানুষ তো বটে!

একদিন প্রাতঃকালে, ঠাকুরের ভোগারতি হইয়া যাইবার পর, স্বামী বিমলানন্দ মঠের এক কক্ষে বসিয়া নলিনীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে ডাক্‌পিয়ন আসিয়া একখানি পত্র দিল; পত্রখানি নলিনীর,—কলিকাতা হইতে

আসিয়াছে। নলিনীর প্রাণের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, প্রশান্ত হৃদয় অশান্ত হইয়া কাঁদিবার উপক্রম করিল, সে যেন কেমন হইয়া গেল। মৃদু হাস্যের সহিত বিমলানন্দ কহিলেন, "অধীর হইতেছ কেন? অগ্রে পত্র পাঠ কর; স্বরূপ বৃত্তান্ত—আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।" নলিনী চিঠিখানি আদ্যপান্ত পড়িল।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

স্নেহের নলিনী!

ছোট বউমার নিতান্ত জেদ ও নিষেধ সত্ত্বেও তোমাকে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। এতদিন তাঁহার কথায় চাপিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আর চাপিয়া রাখিলে, আমাকে জগদীশ্বরের নিকট অপরাধিনী হইতে হইবে। তুমি এখান হইতে চলিয়া যাইবার এক সপ্তাহ পরেই—ছোট বউমা বিছানা লইয়াছেন। জ্বর ও যকৃতের পীড়া অত্যন্ত যন্ত্রণা দিতেছিল; চিকিৎসা যথা সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু কোনও ফলোদয় হয় নাই। জ্বর একদিনের জন্যও ছাড়ে নাই। রোগের যন্ত্রণায়—ঘুম ও খাওয়া একেবারে গিয়াছে। প্রায় তিন মাস কাল ভীষণ ব্যাধির সহিত যুদ্ধ করিয়া, গত কল্য রাত্রি হইতে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন। সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। কেবল মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ নিশ্বাস—এবং চোখের কোলে ফোঁটা ফোঁটা জল দেখা দিতেছে

মাত্র। আমি বড় অভাগিনী, মরিলেই নিশ্চিন্ত হই। আমার চারি দিকে বিপদ! তোমার বড় দাদা পাগলের মত হইয়াছেন। কি বলেন, কি করেন, কিছুরই স্থিরতা নাই!—আমি যে কি করিব, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। আমার শপথ।

আশীর্ব্বাদিকা—

তোমার মাতা।

পত্র-পাঠ সমাপ্ত হইতে না হইতে, বিমলানন্দের চিরহাস্যময় মুখমণ্ডল গভীর ও গম্ভীরভাবাপন্ন হইল। নলিনী কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, "ভাবিয়া কি হইবে? চিন্তা-সাগরে ডুব দিলে যদি ঘটনার পরিবর্ত্তন হইত, তবে মানুষ নিত্য নিত্য ভাব-সমুদ্রের সৃষ্টি করিত। বিলম্বে প্রয়োজন নাই, কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। আগামী শনিবার—রাত্রি দ্বিপ্রহরে, দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানে, পঞ্চবটী বৃক্ষতলে—আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

সেই দিনই স্বামী বিমলানন্দ নলিনীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তুমি আমি প্রাণপণে ফাঁশ কাটাইবার চেষ্টা করিলেও,—যতক্ষণ না ফাঁশের কর্ত্তা দড়ীর বাঁধন আল্গা করিয়া দেন, ততক্ষণ আমাদের সাধ্য কি, কিছু করিতে পারি! গেরো আরও শক্ত হইয়া যায়!

* * * * * *

নলিনী কলিকাতায় পঁহুছিয়া—বাটী-প্রবেশের পূর্ব্বে তথায় যে দৃশ্যের অভিনয় চলিতেছিল, তাহারই স্বরূপ চিত্র এইবার আমরা পাঠকবর্গের চক্ষের উপর ধরিতেছি।

যামিনীভূষণের মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার কথা আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আজ তাঁহার এক অদ্ভুত খেয়ালের প্রসঙ্গ আমরা লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার মনে এক ধারণা জন্মিয়াছে যে বড়লাট বাহাদুর তাঁহার নিকট হইতে দুই কোটী টাকা কর্জ্জ লইয়াছেন, সুদে ও আসলে প্রায় তিন কোটী টাকা হইয়া গিয়াছে। টাকা আর কোনও মতেই ফেলিয়া রাখা উচিত নহে! সেই জন্য তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন,—লাট সাহেবের সহিত স্বয়ং দেখা করিতে যাইবেন, এবং যেমন করিয়াই হউক—টাকা আদায় করিয়া লইয়া আসিবেন! এক মুস্কিল হইয়াছে, লাট-সকাশে যাইবার তাঁহার উপযুক্ত পোষাক নাই। তাই তিনি হোয়াইট্‌ওয়ে-লেড্‌ল, হল্ অ্যাণ্ডরসন্, র‍্যান্‌কিন্, ফেল্পস্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ টেলার্সগণকে পত্র লিখিয়াছেন,—তাঁহারা যেন ভাল ভাল পোষাক লইয়া তাঁহার সহিত পত্রপাঠ আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। বাড়ীর সদরে ভাড়াটিয়া ফার্ষ্ট ক্লাস্ ফীটনের গাঁদি লাগিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন স্থানের কর্ম্মপটু কর্ম্মচারিগণ নানাবিধ পোষাক লইয়া যামিনীভূষণের ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন। যামিনীভূষণ একে একে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, আর উচ্চ হাস্যের সহিত বলিতেছেন, "এ আমার উপযুক্ত নয়। আগা গোড়া মোহর বসান চাই,—সঙ্গে সঙ্গে

সাঁচ্চা মুক্তার কাজ চাই, গলার দুই ধারে বড় বড় পান্না বসাইবার দরকার, পিঠে—যেখানে পান হইবে, সেইখানটায় অন্ততঃ লক্ষ টাকার কমল হীরার প্রয়োজন !! এ সকল বাজে জিনিস আনিয়া আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছ কেন বাপু ?”—বলিয়াই হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন, এবং দক্ষিণ হস্ত খুব জোরে জোরে দুলাইতে দুলাইতে তাঁহার বিস্তীর্ণ হলঘরের এ-দিক ও-দিক বেগে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বণিকদিগের স্বরূপ ব্যাপার বুঝিতে বড় বিলম্ব হইল না,—তাঁহারা সকলেই বিরক্ত হইয়া “ড্যাম্”, “ফুল”, “লুনাটিক্” ইত্যাদি আখ্যায় যামিনীভূষণের মান বৃদ্ধি করিতে করিতে একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যামিনীভূষণ কোনও কথা না কহিয়া কাগজ কলম লইয়া লাট সাহেবকে পত্র লিখিতে বসিলেন। তাহার ভাবার্থ এই যে, তাঁহার মর্য্যাদানুযায়ী পোষাক কোনও ফারম্ সরবরাহ করিতে পারিল না, তাই তিনি ধুতি চাদর পরিয়াই লাট-ভবনে উপস্থিত হইবেন, ইহাতে তিনি যেন অসভ্য বলিয়া বিবেচিত না হন !! এমন সময়ে সজনীর মাতা চীৎকার করিতে করিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন,—পশ্চাতে গুণধর পুত্র সজনী। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে যামিনীভূষণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “কি আমার মাথা মুণ্ডু ব'সে ব'সে ক'চ্ছ ? আমাদের এই অবস্থা, মান সম্ভ্রম রেখে চলা দায়,—দুদিন পরে কি হবে, তা জানি না,—ছেলে বাবু আজ দশ দিন পরে বাড়ী এসে হাজির,—বলছেন—দুশো টাকা

টাকা ওঁকে এখুনি দিতে হবে, নইলে উনি বিবাগী হোয়ে বেরিয়ে যাবেন !”

কথা শেষ হইতে না হইতে সজনী কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল, —“ও সব কান্না কাটী আমি ঢের দেখিছি, আমার টাকা চাই ! নইলে সব জিনিসপত্র আমি ভেঙ্গে দিয়ে যাব।”

যামিনীভূষণ একবার পুত্রের দিকে চাহিলেন, একবার সহধর্ম্মিণীর দিকে চাহিলেন, আর একবার শূন্য পানে চাহিয়া একটী পাঁজরা-ভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কেবলমাত্র বলিলেন —“টাকা নাই !”

“কি,—টাকা নাই ?”—এই বলিয়াই ক্রোধোন্মত্ত সজনী হল্‌ঘরের আসবাবপত্র ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। সজনীর মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রকে অজস্র গালি পাড়িতে লাগিলেন, আর যামিনীভূষণ—আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন—বালকের ন্যায় দুই হাত তুলিয়া নৃত্য যুড়িয়া দিলেন, আর বলিতে লাগিলেন “বাহবা সংসার ! বাহবা দুনিয়া ! বাহবা ঈশ্বর ! নিক্তির বিচার !! নিক্তির বিচার !! দু’দিন আগু আর পাছু ! দু’দিন আগু আর পাছু !! ফল্‌তেই হবে—ফল্‌তেই হবে ! নইলে কি চন্দ্র সূর্য্য এখনও উঠত ? দিন রাত্রি এখনও হোত ? কি মজা ! কি মজা !‘ ভাঙ্গ্‌—ভাঙ্গ্‌ ! যা কিছু আছে ভেঙ্গে চুরমার ক’রে দে ! আস্ত তো কখনও কিছু থাকেনি, থাকবেও না ; তবে আর মায়া মমতা কিসের ! ভেঙ্গে ফেল্‌ ! ভেঙ্গে ফেল্‌ ! যা কিছু আছে, রক্ত মাংস শুদ্ধ ধূলোর

সঙ্গে মিশিয়ে দে! ভাঙ্গা বড় সহজ,—বুঝলি? কিন্তু গড়া বড় শক্ত!”

পাঠক! আর অগ্রসর হইয়া কাজ নাই, এ দৃশ্যের যবনিকা এইখানেই পতিত হউক। কেবলমাত্র আপনারা এইটুকু জানিয়া রাখুন যে, এই দিন হইতে সজনীর আর কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই! সে যে কোথায় গেল, কি করিল, তাহার পরিণাম কি হইল, সে সংবাদ আমরা রাখি নাই; রাখিবার প্রয়োজনও বোধ করি নাই।

* * * * * *

প্রলয়ের প্লাবন বুকে পূরিয়া, টলিতে টলিতে, কাঁপিতে কাঁপিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে, নলিনী গৃহে আসিয়া পঁহুছিল। সে বহির্ব্বাটীতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া, একেবারে আপনার শয়ন-কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

জয় গুরু!! জয় রামকৃষ্ণ!! জয় বিশ্বনাথ!! জয় মা কালী!! সে যে পবিত্র—উদার—মহান্—অলৌকিক—মর্ম্মস্পর্শী—হৃদি-তন্ত্রী-কম্পিতকারী স্বর্গীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিল, মানব-জন্ম ধারণ করিয়া খুব কম লোকেরই—বোধ হয় সে—সৌভাগ্য ঘটিয়াছে!

মৃত্যুশয্যায় দুর্গা শায়িতা, যুগ্ম নেত্র নিমীলিত,—সন্ধ্যার মন্দ পবন আসিয়া গৃহের দীপ-শিখাকে যেমন ধীরে ধীরে কাঁপাইতেছিল, সেই সতী সাবিত্রীর কমললোচনদ্বয় এক একবার অতি সন্তর্পণে সেইরূপ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল; মহিমার

দর্পণ সুগঠিত ললাটে চন্দন-খচিত 'রামকৃষ্ণ' নাম,—জীর্ণ—ক্ষীণ—ক্ষুদ্র—আশাহীন—আলোকহীন—সুখহীন—শান্তিহীন বক্ষের উপর নলিনীর একখানি প্রতিমূর্ত্তি ;—তাহার উপর শীর্ণ, সামর্থ্যহীন, দুইখানি বাহু পরস্পর বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে, যেন এ অবস্থাতেও সেই শাপভ্রষ্টা দেবী নলিনীর সেই ফটোগ্রাফ্‌খানি প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে! শিয়রে রোরুদ্যমানা নলিনীর মাতা, পদতলে ভাগ্যহীন সন্তান, সে আর এখন শিশু নহে, এখন সে বালক! চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, আর 'মা' 'মা' করিয়া বুকের উপর লুটাইয়া পড়িতেছে! সে মর্ম্মভেদী দৃশ্য অবলোকন করিলে পাষাণও গলিয়া যায়।

মন্ত্রমুগ্ধবৎ, যন্ত্র-পুত্তলীর ন্যায়, নলিনী দুর্গার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। নলিনীর মাতা প্রাণপণ আগ্রহে ডাকিতে লাগিলেন—"ছোট বউ মা! ছোট বউ মা! একবার চোখ চেয়ে দেখ—নলিনী এসেছে!"

মরা গাঙ্গে বহুকাল পরে হঠাৎ বান আসিলে ক্ষুদ্র বেলা-ভূমি যেমন প্রাণের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারে না, চির-অন্ধকারময় কারাগৃহে পূর্ণিমার কিরণ পড়িলে সে যেমন উল্লাসে উছলিয়া ওঠে, চির-দরিদ্র লক্ষপতি হইলে সে যেমন হৃদয়ের অধীরতায় অধৈর্য্য হইয়া পড়ে,—দুর্গার ম্রিয়মাণ—মলিন—শ্রীহীন সংজ্ঞাহীন প্রাণটুকুও যেন সেইরূপ ফুলিয়া ফুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, উঠিয়া বসিতে চাহিল,—কিন্তু হায়! পারিল কই? কথা আর ফুটিল না, চোখ আর মেলিল না, ঘুম আর ভাঙ্গিল

না, স্বপ্ন আর টুটিল না! নশ্বর দীপশিখা কালের ফুৎকারে চিরজন্মের মত নিভিয়া গেল! সৃষ্টির অঙ্কুর মুকুলেই বিনষ্ট হইল! মঙ্গলময় জগদীশ্বর আপনার বড় যত্নের সামগ্রী কোল পাতিয়া তুলিয়া লইলেন। এই শোকাবহ চিত্র অঙ্কিত করিতে লেখকের অকিঞ্চিৎকর লেখনীর সামর্থ্যে আর কুলাইতেছে না। পাঠক! কল্পনার চক্ষে স্পন্দিত বক্ষে মহা-নাটকের শেষ পটক্ষেপণ অবলোকন করুন। এই পুণ্যবতীর সতীর কণামাত্র চিতাভস্ম যিনি সুবর্ণ-কৌটায় রক্ষা করিতে পারিবেন, সংসারের তাপ ও দাপ তাঁহাকে কখনও ব্যথিত করিতে পারিবে না।

যাও সাধ্বী! তোমার কর্ম্মের অবসান! শাপাবসানে নিজের ঘরে হাসি-মুখে ফিরিয়া যাও। এই জটিল, কুটিল, স্বার্থপূর্ণ সংসার কি তোমার আবাসস্থল দেবী? সাবিত্রী পারিজাত-মালা লইয়া তোমার জন্য স্বর্গদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন, সীতা স্বর্ণসিংহাসন ছাড়িয়া তোমার আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন, শৈব্যা তোমার পবিত্র অঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি করিবার জন্য আকুল-অন্তরে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, ত্রিদিবের দেব-দেবীগণ মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইয়া তোমার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন; যাও দেবী! তোমার আসন তুমি গিয়া অধিকার কর,—আমরা দূর হইতে তোমার অমর স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া, করযোড়ে তোমায় বার বার প্রণাম করি!

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শনিবার—রাত্রি দ্বিপ্রহর ; অমাবস্যার ঘোরা রজনী ; আকাশে মিট্ মিট্ করিয়া নক্ষত্র জ্বলিতেছে ; প্রকৃতি স্থিরা ধীরা গম্ভীরা ! সম্মুখে ভাগীরথীর কুল্ কুল্ শব্দ শুনা যাইতেছে,—মধ্যে মধ্যে গমনশীল দু' একখানি পান্সীর দাঁড়ের শব্দ—সেই নীরবতার বক্ষ ভেদ করিয়া—আপন মনে গন্তব্যস্থানাভিমুখে চলিয়াছে। দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানে, পঞ্চবটীবৃক্ষতলে, রাশি রাশি অন্ধকারের মধ্যে স্বামী বিমলানন্দ ও পত্নীহারা নলিনী উপবিষ্ট। সংসার সুপ্ত, বিমলানন্দ ও নলিনী জাগ্রত ! ক্ষণে ক্ষণে দম্‌কা বাতাস আসিয়া, বড় বড় গাছগুলোর মাথা ধরিয়া নাড়িয়া দিতেছিল, তাহারাও যেন ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া করুণ সুরে কান্না জুড়িয়া দিয়া পরিত্রাহি রব ছাড়িতেছিল। বিমলানন্দ নীরব—নলিনী নীরব। বহুক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। অকস্মাৎ স্বামী বিমলানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু যে ভাবে ভৃত্যকে আদেশ করে, সেই স্বরে নলিনীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার সহিত মহামায়ীর মন্দিরে আইস।" নলিনী এতক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়াছিল। বুকে ঝড় বহিতেছিল, কিন্তু সে টলে নাই ; নয়নে সমুদ্র উছলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে একবিন্দুও অশ্রু ফেলে নাই ; দেবতার উপর অভিমান করিয়া দুটো কথা বলিবার জন্য তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে একটী কথাও বলে

নাই। এইবার নলিনী কথা কহিল, বড় জ্বালায়, বড় যন্ত্রণায়, মর্ম্মান্তিক বেদনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া সে বিমলানন্দের উদ্দেশে বলিল, "স্বামীজি! আমায় বুঝাইয়া দিতে পারেন, এ পৃথিবীটা কি রকম? কি ভাবে চলিতেছে? আজ কাল ধর্ম্মের জয়, না—অধর্ম্মের জয়? সৃষ্টিকর্ত্তা এখন মঙ্গলময় ভগবান—না—পিশাচ-প্রতিমূর্ত্তি শয়তান? সংসারে যাহারা পাপের ভরা মাথায় লইয়া বাস করিতেছে, অর্থাগমের সুবিধার জন্য যাহারা সন্তানের মাথা কাটিয়া দিতেও কুণ্ঠিত নহে, সতীর সতীত্ব-নাশেও পশ্চাৎপদ নহে, আত্মীয়ের বুকে ছুরি বসাইতেও কাতর হয় না—তাহারা কেমন সুখে, কেমন আনন্দে, কেমন উল্লাসে দিন কাটাইতেছে! আর যাহারা নীতিরাজ্যের গণ্ডীর ভিতরে পড়িয়া নিত্য মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে, তাহাদের মত দুঃখী ত' আর এ পৃথিবীতে দেখিতে পাই না। আমায় বুঝাইয়া দিন, এ অদ্ভুত পার্থক্যের কারণ কি?" স্বামী বিমলানন্দ প্রথমে একটু হাস্য করিলেন, কিন্তু ঘনঘোর অন্ধকারে সে হাসি মিশিয়া গেল, নলিনী তাহা দেখিতে পাইল না; পরে জলদ-গম্ভীরস্বরে নলিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "উচ্ছৃঙ্খল যুবক! তোমার স্পর্দ্ধার মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে! চণ্ডালের মুখে বেদধ্বনি যেমন অসহনীয়, মঙ্গলময়ের কার্য্য-কারণের উপর দোষারোপ করিয়া বাদানুবাদ—তোমার মুখেও সেইরূপ বিদ্রোহসূচক! চিরজন্ম যাহাকে অনাদর করিয়া আসিয়াছ, যে সতীসাধ্বী রমণীর প্রতি একদিনের জন্যও স্বামীর

কর্ত্তব্য দেখাইবার অবকাশ পাও নাই, নিজের সুখ ও স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া যাহার অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া, পাপিষ্ঠা বারাঙ্গনাকে উপহার দিয়াছ, যে সাবিত্রী-রূপিণী সহধর্ম্মিণী মরণের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মুখ তুলিয়া কখনও একটী কড়া কথা কহে নাই, পথের ধূলির অপেক্ষাও অধম হইয়া যে চিরজীবন তোমার বাঁদীগিরি করিয়া আসিয়াছে, সেই শাপভ্রষ্টা দেবী তোমাকে ত্যাগ করিয়া কর্ম্মাবসানে আপনার রাজ্যে ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাই তোমার প্রাণে আজ বড় চোট্ লাগিয়াছে, না ? যখন দাঁত ছিল, তখন তো তার মর্য্যাদা বোঝ' নাই বাপু ! তুমি যদি ইচ্ছা করিতে, তোমার প্রবৃত্তি যদি সুপথে পরিচালিত হইত, তবে তুমি যথার্থই সোনার সংসার পাতিয়া লইতে পারিতে। তোমার মত সহধর্ম্মিণী-লাভ কয় জনের ভাগ্যে ঘটে ? কিন্তু তুমি তো সংসার করিতে আস নাই ! স্বামীর কর্ত্তব্য-পালন তোমার তো উদ্দেশ্য ছিল না ! তুমি লম্পট, তুমি নীচ, তুমি পাপিষ্ঠ !"

মাথার উপর নক্ষত্র জ্বলিতেছে, কলনাদিনী সুরধুনী মৃদু গীতি গাহিয়া বহিয়া চলিয়াছে, পবনস্বনে বৃক্ষরাজি নিজ নিজ ভাষায় কথা কহিতেছে, চারি দিকে আর কোনও সাড়া নাই, আর কোনও শব্দ নাই, আর কোনও কোলাহল নাই ! অকস্মাৎ প্রকৃতির নীরব রাজত্ব কে যেন দামামায় ঘা দিয়া জাগাইয়া তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি লম্পট, নীচ, পাপিষ্ঠ !" গঙ্গাবক্ষে প্রতিধ্বনিত হইল, "তুমি লম্পট, নীচ, পাপিষ্ঠ !" সমীরণ কাঁদিয়া

কাঁদিয়া ফুকারিয়া উঠিল, "তুমি লম্পট, নীচ, পাপিষ্ঠ!" পঞ্চবটীর চারিপাশ ঘেরিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কে যেন বলিতে লাগিল, "তুমি লম্পট, নীচ, পাপিষ্ঠ!" নলিনী আর সহ্য করিতে পারিল না, বিমলানন্দের পাদমূলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "প্রভু! আমায় রক্ষা করুন!"

বিমলানন্দের প্রাণ করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল; তিনি নলিনীকে সযত্নে উঠাইয়া লইয়া স্নেহপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন, "বৎস! তুমি ঠাকুরের বড় প্রিয়পাত্র! তোমার দ্বারা তাঁহার অনেক কাজ হইতে পারে; যে ধাতুতে তুমি গঠিত, তাহাতে অল্প পালিস্ লাগাইলেই সোনা ঝক্ মারিয়া যাইবে। সে পালিস্ আমরা তোমাকে দিব। আপাততঃ তুমি আমাদের বেলুড় মঠে বাস করিবে, আমি তোমাকে মন্ত্রশিষ্য করিব। সুখের আস্বাদন-আশায় অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছ, এইবার যাহাতে তুমি বিমল সুখ পাও, তাহার ব্যবস্থা হইবে। এক্ষণে আমার সহিত কালীমন্দিরে আইস।"

বিমলানন্দ অগ্রসর হইলেন, নলিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। মহামায়ীর দুই পার্শ্বে মিট্ মিট্ করিয়া দুইটী প্রদীপ জ্বলিতেছে,—মন্দির একরূপ অন্ধকার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে স্বামী বিমলানন্দ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, "মা, আমি আসিয়াছি", সেই দণ্ডে যেন সহস্র সহস্র বৈদ্যুতিক আলোকমালায় মন্দির অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

করালিনী হাসির রাশি ছড়াইয়া বিমলানন্দকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেন। দেবালয় যেন সজীব হইয়া উঠিল।

বিমলানন্দ কহিলেন, "বৎস নলিনী! মহামায়ীর সম্মুখে উপবেশন কর।"

আদেশ প্রতিপালিত হইল।

"চক্ষু মুদ্রিত কর।"

তাহাই হইল।

বিমলানন্দ। কি দেখিতেছ?

নলিনী। অন্ধকার।

বিমলা। কি দেখিতে চাও?

নলিনী কথা কহিল না।

বিমলা। 'অভিনেত্রীর রূপ'?

নলিনী কথা কহিল না।

বিমলা। বুঝিয়াছি। 'অভিনেত্রীর রূপ' লইয়া তোমার জীবনের প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল, **বিশ্ব-অভিনেত্রীর** রূপ দেখাইয়া তোমার জীবনের শেষ অধ্যায় সমাপ্ত করাইব।

নলিনী কথা কহিল না।

বিমলা। মনে মনে তিনবার 'মা' 'মা' বলিয়া ডাক।

প্রাণের সহিত মন মিলাইয়া দিয়া—নলিনী ডাকিল, "মা, মা, মা!!"

বিমলা। কি দেখিতেছ?

নলিনী। সংসার-নাট্যশালা!

বিমলা। নাট্যশালায় কোনও রূপ অভিনয় প্রত্যক্ষ করিতেছ ?

নলিনী। অগণন নর নারী নানা সাজে সাজিয়া নানারূপ অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে। অভিনয়মাত্র! যবনিকা পড়িলেই যে যার খেলা ভুলিয়া যাইবে।

বিমলা। খেলা খেলাইতেছে কে ? তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছ ?

নলিনী। পাইতেছি।

বিমলা। কে তিনি ?

নলিনী। কালী—করালিনী—কপালমালিনী—শুম্ভ-নিশুম্ভ-ঘাতিনী **বিশ্ব-অভিনেত্রীর** রূপ ধরিয়া, চরাচরকে অভিনয় কার্য্য শিখাইয়া, রণরঙ্গিণী-মূর্ত্তিতে খড়্গ ধরিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন।

বিমলা। পদতলে বসিয়া—পূজক ও সাধক রূপে **বিশ্ব-অভিনেত্রীর** পদে কাহাকেও জবা তুলিয়া দিতে দেখিতেছ কি ?

নলিনী। দেখিতেছি।

বিমলা। কে তিনি ?

নলিনী। **ভগবান রামকৃষ্ণ।**

বিমলা। আর চিন্তা নাই। আজ হইতে তুমি নূতন পথের পথিক হইলে। এই আমি তোমার মস্তক স্পর্শ

করিয়া তোমার পার্শ্বে উপবেশন করিলাম; আমার দিকে চাহিয়া দেখ।

নলিনী এইবার চোখ চাহিল।

বিমলানন্দ কহিলেন, "বল, **জয় ভগবান রামকৃষ্ণের জয়।**"

নলিনী। **জয় ভগবান রামকৃষ্ণের জয়!**

বিমলা। **জয় বিশ্ব-অভিনেত্রী কালী করালীর জয়!**

নলিনী। **জয় বিশ্ব-অভিনেত্রী কালী করালীর জয়।**

* * * * * *

পাঠক! এই আমাদের '**অভিনেত্রীর রূপ!**'

সমাপ্ত।